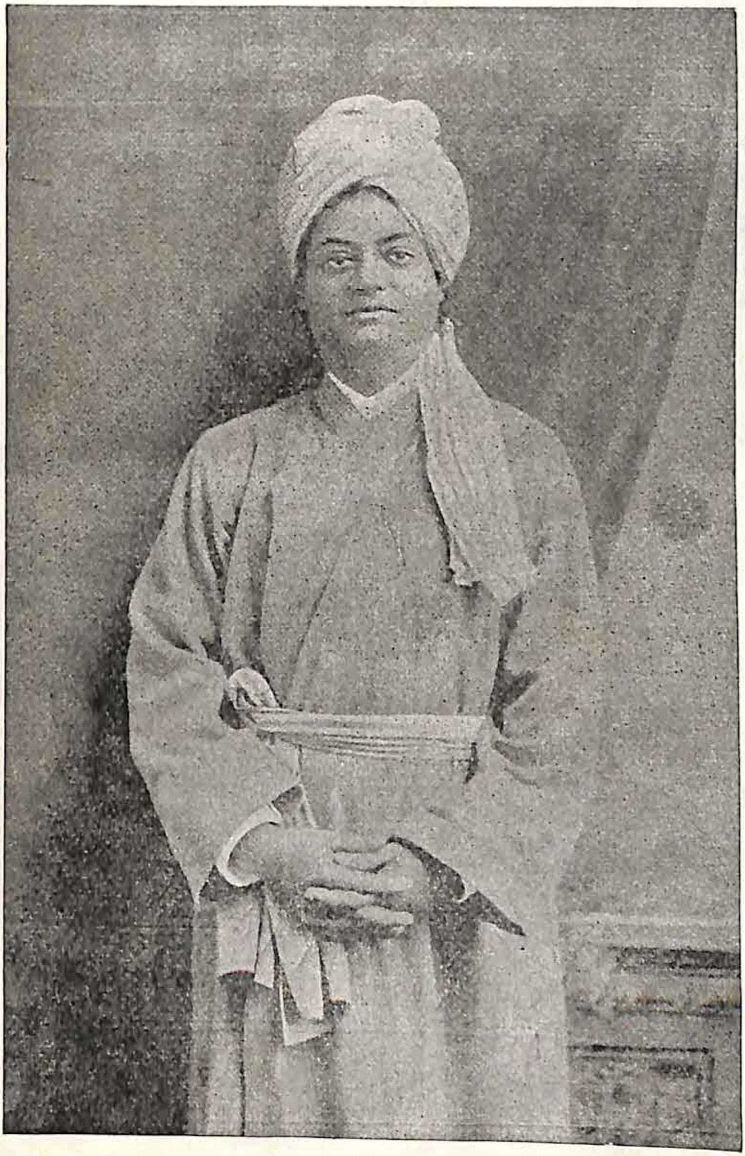


বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

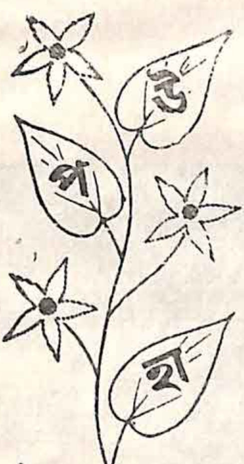
BISWAJAYEE VIVEKANANDA
CODE NO. 4-33-022

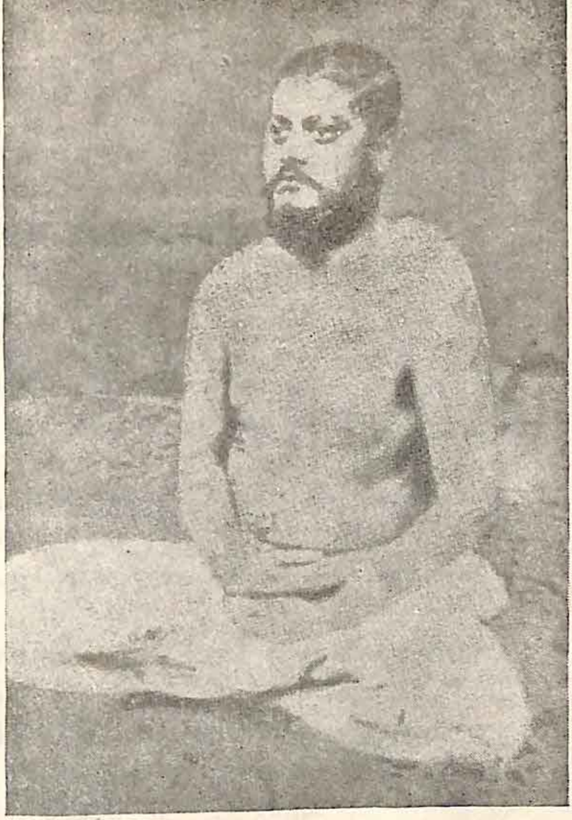
প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৪
৯

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

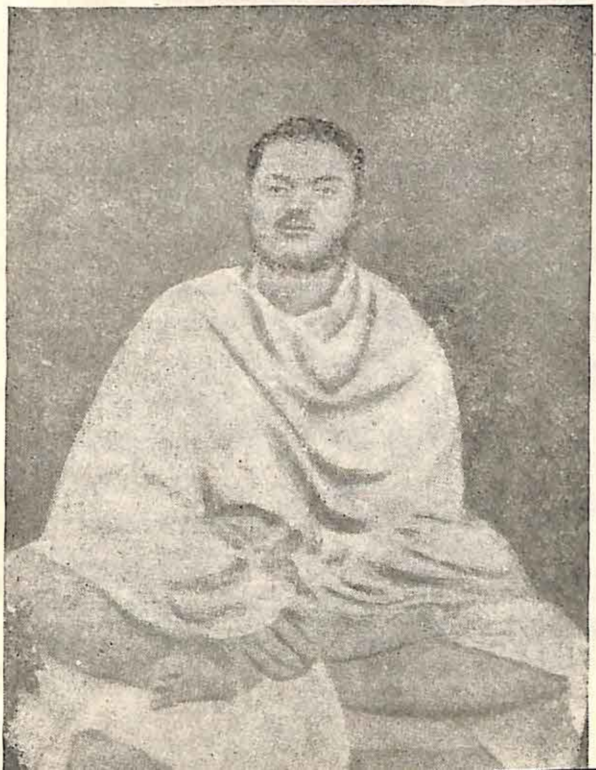
দাম—
টা. ১০·০০


উপহার



পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব
আত্মা ত কখন নহে এই সব
...সন্ন্যাসীর গীতি—

—সাধক নরেন্দ্রনাথ



কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যেজন
হয় না তাহার বন্ধন মোচন...
...সন্ন্যাসীর গীতি—

—ধ্যানী নরেন্দ্রনাথ

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ—

হে বীর সন্ন্যাসী, তোমাকে স্মরণ করিয়া, তোমাকে প্রণাম করিয়া, আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিলাম। তোমার আশীর্বাদে আমাদের বাণী-সাধনা যেন সত্য হয়, সার্থক হয়...

এই অক্ষম যুগে, এই অক্ষম দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃতদের মহাদেশে তুমি মহা-জীবনের অগ্নি-বাণী বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছ।

নির্বাপিত প্রাণ-যজ্ঞের ভস্মস্তূপ সরাইয়া, হে পঞ্চতপা, তুমি আবার দিব্য-অগ্নিকে জ্বালাইয়া গিয়াছ।

সে অগ্নি যাহাতে আর না নিবিয়া যায়, তাহার মহা-দায়িত্ব তোমার দেশবাসীদের উপর দিয়া গিয়াছ, এই বিশ্বাসে—

যে যজ্ঞের সূচনা হয় একদা এই ভারতভূমিতে, এই ভারতভূমিতেই হইবে তাহার সুযোগ্য পরিসমাপ্তি। অমৃতের সন্তান আবার ফিরিয়া পাইবে অমৃতের অধিকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা...গৌরমোহন মুখার্জীর গলিতে দত্তদের বাড়ি...

বাড়িতে আজ মহা-ধুমধাম...আনন্দ...

বাড়ির কর্তা দুর্গাচরণ দত্তের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে—

প্রথম সন্তান...

বাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা জটলা করে ঠিক করলো, ঘটা করে ছেলের ভাত দিতে হবে।

তাই সবাই মিলে কর্তাকে ধরতে চললো...

কিন্তু তিনি কোথায়?

বিকেল থেকে তাঁর দেখা নেই। সন্ধ্যা হলো, তবুও দুর্গাচরণ বাড়িতে ফিরলেন না। রাত্রি গভীর হয়ে এলো...তবুও তাঁর দেখা নেই...

রাত ভোর হয়ে গেল, দুর্গাচরণের কোনও খবর পাওয়া গেল না। সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বৎসর গেল দুর্গাচরণের আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

শিশু-সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার জননী পথ চেয়ে বসে থাকেন, যদি কোনদিন ফিরে আসেন...

বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা তাঁর নাম স্মরণ করে জননী বালকের নাম রাখলেন বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ তখন তিন বছরের বালক...জননী ঠিক করলেন যাঁর নামে বালকের নাম, কাশীতে সেই কাশীশ্বর বিশ্বনাথকে দর্শন করে আসবেন।

কাশীতে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন পথের শ্রমে তিনি ভেঙে পড়েছেন। সেদিন রেলহীন পথে ভ্রমণ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যেতেই তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন...চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল...কাশীর পথের ধুলোয় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন...

মূর্ছা ভাঙলে দেখেন, এক সন্ন্যাসী তাঁকে সেবা করছেন। সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন...

জ্ঞান ফিরে পেয়ে উদ্ধারকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে তাঁর মুখে আর কথা সরে না...পলকহীন চোখে তিনি সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন...

তাঁর সর্বদেহ যেন মুখর হয়ে ওঠে, ওগো এতদিন পরে, এমনি করে দেখা দিলে!

শুশ্রূষা ছেড়ে সন্ন্যাসীও চমকে উঠে দাঁড়ান, অস্ফুটকণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, মায়া, মায়া...

এতদিন পরে এমনিভাবে স্বামীদর্শনে মুগ্ধা নারী আনন্দে লুটিয়ে পড়ে...মাথা তুলে দেখে, সামনে অজানা লোকের জনতা...সন্ন্যাসী নেই!

সন্ন্যাসীর পায়ের ছাপ তখনও ধুলোয় লেগে আছে...সেই ধুলো তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে নারী ফিরে এলো ঘরে।

দিন যায়...

গৌরমোহন মুখার্জীর গলিতে দত্তবাড়ির গিন্নী দরজা খুলেই রাখেন...সন্ন্যাসী-সজ্জন দেখলে, ডেকে সেবা করেন...

একদিন সন্ধ্যার মুখে সহসা সেই বাড়ির দরজায় বাড়ির এক পুরাতন বন্ধু দেখা দিলেন...বিশ্বনাথের জননীকে ডেকে বললেন, বউদি, দেখ কাকে ধরে এনেছি...জোর করে ধরে এনেছি!

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে, সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ...

দেখতে দেখতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই দুর্গাচরণকে ঘিরে দাঁড়ালো —এবার আর তোমাকে যেতে দেবো না...

সন্ন্যাসী হ্যাঁ-না কোন কথাই বলেন না...

বাড়ির ভেতর যে ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো, বাইরে থেকে সে ঘরে চাবি দিয়ে দেওয়া হলো।

তিন দিন ধরে সেই ঘরেই খাবার-দাবার দেওয়া হয়...সন্ন্যাসী তা স্পর্শ করেন না।

তিন দিন পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো। যে ধরা দেবে না, তাকে দরজা বন্ধ করে কদিন ধরে রাখা যায়?

সেইদিনই রাত্রির অন্ধকারে সন্ন্যাসী আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন...

আর ফিরলেন না...

এই ঘর-ছাড়া বিবাগী বৈরাগী হলেন বিবেকানন্দের পিতামহ।

মায়ের মলিন মুখের দিকে চেয়ে বালক বিশ্বনাথ নিজেকে নিজের চেষ্টায় গড়ে

তুলতে লাগলেন। পুত্রের কৃতিত্বে নিরুদ্দিষ্ট পিতার কথা সকলে ক্রমশঃ ভুলে গেল।

যুবক বিশ্বনাথ আজ হাইকোর্টের এটর্নী...

হাইকোর্টের এটর্নী, কিন্তু এক হাতে বাইবেল আর এক হাতে হাফেজ।

যা উপার্জন করেন, দু হাতে বিলিয়ে দেন...

পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী ঠাকুর-দেবতা, পূজা-অর্চনা, অতিথি-অভ্যাগত নিয়ে সারা-দিন ব্যস্ত।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসে, তিনি রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেন...

রামায়ণ-মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ।

সব সুখের মধ্যে এক বেদনা...পুত্রহীনার বেদনা। কত ঠাকুর মানত করেন...

হে ঠাকুর, পুত্রের মত পুত্র দাও।

কাশীতে ছিলেন বিশ্বনাথের এক কাকীমা। তিনি ভুবনেশ্বরীকে লিখে পাঠালেন, বউমা, কাশীতে এসে একবার বীরেশ্বর শিবের মাথায় ফুল চড়াও দেখি...

ভুবনেশ্বরী সেই আহ্বানে কাশীতে এলেন। রোজ ভক্তিভরে বিশ্বেশ্বর শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালেন আর বলেন, হে ঠাকুর, পুত্রহীনা নারীর অন্তরের কামনা পূরণ কর...

একদিন স্বপ্নে দেখেন, তাঁর ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেবার জন্যে স্বয়ং এসেছেন। দেখতে দেখতে সেই মূর্তি পরিবর্তিত হয়ে একটি দিব্য বালকের মূর্তি ধারণ করলো তিনি দু হাত দিয়ে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন...

স্বপ্নের কথা তিনি সযত্নে অন্তরে লুকিয়ে রাখলেন...কারণ স্বপ্ন নয়, সত্যই দেবাদিদেব তাঁর আহ্বান শুনেছেন...

পুত্র-সম্ভাবনায় তাঁর সর্ব-দেহ-মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো...

নিত্য তিনি জপ করেন, শিব, শিব...

সেদিন মকর সংক্রান্তি...তখনও সূর্যোদয় হতে ছ' মিনিট বাকী আছে...দলে দলে পুণ্যলোভাতুর নর-নারী চলেছে মকর-স্নানে...

সেই সময় সেই দিব্যলগ্নে মাতা ভুবনেশ্বরীর অঙ্কে জন্মগ্রহণ করলো এক ভুবন-বিজয়ী শিশু, বিবেকানন্দ যাঁর নাম।

যথাকালে শিশুর নামকরণ হলো, নাম হলো নরেন্দ্রনাথ।

মা আদর করে ডাকেন, বিলে...

কিন্তু কী দুরন্ত ছেলে! সমস্ত বাড়ি একা সে তোলপাড় করে তোলে। যা বায়না ধরবে, তা চাই-ই...কোন কথা শুনবে না, কোন ধমক মানবে না, কোন আদরে ভুলবে না...যা বায়না ধরবে, যতক্ষণ তা না পাবে, বাড়ি মাথায় করে তুলবে...কে তাকে থামায়!

বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির হয়ে ওঠে...

এমন কি অমন যে স্নেহময়ী জননী, তাঁরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়...

রেগে তিনি বলে ওঠেন, শিবঠাকুর নিজে না এসে, তাঁর একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

কিন্তু হঠাৎ একদিন ভুবনেশ্বরী সেই ভূতের একটা ওষুধের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

যেমন ভূত, তেমনি ওষুধ...

যায়না নিয়ে ভূত যখনই চেঁচাতো—শিব, শিব বলে মাথায় একটু জল দিয়ে দিলেই ভূত ঠান্ডা হয়ে যেতো...

যেন পাথরের শিশু-শিব!

বিলের কত যে খেয়াল! সবচেয়ে বড় হলো, সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁদের ডেকে আনা। হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়ে দেবে।

কোন্ দিন কি দিয়ে দেবে,—ভুবনেশ্বরী ধমকে জানিয়ে দিলেন,—ফের যদি সাধু-সন্ন্যাসীদের দেবার জন্যে কোন জিনিসে হাত দিবি, তো তোর একদিন কি আমার একদিন!

অভিমানী বিলের মনে সে কথা গিয়ে লাগলো। পরের দিনই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এক সাধু এসে দাঁড়ালো...

—খোকাবাবু, ভিখ মিলে...

খোকাবাবুর মনে পড়লো, মার কথা...

বাড়ির কোন জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না...কিন্তু সাধুলোক তার কাছে চেয়ে শুধু হাতে ফিরে যাবে?

বিলের পরনে ছিল মাত্র একখানি ধুতি, সেখানি খুলে সাধুকে ছুড়ে দিয়ে বালক ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকলো...

পুত্রের সহসা সেই দিগম্বর মূর্তি দেখে এবং তার কারণ অবগত হয়ে, ভুবনেশ্বরী শিকলের ব্যবস্থা করলেন।

দরজায় শিকল দিয়ে বিলেকে ঘরে আটক রাখা হলো।

রাস্তার ওপরেই ঘর...ঘরের জানলার ওপর দাঁড়ালে রাস্তার সব দেখা যায়। বিলের হলো মজা, রাস্তায় সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই জানলা দিয়ে ডাকে...ঘরের মধ্যে যা পায়, জানলা গলিয়ে ছুড়ে ছুড়ে দেয়। নীচে ভিখারীর ভিড় জমে যায়...তারা পরমোল্লাসে খোকাবাবুর জয়ধ্বনি করে। সে জয়ধ্বনি ভুবনেশ্বরীর কানে গিয়ে পৌঁছয়—ছুটে এসে ছেলের কান্ড দেখে অবাক্ হয়ে যান—

আর কি করে শাসন করবেন ভেবে পান না।

মাঝে মাঝে হঠাৎ বিলেকে খুঁজে পাওয়া যেতো না। সারা বাড়িতে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যেতো...

আনাচে কানাচে, ঘাটে মাঠে, এপাড়ায় ওপাড়ায় লোক ছুটোছুটি করে হয়রান...

শেষকালে হয়ত দেখা গেল, বাড়ির অন্ধকার ঘরে, অন্ধকার এক কোণে বালক বিলে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছে—সমাধি-মগ্ন-ঋষি...

কত বালকের কত খেলা—বিলের কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে এই ধ্যান-ধ্যান খেলা...

ছাদের ওপর, চিলেকোঠায়, তক্তাপোশের তলায়, যেখানে বালক জানে তার নির্জনতা সহসা কেউ ভাঙতে আসবে না, সেখানেই সে ধ্যানে বসে পড়ে।

কে তাকে শেখালো এই খেলা?

কোন্ অনাদি রহস্যের সিন্ধুতলে, জন্ম-জন্মান্তরের নিঃসীম নীল জলে, জীবন ও মৃত্যুর খেয়া-পারাপারে তার উত্তর নিহিত আছে, কে জানে?

মাঝে মাঝে তার বন্ধুদেরও বিলে এই খেলায় ডেকে নিতো।

একবার এক মাঠের ধারে, এক গাছতলায় বিলে তার বন্ধুদের নিয়ে ধ্যান ধ্যান খেলায় বসেছে। সংসার-বিরাগী বিজ্ঞ ঋষিদের মত চোখ বুজে, কমল-আসনে তারা সবাই বসেছে। যার ধ্যান আগে ভেঙে যাবে, সে যাবে হেরে...তাই সবাই চোখ মিটমিট করে দেখছে অন্য ঋষির ধ্যান ভাঙলো কিনা!

এমন সময় একজন বালক-ঋষি দেখলো, গাছের পাশে কি যেন নড়ে উঠলো... চকচকে কালো...

চকচকে কালো জিনিসটি ফণা তুলে দাঁড়ালো...

—ওরে, কেউটে, কেউটে...পালা...পালা...

চিৎকার করতে করতে ধ্যানী ঋষিরা ছুটতে লাগলো। যত ছোটে, তত চেঁচায়...

কিছুদূর এসে, তারা পেছনে ফিরে দেখে, বিলে তেমনি বসে আছে...নিশ্চল, নিথর...

বিলের ভাবনায় তারা কেঁদে ফেললো। চেঁচামেচিতে লোকজন ছুটে এলো। তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, বিলে তখনও চোখ বুজে বসে আছে!

ডেকে তার ধ্যান ভাঙাতে হলো...

—ধন্যি ছেলে বাবা! কেউটে দেখে তোর ভয় করলো না?

বিস্মিত বিলে বলে, কেউটে? কই, আমি তো দেখতে পাই নি!

মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রকে বুকে জড়িয়ে স্মরণ করেন, শিব, শিব!

কখনো সন্ন্যাসী...কখনো রাজা...

রাজা সাজতে বিলের বড় ভাল লাগে।

বাড়ির দালান...উঠোন থেকে থাকের পর থাক সিঁড়ি উঠেছে দালান পর্যন্ত...

সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে একটা কাঠের চৌকি...রাজসিংহাসন...

সেখানে বসবে একা রাজা...একা বিলে...

সে রাজা—সে জন্মেছে রাজটিকা নিয়ে...মানুষকে শাসন করতে...আজ্ঞা করতে...

বন্ধুদের মধ্যে বেছে সে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে...তারপর সেনাপতি, পাত্রমিত্র...

যে যার সম্মান অনুযায়ী ধাপের পর ধাপ নীচে বসে...

সন্ন্যাসী আজ রাজা...আজ আর চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকা নয়, আজ সে শাসক। তার কণ্ঠস্বরে আদেশ। তার ভঙ্গীতে অগ্নিদীপ্তি। অপরাধীকে সে দেয় কঠোর দণ্ড—ক্ষমা নেই। যে অপরাধী তাকে পেতেই হবে শাস্তি...যে দেখিয়েছে বীরত্ব, তাকে খুলে দেয় নিজের গলার মুক্তাহার। দিকে দিকে পাঠায় সৈন্যদের—শত্রুদের করতে পরাজিত—

সে নিজে অজেয়...একক...পুরুষসিংহ...

বিলের আজ সাত বছর বয়স...সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তার কণ্ঠস্থ। রামায়ণ, মহাভারত অনর্গল সে আবৃত্তি করে যায়...

সভায় কথকঠাকুর রামায়ণ গাইছেন...কোথায় ভুল করে ফেলেছেন বালক বিলে তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সংশোধন করে দেয়...

মাস্টারমশাই যা বলেন, বিলে পরমুহূর্তেই তা স্মরণ থেকে বলে দেয়...

স্মরণশক্তি দেখে লোকে অবাক্ হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলে, জাতিস্মর...

বিলের দৃষ্টি সব দিকে...

এটর্নীর বৈঠকখানা...নানা জাতের লোকের ভিড়...হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান...ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য...

বিলে দেখে, এক এক জাতের লোকের জন্যে এক একটা আলাদা হুঁকো...

কেন এমন আলাদা ব্যবস্থা?

কোন কোন দিন দেখে, এক জাতের হুঁকো ভুলে অন্য জাতের লোকদের দেওয়ার জন্যে চাকর ভয়ানক বকুনি খেলো...যেন সে কি সর্বনাশ করেছে!

বিলে বুঝতে চেষ্টা করে, বুঝতে পারে না...ব্রাহ্মণের হুঁকোয় শূদ্র মুখ দিলে, কি সর্বনাশ হয়! কেন এত জাত? আর জাতে জাতে এত তফাতই বা কেন?

ভাবতে ভাবতে একদিন সে ঠিক করলো, গোপনে সে নিজেই পরীক্ষা করে দেখবে ...সব জাতের হুঁকো থেকে সে এক এক টান তামাক খাবে—দেখবে, তার কি সর্বনাশ হয়!

গোপনে অবসর বুঝে, তামাক তৈরি করে, প্রত্যেকটি হুঁকো থেকে এক এক টান তামাক খায়...

কই...তার মাথায় তো বাজ পড়লো না? তার হাত-পা তো বদলে গেল না? যেমনটি ছিল, সে তো ঠিক তেমনি আছে...

তবে, এসব হলো ফাঁকি...মিথ্যে কথা...ভুল...

অন্ততঃ বিলে এসব আর মানবে না...

পাঠশালা...সেখান থেকে বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিট্যান ইন্স্টিটিউশান্... বিদ্যাসাগরমশাই তখন নিজে সেই স্কুলে পড়ান...

একদিকে স্কুল। আর একদিকে আখড়া...কুস্তির আখড়া।

নবগোপাল মিত্তিরের আখড়া। পাড়ার ছেলেরা তাঁর তত্ত্বাবধানে রোজ নিয়মিত ডন, বৈঠক, কুস্তি করে।

বিলে আর ছোট ছেলে নয়... সে আজ নরেন...রীতিমত ডন বৈঠক করে, কুস্তি করে...পালোয়ানদের সঙ্গে গা ঘষে—দলের চাঁই...

মিত্তিরমশাই তারই হাতে ছেড়ে দেন আখড়া...

নরেন বলতে ছেলেরা অজ্ঞান, তার একটা কথায় তারা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে...

স্কুলে নরেন...আড্ডায় নরেন...থিয়েটারে নরেন...মারামারিতেও নরেন...

একদণ্ড স্থির নয়...

এমন সময় এলো প্রবেশিকা পরীক্ষা...আর তিন দিন বাকী...

জ্যামিতির একটা পাতাও পড়া হয়নি...ইউক্লিডের চারখানা বই নিয়ে নরেন ঘরে ঢুকলো...চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে পড়ে ইউক্লিডের চারখানা বই ঝাড়া মুখস্থ করে ফেললো...

সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ...মাত্র এক বছরের জন্যে...তারপর জেনারেল এসেম্বলি...আজ যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ...

কলেজের ছেলেরা নরেনকেই জানে তাদের দলপতি।

বলে, নরেনকে না হলে কলেজের আসর বসে না...গান জমে না...

আহ্‌মেদ খান আর বেণী গুপ্ত, সে-যুগের দুই বড় ওস্তাদ—তাদের কাছে রীতিমত নাড়া বেঁধে নরেন গান শেখে...

যে কোন বাজনা দাও, সে অনায়াসে বাজিয়ে যাবে...

কিন্তু বাজনায় কি হবে? নরেনের খালি গলা...সেই তো বাজনা...তার উদার গম্ভীর মধুর আওয়াজ কখনো মেঘের মত ডাকে, কখনো মৃদঙ্গের মত বোলে, কখনো বা সাগরের মত আছড়ে পড়ে...

সে কণ্ঠস্বর যে শোনে সেই আপনার হয়ে যায়...

বাড়িতে, পাড়ায়, কলেজে, সর্বত্র, নরেন যেখানে থাকে, সে থাকে সকলের আগে।

কিন্তু তার সঙ্গীরা বুঝতে পারে, তাদের সঙ্গে থাকলেও নরেন যেন তাদের কাছে নেই। যত দিন যায় ততই সঙ্গীদের কাছে নরেন রহস্যময় হয়ে উঠতে থাকে...

তার বাইরের সে চাঞ্চল্য যেন হঠাৎ কোথায় উবে গেল...তার গাম্ভীর্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভীত হয়ে উঠলো...

দুরন্ত ক্ষুর-ধার নদী...কোন্ দূর পর্বত-শৃঙ্গ থেকে আজ তাতে নেমেছে গৈরিক ঢল...টল টল জল...স্থির অতল...

তার বাইরের বেগ ভেতরে নিয়েছে টেনে...

তাই ভেতরে চলেছে তার তীর-ভাঙা কলরব, বাইরে কিছুই যায় না দেখা...

সহসা এই বিপুল ধরণী তার অনন্ত আত্মীয়তা...বহুদিকে বহুভাবে বহু বিস্তৃত তার বিনোদ বিচিত্রতা...অন্তরের একটি মহাবিন্দুতে সংহত হয়ে পড়ে...

একটি জিজ্ঞাসা, একটি অনুভূতি, একটি স্পর্শ... নিখিলের সব বিচিত্রতাকে অপহরণ করে নেয়...বহু মানবের মধ্যে মানব সহসা হয়ে যায় নিঃসঙ্গ...পরম একক...

সেই এক জিজ্ঞাসা, এক অনুভূতি, এক স্পর্শের জন্য অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে...জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য-সিন্ধুর অতল গর্ভ থেকে মহা-পদ্মের সৌরভের মত আসে আহ্বান...

বাইরের সমস্ত চাঞ্চল্যের আড়ালে আজ সেই আহ্বান নরেন্দ্রকে অন্তর্মুখী করে তুলেছে...

কোথা থেকে, কি ভাবে সে অহ্বান, কে বলবে তার ইতিহাস?

বহু বহু যুগ আগে, আমাদেরই এই দেশে, আমরা দেখতে পাই, সেই আহ্বানের আদিম আত্ম-প্রকাশ, সেই জিজ্ঞাসার জীব-জন্ম বিশ্বপিতা ঋষিদের অন্তর-গুহায়, হে হিরন্ময় পুরুষ, কোথায় তুমি? কে তুমি? কি সম্বন্ধ তোমায়-আমায়?

সে জিজ্ঞাসা আজ নরেন্দ্রের চৈতন্যের মর্ম-মূলে তুলেছে আলোড়ন...বেঁধেছে বাসা...

কে দেবে তার উত্তর...?

সেদিন কলেজে অধ্যক্ষ সাহেব অনুপস্থিত। তিনি ইংরেজী কাব্য পড়ান। তাঁর বদলে অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টি সেদিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়াচ্ছেন...

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'এক্‌স্‌কারশন্‌' কবিতা...তাতে ইংরেজ কবি সমাধি অবস্থার উল্লেখ করে বলছেন, প্রকৃতির ধ্যান করতে করতে চকিতের জন্যে সমাধির সেই মহা-শান্তি উপলব্ধি করেছি...

হেস্টি সাহেব ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেন, মনের সেই সমাধি অবস্থা কাকে বলে...

"মনের একান্ত পবিত্রতা এবং একমুখিনতা থেকে সেই অবস্থার উপলব্ধি হয়। আজকাল তার পরিচয় বিরল বললেই চলে। আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে শুধু একটি মানুষের কথা জানি, যিনি অন্তরের এই পরম অবস্থা অর্জন করেছেন, তিনি হলেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। যদি তোমরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে জানতে চাও, সেখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন করতে পার।"

নরেন্দ্র একমনে হেস্টি সাহেবের বক্তৃতা শুনছিলেন—সেই প্রথম শুনলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম...

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার তীরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ওপারে দু'একটি করে আলো জ্বলে উঠেছে...এপারে ঘনায়মান অন্ধকারে এক উন্মাদ বেড়াচ্ছে...

গঙ্গার জলে নেমে, গঙ্গাজলের অঞ্জলি নিয়ে উন্মাদ তারস্বরে কাদের যেন ডাকে, ওরে আয়, ওরে তোরা আয়!

গঙ্গার তরঙ্গ তীরে তীরে ভেঙে পড়ে...

আকাশে চাঁদ ওঠে...

উন্মাদ জল থেকে উঠে তীরে তীরে ঘুরে বেড়ায়...আর মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে...

জননী যেমন দূরে যাওয়া ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ভগবানকে ডাকে, তেমনি করে জগন্মাতার নাম স্মরণ করে উন্মাদ ডাকে, মাগো, বেলা যে যায়...তারা আসবে কবে?

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আজ দুর্লভ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন...কিন্তু সে সাধনা তাঁর নিজের মুক্তির জন্যে নয়, স্বর্গলাভের জন্যে নয়, সিদ্ধাই-এর অলৌকিক শক্তির জন্যে নয়...

সহস্র ভেদ কণ্টকিত ধরণীতে ফুটেছে মিলনের শতদল...মরণশীল মানবের হয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মরণ-জয়ের পথ...নিখিলের কল্যাণের বীজমন্ত্র...

তিনি তাঁর ধ্যাননেত্রে দেখেছেন, সেই বীজমন্ত্রকে পৃথিবীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবে যারা, ধ্যানের জগতে তিনি দেখেছেন তাদের জন্মগ্রহণ করতে...যারা এলে, তিনি হবেন সম্পূর্ণ...নতুন মানুষের অগ্রদূত...ধরণী-কুন্তীর দৈব-সন্তান...যারা নতুন করে রচনা করবে জীবন দিয়ে নতুন মহাভারত...

তাই সহস্রের আসা-যাওয়ার মধ্যে তিনি উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন, কখন তারা আসবে...

দিনের বেলায় লোকজনের মধ্যে কোন রকমে সে-বিরহ-জ্বালাকে তিনি ঢেকে রাখেন কিন্তু যখন সন্ধ্যা নামে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাত্রীরা যে-যার যায় ফিরে, তিনি আর থাকতে পারেন না...গঙ্গার তীরে তীরে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ান...চিৎকার করে ডাকেন, ওরে আয়, ওরে তোরা আয়...

মেঘেতে ছিল জল, মাটিতে ছিল তৃষ্ণা...মেঘ আর মাটিতে একদিন হয় দেখা...

কলকতার সিমলা-পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি, তিনি ঠাকুরকে নিয়ে এসেছেন তাঁর বাড়িতে...সে খবর ছড়িয়ে পড়ে পাড়ায়...দলে দলে লোক আসে ঠাকুরকে দেখতে...

ঠাকুর গান শুনতে ভালবাসেন, তাই মিত্তিরমশাই বেরিয়েছেন একজন ভাল গায়ক ধরে আনতে...

পাড়ায় বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন খুব ভাল গান গায়, তিনি লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন...তাই ছুটলেন তাকে আনতে।

সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, গান শুনতে চান...মিত্তিরমশাই অনুরোধ করেন।

সাধু দেখে দেখে নরেন্দ্রের মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল...অনায়াসে ভিখ্ মিলবে তাই সবাই সাধু...

নরেন্দ্রের অত গরজ নেই সাধু-সন্ন্যাসীকে গান শোনাতে...

কিন্তু মিত্তিরমশাই নাছোড়বান্দা। অগত্যা নরেন্দ্র রাজী হয়...

গান যতক্ষণ হয় ঠাকুর একদৃষ্টিতে নরেনের দিকে চেয়ে থাকেন...

তাঁর মন বলে ওঠে, এইতো সেই...এইতো সেই...তাঁর প্রতীক্ষার ধন...

গান শেষ হতেই নরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি ভাল করে তাঁর অঙ্গ-লক্ষণ সব দেখেন...সর্ব-অঙ্গে ভগবৎলক্ষণ...দেখতে দেখতে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে...

আকুল আগ্রহে বলেন, হাঁরে, আসবি দক্ষিণেশ্বরে?

নরেন্দ্র নিস্পৃহ...

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করছেন...

বাঙলাদেশের সেই সময়কার তরুণদের মনের সামনে জীবন ও ধর্মের এক নতুন আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন। সমাজকে ভেঙে-চুরে এক নতুন জীবন্ত রূপ দিতে হবে...

নরেন্দ্রের শিক্ষিত মনে তার প্রভাব এসে পড়লো...

একদিন সমাজের ধর্মকার্য শেষ হয়ে গেলে নরেন্দ্র মহর্ষির সামনে উপস্থিত হলেন...

সরাসরি সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

মহর্ষির কাছেও স্পষ্ট করে সে কথার উত্তর তিনি পেলেন না...

অন্তরের চাঞ্চল্য যত বাড়ে, বাইরেটা তত স্থির হয়ে আসে...

বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের ভাবান্তর দেখে দ্রুত বিবাহের আয়োজন করেন...

আয়োজন যখন প্রায়ই পেকে আসছে, সেই সময় নরেন্দ্র আপত্তি জানালেন, বিয়ে তিনি করবেন না...মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেও নয়।

তাদের পরমাত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝলেন কি নিদারুণ ধর্ম-পিপাসা থেকে নরেন্দ্র এই কঠোর আদর্শ গ্রহণ করতে চলেছেন, তিনি আর বাধা দিলেন না, বললেন, তা হলে এখানে-সেখানে ঘুরে না বেড়িয়ে, দক্ষিণেশ্বরে যাও...রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে...

নরেন্দ্রের মনে পড়লো, সুরেন মিত্তিরের বাড়ি সেই আধপাগলা লোকটা কথা নেই, বার্তা নেই, তুই তুই করে বসলো...

সেই সংগে মনে পড়লো, কলেজের হেস্টি সাহেবের সেই অভিজ্ঞতা।

মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে...ঘুরে ফিরে খালি সেই আধপাগলা লোকটার চেহারা মনে পড়ে—

সুরেন মিত্তির বার বার করে অনুরোধ করেন, ঠাকুর নিজে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন...

একদিন নরেন্দ্র ঠিক করলেন, দক্ষিণেশ্বরে যাবেন তিনি!

নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না...

একটার পর একটা নরেন্দ্র গান গেয়ে যান, ঠাকুর তন্ময় হয়ে শোনেন।

বিশেষ কিছু কথাবার্তা আর হয় না...

গান শেষ হয়ে গেলে যাবার জন্যে নরেন্দ্র উঠলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠে এসে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ঘরের বাইরে বারান্দায় চলে এলেন...সেখান থেকে পাশের একটা ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিলেন।

বন্ধঘরে দুজনে একা...

নরেন্দ্র অবাক্...পাগলের একি খেয়াল আবার!

চেয়ে দেখেন, পাগলের দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে...

নরেন্দ্র নিস্পন্দ...নির্বাক...

হঠাৎ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগল বলে ওঠে, যেন কত কালের পরিচিত তিনি —হাঁরে, এমনি করে আমাকে বসিয়ে রাখতে হয়? এত নিষ্ঠুর তুই? বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল! প্রাণের কথা কইবো, একটা লোকও পাই না...

নরেন্দ্রের বাক্‌শক্তি পর্যন্ত যেন চলে গেল...এ উন্মাদ বলে কি? আমি এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র—আমাকে এ পাগল এসব কি বলে?

তাড়াতাড়ি খিল খুলে ঘর থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এসে, নরেন্দ্রের মুখে তুলে দিয়ে বলে, আয় নিজের হাতে তোকে খাইয়ে দিই!

নরেন্দ্র বলেন, দিন না আমার হাতে, বন্ধুরা সব রয়েছে, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাব!

পাগল কাঁদতে কাঁদতে বলে, তারা খাবে'খন...তুই খা...আয়...

মা যেমন কোলের ছেলেকে খাইয়ে দেয়, তেমনি করে ঠাকুর নিজের হাতে নরেন্দ্রকে খাইয়ে দেন।

খাওয়ানো হয়ে গেলে বলেন, বল্, তুই একলা শিগগির আসবি আমার কাছে। বল্?

নরেন্দ্র বিহ্বলের মত বলেন, হাঁ।

ঘরে ফিরে এসে আবার সকলের সঙ্গে তাঁরা দুজনে বসেন। নরেন্দ্রের মনে ঝড় উঠেছে...তুমুল ঝড়...কে এ উন্মাদ? কেন তাঁর স্পর্শে তাঁর চৈতন্যের মর্মমূল পর্যন্ত এমন আলোড়িত হয়ে উঠেছে?

হঠাৎ নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

এ প্রশ্ন নরেন্দ্র বহুবার বহু লোককে করেছেন...উত্তর কি হতে পারে, তা-ও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল...কিন্তু এই জীবনে প্রথম সেই উন্মাদের মুখে এই প্রশ্নের এমন সহজ উত্তর শুনলেন যে, তিনি নিজেই অবাক্ হয়ে গেলেন।

—ওরে, এই তোকে যেমন ঠিক সামনে দেখছি...তেমনি করে তাঁকে দেখেছি...ঠিক এমনি করেই তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়।

নরেন্দ্র এ উত্তর শুনবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না...সহসা তাঁর মনে হলো, তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গিয়েছে...চোখের সামনে জগতের বস্তু-পুঞ্জ যেন তার সীমারেখা সব হারিয়ে ফেলেছে...

বিহ্বলের মত নরেন্দ্র সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এলেন।

ওধারে দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার তীরে, ঝাউতলায়, অন্ধকারে উন্মাদ ঘুরে বেড়ায় আর কাঁদে, ওরে তুই আয়, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না...আয়!

বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রমুখর ইতিহাসের মধ্যে দুটি মানুষের এই মিলনের কথা...

আত্মার অমর-কাব্য...

নরেন্দ্রের চোখে ঘুম নেই, মুখে কথা নেই...সর্বদাই মনে হয় কে যেন টানছে, কে যেন ডাকছে...কে যেন মর্মমূলে বসে কাঁদছে!

নরেন্দ্র প্রাণপণে নিজেকে ধরে রাখেন...বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সমস্ত মীমাংসা...সমস্ত একেবারে তিনি নিজেকে বাঁধতে চেষ্টা করেন...মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন সেই উন্মাদের কাছে আর যাবেন না।

কিন্তু একমাস চেষ্টার পর তিনি দেখেন, একদিন কখন নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে...বাগবাজার পেরিয়ে...বরানগর দিয়ে তিনি চলেছেন...

দক্ষিণেশ্বরের সেই কালীবাড়ি...

বাগানের ভেতরে ঢুকলেন...ধীরে ধীরে মন্দিরের সোপানের ওপর উঠলেন... সেখান থেকে দেখা যায়—ওই ঘর...তাঁকে টানছে।

তিনি নীরবে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন...

আজ আর ঘরে অন্য কেউ নেই...শুধু সেই উন্মাদ...

নরেন্দ্র নীরবে ঘরের একপাশে বসলেন, অন্তরে আশঙ্কা, এইবার বুঝি পাগল আবার ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরবে...প্রলাপ বকবে!

কিন্তু উন্মাদ আজ স্থির...আকাশের মত সুগভীর...মুখে কি প্রশান্ত হাসি... চোখের দৃষ্টি পলকহীন, স্থির...যেন কালের যবনিকা ভেদ করে চলে গিয়েছে কালাতীত কোন মহা-ভবিষ্যতে।

এমন সময় দেখেন, উন্মাদ ধীরে ধীরে আসন থেকে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। নরেন্দ্রের কাছে এসেই ডান পা বাড়িয়ে উন্মাদ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলো... সে স্পর্শে নিমেষে নরেন্দ্রের চৈতন্য পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল...

নরেন্দ্রের স্পষ্ট বোধ হতে লাগল, "ঘরের দেওয়ালগুলোর সঙ্গে ঘরের অন্য সমস্ত জিনিস ঘুরতে ঘুরতে যেন কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে...সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হতে ছুটে চলেছে...দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে নরেন্দ্রের মনে হলো, মরণ অতি নিকটে...সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠলেন, "ওগো, তুমি আমায় এ কি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন!"

উন্মাদ অট্টহাস্য করে উঠলো...

নরেন্দ্রের কাছে বসে, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, তবে এখন থাক... একেবারে কাজ নেই...কাল হবে!*

কি আশ্চর্য! হাতের স্পর্শে নরেন্দ্র আবার প্রকৃতিস্থ হলেন...

চোখের সামনে বস্তুর যে মহাবিপর্যয় দেখছিলেন, নিমেষের মধ্যে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল...তিনি দেখেন, সে ঘর ঠিক তেমনি আছে...তিনি ঠিক তেমনি বসে আছেন...

---

* বিবেকানন্দের নিজের উক্তি থেকে

নরেন্দ্রের সমস্ত অন্তর আলোড়িত করে প্রশ্ন জাগে, কে এ উন্মাদ, যে নিমেষের মধ্যে, শুধু একটি স্পর্শে, তাঁর সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত মহা-শূন্যে লীন করে দিল? কি এ শক্তি, যার স্পর্শে নিমেষের মধ্যে তার অন্তরে যুগান্তর বিপর্যয় ঘটে গেল? এ কি ভোজবাজি...না জাদু? না, অন্য আর কিছু?

যে রহস্যের নিরুদ্ধ দ্বারের কাছ থেকে সব মানুষের সব জিজ্ঞাসা বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে, সে মহা-রহস্যের দ্বার-উন্মোচন-মন্ত্র...তবে কি জানে শুধু এই উন্মাদ?

নরেন্দ্র স্থির করেন, যেমন করেই হোক...জানতে হবে এই উন্মাদকে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বহুলোকের ভিড়...

ঠাকুর নরেন্দ্রকে আড়ালে ডেকে বললেন, বেড়াতে যাবি?

পাশেই ছিল যদু মল্লিকের বাগান-বাড়ি...ঠাকুরের জন্যে সে বাড়ির দ্বার অবারিত থাকতো সব সময়...

নরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে ঠাকুর অনেকক্ষণ বেড়ালেন...তারপর বাগান-বাড়ির একটি ঘরে গিয়ে বসলেন...

নরেন্দ্র পাশেই বসলেন...কিন্তু পাশ ফিরে দেখেন, ঠাকুর নিস্পন্দ যেন পাথরের মূর্তি...

নরেন্দ্র বিস্মিত হয়ে সেই পাথরের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন...যেন তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই নেই...

নরেন্দ্রের মনে ভয়...গত দিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে...সেদিন অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর মধ্যে যে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল, আজ যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্যে মনকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

কিন্তু হঠাৎ সেই পাথরের মূর্তি নড়ে উঠলো...এবং তাঁকে স্পর্শ করলেন...

স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লোপ পেলো...

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখেন ঠাকুর তাঁর মাথা কোলে তুলে নিয়ে, বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন...

নরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেন, এই ভাবে এক জাদুকরের হাতে তিনি কিছুতেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে নষ্ট হতে দেবেন না...

উন্মাদ জাদুকরের কাছে কিছুতেই যাবেন না।

জাদুকরের মনে কিন্তু অসহ্য বিরহ-জ্বালা...

নরেন্দ্র আসে না...ঠাকুর বালকের মত কাঁদেন...একে ওকে তাকে বলেন, হাঁ গা, তোমরা জান, নরেন কেমন আছে?

গভীর রাত্রি, দক্ষিণেশ্বরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে...

ঠাকুরের চোখে ঘুম নেই...

পাশের ঘরেই তাঁর ভাগনে রামদয়াল ঘুমুচ্ছিলেন...

চুপি চুপি ঘরে ঢুকে তিনি রামদয়ালকে ডাকেন, ওগো তোমরা ঘুমুলে?

রামদয়াল জেগে দেখেন পরনের কাপড়খানি বগলে জড়িয়ে ধরে ঠাকুর কাঁদছেন...

সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ে...কি ব্যাপার!

কেঁদে ঠাকুর বলেন, ওগো, তোমরা কেউ একবার নরেনের কাছে যাও না...তাকে একটিবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বোলো...তার জন্যে ভেতরটা যেন গামছা-নিংড়োনোর মত মোচড় দিচ্ছে...

কিন্তু তাঁর মন বোঝে না...সারারাত পাগলের মত তিনি কেঁদে কেঁদে বেড়ান...

বাড়ি-ঘর-দোর, আত্মীয়-স্বজন কিছুই আর ভাল লাগে না...নরেন্দ্র বাড়ি ছেড়ে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিলেন...বাড়িতে বোঝালেন পড়ার চাপ পড়েছে...বাড়িতে সব অসুবিধা...

একলা ঘরে একা থাকেন...দিন কাটে চিন্তায়...রাত কাটে ধ্যানে...

নেশার মত পেয়ে বসে ধ্যান...

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তিনি কি ভুল পথে চলেছেন?

শাস্ত্র খুলে দেখেন...অন্ধকার পথে চাই দীপশিখা...গুরু জ্বালিয়ে দেন সেই দীপশিখা...তাই গুরুর প্রয়োজন...

গুরুহীন সাধনা নিষ্ফল...

নরেন্দ্রের বিদ্রোহী মন অস্বীকার করে নিজের ব্যক্তিত্ব অন্ধভাবে আর একজনের হাতে তুলে দিতে হবে? না জেনে, না বুঝে, কোন কিছু গ্রহণ করবার জন্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি...চারিদিকে এই মেষশাবকের দল—তাদের সঙ্গে ঘাড় নীচু করে বাঁধা-পথে একসঙ্গে দল বেঁধে চলতে হবে?

তিনি স্বতন্ত্র...তিনি একক...

বহুমূল্যে কেনা সেই স্বাতন্ত্র্য বিনা প্রশ্নে দিতে হবে বিলিয়ে?

নরেন্দ্রের সন্দিগ্ধ মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে...

দক্ষিণেশ্বরে আসেন, যান...কিন্তু উন্মাদের কোন কথাতেই সায় দেন না...

ঠাকুর মিছরি তুলে রাখেন, মাখন তুলে রাখেন নরেন খাবে বলে...নরেন ভর্ৎসনা করে...বিরক্ত হয়...বলে আপনি সন্ন্যাসী মানুষ...আমার জন্যে আপনার এত কান্না কেন?

ঠাকুর হেসে ওঠেন, বলেন, ওরে, তোকে যে আমার দরকার...কত যে দরকার...তা তোকে একদিন দেব বুঝিয়ে...

নরেন্দ্র আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন...নব-দীক্ষিত ব্রাহ্ম তিনি...নিরাকার পরমব্রহ্ম ছাড়া কোন সাকার মূর্তি তিনি বিশ্বাস করেন না...

ঠাকুরকে শুনিয়ে বলেন, ওসব আপনার কল্পনার বিকার...

ভক্ত-শিষ্যরা কণ্টকিত হয়ে ওঠে, যুবকের কি স্পর্ধা...

তাদের থামিয়ে ঠাকুর বলেন, ওরে, ও যে জন্মেছে মানুষ শাসন করতে, ও যে ব্যাটাছেলে...

নরেন্দ্রকে ডেকে বলেন, হাঁরে, আমার মাকে যদি স্বীকার না করবি, তবে এখানে আসিস কেন?

ঘাড় সোজা করে নরেন্দ্র উত্তর দেন, এখানে আসি বলে, আপনার মাকেও স্বীকার করতে হবে?

হেসে ঠাকুর বলেন, ওরে একদিন মা মা করে তুই কাঁদবি!

নরেন্দ্র চমকে ওঠেন—কোথা থেকে কি বিশ্বাসে এই জাদুকর এত জোর দিয়ে কথা বলেন?

এত সযত্নে গড়ে তোলা তাঁর ব্যক্তিত্ব, এই উন্মাদ একটি স্পর্শে কাদার তালের মত চটকে যা খুশি তাই করে তোলে—একি জাদু, না, সর্বত্যাগী ভগবৎ-দ্রষ্টার আলোক-সম্ভব বিভূতি?

যাই হোক, বিনা পরীক্ষায়, বিনা প্রমাণে তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না।...

ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে চেয়েই বোঝেন, কি ঝড় সেখানে বইছে...নিজের বেদনা দিয়ে অনুভব করেন, আলোক ও অন্ধকারের সেই মহাদ্বন্দ্ব মানবের চিত্তাকাশে...

সে খান্ডব দহন-জ্বালা তিনি জানেন...

তিনি জানেন, তাকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি নেই...

তাই নরেনকে দেখে একদিকে তাঁর মন বেদনায় ভেঙে পড়ে, আর একদিকে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে...

সৃষ্টির সুপবিত্র বেদনায় প্রিয়তম শিষ্যের মধ্যে আজ তাঁরই আত্মা নব-জন্ম গ্রহণ করছে...

সুনিপুণ ধাত্রীর মত তিনি ধীরে ধীরে সেই নব-জাতককে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন...

নরেন্দ্র যখন ভাবেন যে তিনি স্বাধীন, তিনি মুক্ত, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি জানেন না কি কঠোর বন্ধনে সেই উন্মাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন...

অসীম বিস্তারের মধ্যে কি নিগূঢ় বন্ধন...

ক্রমশঃ সে আকর্ষণে নরেন্দ্র বাঁধা পড়েন...সে প্রেমে দেবতা মানুষ হয়...

অন্য সব ভক্তদের মত নরেন্দ্রের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, সেবা করতে...

ঠাকুর বাধা দেন...না, না, তোর এ-কাজ নয়, তোর পথ আলাদা...

একটু একটু করে শিক্ষা আরম্ভ হয়...

হঠাৎ একদিন বলেন, ওরে, আমাকে অষ্টাবক্রসংহিতা পড়ে শোনা না...

অদ্বৈত...বেদান্তের গ্রন্থ...

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরেন্দ্র পড়ে শোনান...পড়া শেষ হয়ে গেলে বলে ওঠেন, এ আমি মানি না, স্বীকার করি না...এ দর্শনে আর নাস্তিকতায় তফাত কোথায়? আমি স্রষ্টার সমান? আমি আর স্রষ্টা এক? এই ঘট, এই বাটি, এই গাছ...এ-ও ভগবান, আর আমিও ভগবান?

ঠাকুরের তখন অর্ধ সমাধি অবস্থা...তার মধ্যে উঠে এসে সহসা তিনি নরেন্দ্রকে

স্পর্শ করলেন...তিনি বুঝেছিলেন, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাড়া নরেন্দ্রের অদ্বৈত চেতনা জাগবে না...সে জানতে চায় না, সে দেখতে চায়, সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চায়...তাই মহাপুরুষ স্পর্শ দিয়ে সেই মহাশক্তি, যা না হলে বিশ্ব-রহস্যের পাঠোদ্ধার অসম্ভব, তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন...

সে স্পর্শে ক্ষণিকের মধ্যে ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্র সমাধিস্থ হয়ে গেলেন...

স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলেন, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই...

বহুক্ষণ ধরে সে মহা-দৃশ্য দেখেই চললেন...ভাবলেন, দেখি, কতক্ষণ পর্যন্ত ওই ভাবে থাকে...

সমাধি ভেঙে গেল কিন্তু সে ঘোর কাটলো না...

বাড়িতে ফিরলেন...সেখানেও তাই...যা কিছু দেখেন...সবই এক...

মা খেতে দিলেন...অন্ন...ব্যঞ্জন...যিনি পরিবেশন করছেন...যাকে পরিবেশন করা হচ্ছে...সবই এক...

দু' গ্রাস মুখে দিয়ে তিনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে আর অন্ন দিতে পারেন না...

মা বলে ওঠেন, বসে আছিস্ কেন রে, খা—না!

মার কথায় হুঁশ হওয়াতে আবার খেতে আরম্ভ করেন...

খেতে...শুতে...কলেজে যেতে সব সময়...সেই এক ভাব...

বাতাসের মত ঘিরে আছে...সমগ্র বস্তুর জগতে সমস্ত ভেদরেখা সহসা কি করে মুছে গেল?

রাস্তায় চলেছেন...গাড়ি আসছে...ঘাড়ে এসে পড়বে, ওটা গাড়ি...সে-বোধই নেই...

খেতে খেতে যখন খাওয়া থেমে যেতো...সেখানে শুয়ে পড়তেন...

আবার খেতে বসতেন...

একটু একটু করে ঘোর ক্রমশঃ কমে আসে...বস্তুর জগৎ মনে হয় স্বপ্নময় দূরে...

পথ চলতে হেদুয়ার পুকুরের লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকে দেখেন, ওটা রেলিঙ কিনা...আঘাত লাগে কিনা...

ঘোর কেটে আসে...নরেন্দ্রের মনে একটু একটু করে আনন্দ জাগে...

প্রত্যক্ষ পাওয়ার আনন্দ—অদ্বৈত জ্ঞানের আলো...

গুরু আর শিষ্য ক্রমশঃ দূর থেকে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন...

একটু একটু করে নরেন্দ্রের মনের সন্দেহ কেটে যায়...গুরু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে সে সন্দেহ কাটিয়ে দেন; শিষ্য অনুভূতির কষ্টিপাথরে আঁক কেটে দেখে নিয়ে তবে স্বীকার করে। দুটি মানুষ...পরস্পর পরস্পরকে জানার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোথাও নেই...

তবু সন্দিগ্ধ মনের পরীক্ষার অন্ত নেই...

গুরু নিজে শিষ্যদের ডেকে বলেন, ওরে যাচাই করে নিবি...সেকরা যেমন সোনা কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়, তেমনি করে গুরুকে যাচাই করে নিবি...

নরেন্দ্র প্রতিপদে যাচাই করেন...যত পরীক্ষা করেন, ততই তাঁর মনের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে ভেঙে যায়...

সেই সঙ্গে বোঝেন কি অপূর্ব কৌশলে সেই মায়াবী তাঁকে তাঁর কাছে টেনে নিচ্ছে। তাঁর সব অহমিকা ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলে দিচ্ছে...

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেন, ঘর খালি ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন...

হঠাৎ মনে হলো, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দেখবো তুমি কেমন সর্বস্ব ত্যাগ করেছ?

এই ঠিক করে তাঁর বিছানার চাদরের তলায় একটা টাকা লুকিয়ে রেখে দেন...

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ফিরে এলেন...বিছানায় বসলেন...কিন্তু বসতে না বসতেই বালকের মত বেদনায় চিৎকার করে উঠলেন, ওরে, জ্বলে গেল জ্বলে গেল...চাদর তুলে দেখ,...

নরেন্দ্র নির্বাক বিস্ময়ে ঘরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন...দু'চোখে তাঁর জল...ধীরে ধীরে এসে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন...

নদী সাগরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল...

সে-কথা জগতে কেউ জানে না—জানে শুধু গুরু, আর জানে শিষ্য,...কখন এলো সে মহা-লগ্ন...কখন উঠলো ফুটে...হৃদয়-কমল সহস্রদল...গুরু শিষ্যতে হলো সম্পূর্ণ...

শিষ্য গুরুতে হলো লীন...জলে জল যেমন হয় লীন...

একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিভৃতে ডেকে বলেন, দেখ্ মার দয়ায় আমার অনেক বিভূতি আছে—ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারি...কিন্তু আমি নেংটা, আমার কাপড়ের কোন ঠিক থাকে না—আমি সেসব নিয়ে কি করবো বল্...মা বলছে, তোকে মার দরকার...জগতে তোকে অনেক কাজ করতে হবে...তুই চাস তো বল্, এই মুহূর্তে তোকে আমি সেগুলো দিয়ে বাঁচি? জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল...দেব-দুর্লভ মায়া-শক্তি যার এক কণা পেলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়...আজ শুধু চাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে...চাইলেই পাওয়া যায়...অনায়াসে, বিনাশ্রমে...

কিন্তু নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, সে সব শক্তি নিয়ে কি আমার ঈশ্বরলাভ সহজ হবে?

ঠাকুর বলেন, না...ঈশ্বর লাভ হলে, যখন কাজ করতে নামবি, তখন অনেক কাজে লাগবে...

নরেন্দ্র বলেন, না, তবে ওসব আমার চাই না...আশীর্বাদ করুন, আমার ঈশ্বর লাভ হোক...

গুরুর মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ওরে, সব ত্যাগ করে, আজ তুই সব পেলি।

তবু ঝড় থামে না...

একদিকে ঝড় থামে...আর একদিকে ওঠে...

হঠাৎ বিশ্বনাথ দত্ত পরলোক গমন করলেন...

সমস্ত সংসার নরেন্দ্রের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো...

এতদিন যাকে অস্বীকার করে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন, আজ সে শত নাগপাশে তাঁকে বেঁধে ফেললো...

পিতা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—পৈতৃক ভিটাটুকু পর্যন্ত আত্মীয়েরা দখল করে নিল...

মাসে মাত্র ত্রিশ টাকা ভরসা...সেই ত্রিশ টাকায় একটা বিরাট সংসার...

তারপর পিতৃ-ঋণ...পাওনাদারেরা পথ আগলে দাঁড়ালো...

অনাহারে কলকাতার রাস্তায় অফিস থেকে অফিসে ঘুরে বেড়ান...সামান্য চাকরি...কেউ দেয় না...

কিছুদিন আগেও যে-সব বন্ধুরা যেচে এসে খবর নিতো, সেধে গিয়েও তাদের দেখা পাওয়া যায় না...

নিজের অনাহার সহ্য করা যায়...কিন্তু মা, ভাই, বোন অনাহারে থাকবে...এ চিন্তা নরেন্দ্রকে পুড়িয়ে ফেলে...

সকাল হলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান...মা কোন-রকমে এক মুঠো সিদ্ধ করে ডাকেন, খেয়ে যা...

নরেন্দ্র ওজুহাত দেখান, নেমন্তন্ন আছে মা, মনে মনে জানেন...তাঁর অংশটুকু অন্ততঃ একজনেরও উপবাস দূর করবে...

এক পথ থেকে আর এক পথে...তৃষ্ণায় যখন গলা শুকিয়ে যায়, রাস্তার কলের জল অঞ্জলি ভরে খান...

মুক্তি-কামী সন্ন্যাসী...দারিদ্র্য বিষ-জ্বালা তাঁরও অন্তর শুকনো খড়ের মত পুড়িয়ে দেয়...

রাত্রিবেলায় অশ্রু-ভার রোধ করে ডাকেন, ভগবান, ভগবান...

একদিন বিরক্ত হয়ে মা বলেন, পেটে ভাত নেই, ভগরান, ভগবান...ছেলেবেলা থেকে ওই সব করে মাটি হলো—ভগবান তো সব করলেন।

বিষধর কালসর্প মাথা তুলে ওঠে! তবে কি সত্যই ভগবান নেই? যদি থাকেন, কেন এ দারিদ্র? কেন এ অসামঞ্জস্য?

নরেন্দ্র নিজের মনের জ্বালা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পর্যন্ত যান না...

অনাহার অভ্যাস হয়ে আসে...

একদিন অনাহারে বর্ষার জলে ভিজে ভিজে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়লো...চলতে আর পারলেন না...এক বাড়ির রকে মূর্ছিত হয়ে শুয়ে পড়লেন...

মূর্ছাভঙ্গে ঠিক করলেন, গুরুকে প্রণাম করে, কাউকে কিছু না বলে সংসার ছেড়ে চলে যাবেন...

শুনলেন, কলকাতায় এক ভক্ত-বাড়িতে ঠাকুর এসেছেন...

অযাচিত ভাবে নরেন্দ্র সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন...কাউকে কিছু না বলে নীরবে এক কোণে বসে রইলেন...

সভা ভঙ্গ হলে গুরুকে প্রণাম করলেন।

হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, আজ তোকে ছাড়বো না, আমি সঙ্গে ধরে নিয়ে যাব...

নরেন্দ্র বহু প্রতিবাদ করলেন...অনেক ওজর-আপত্তি দেখালেন...

ঠাকুর কোন কথাই শুনলেন না...জোর করে গাড়িতে নিয়ে তুললেন...

গাড়িতে দুজনেই নীরব...

দক্ষিণেশ্বরে ঘরে অনেক লোক...ঠাকুর ঘরে এসেই ভাব-ঘোরে চুপ করে বসে আছেন...একে একে লোক চলে যাচ্ছে...

কিছুক্ষণ পরে নরেনকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় এলেন...কোন কথা না বলে, তাঁর দু'হাত ধরে, হঠাৎ গেয়ে উঠলেন—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,
আমার মনে সন্দ হয়...
বুঝি তোমায় হারাই
হা—রাই!

বিস্মিত বিমুগ্ধ নরেন চেয়ে দেখেন, ঠাকুরের দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে...

নরেন্দ্র বুঝলেন, অন্তরে থেকে অন্তর্যামী তাঁর অন্তরের বেদনার কথা বুঝেছেন...

আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ছোট ছেলের মত কেঁদে গুরুর বুকে লুটিয়ে পড়লেন...

ধীরে ধীরে শত-জননীর স্নেহে, আর্ত শিষ্যের কানে কানে বলেন, জানি রে জানি...সংসার তোকে ধরে রাখতে পারবে না...মার কাছে তোর জীবন যে উৎসর্গ করা...তবে, যে কটা দিন আমি আছি, আমাকে ছেড়ে যাস নি...

আজ বহুদূর থেকে, এক অসম্ভব অবিশ্বাসী যুগের এক শিশু কল্পনায় সেই মহাদৃশ্য দেখছে...

দেহাতীত সেই দুই মনের অপূর্ব মিলন...

মানব-ইতিহাসের সেই সুদুর্লভ মহা লগ্ন...

পিঞ্জর ভেঙে যে পাখি বেরিয়েছিল নীলাকাশে, সে এলো আবার ফিরে... পিঞ্জরে...

নরেন্দ্রের সংসার ত্যাগ করা হলো না...

যে সর্বত্যাগী, যার সংসারের কোন বালাই নেই সেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই তাঁকে ফিরিয়ে আনলো সংসারে...

কেন? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর একি খেয়াল?

পরের দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে আবার বাড়িতে ফিরলেন...মনে শুধু এক চিন্তা, হে গুরু, সংসার থেকে সবাইকে তুমি টেনে, আমাকে কেন শুধু সংসারে রাখলে আটকে?

সংসার...দারিদ্র...অপমান...লাঞ্ছনা...দুমুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত হাহাকার... সব দেখা দেয় একে একে...

ঘুরতে ঘুরতে এক এটর্নীর অফিসে কিছু কাজ জুটলো...মাঝে মাঝে...

সেই সঙ্গে জুটলো এক প্রকাশক...বই অনুবাদ করার কাজ...অতি সামান্য পারিশ্রমিক...

তার ওপর স্থায়ী কিছু নয়, স্থিরতাও কিছু নেই।

কোন রকমে দুদিন চলে আবার থেমে যায়...আসে অর্ধাশন...উপবাস...উদরের আধিপত্য...

অন্তর জুড়ে জাগে আশঙ্কা...জীবনের অমৃত-দান শুধু দুমুঠো অন্নের সংস্থানে যাবে নিঃশেষে হারিয়ে?

নামে রাত্রি...ছায়াময়ী...অন্তরের অন্তহীন তামসী রাত্রি...যার নিঃসীম অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে এমনি কত লক্ষ প্রাণের জ্বলন্ত দীপশিখা...নিশ্চিহ্ন...

সে আঁধারে হয়ে যেতে হবে একাকার?

হঠাৎ মনে পড়ে, ঠাকুরের কথা তো মা শোনেন...ঠাকুর যদি আমার হয়ে মার কাছে থেকে নেন্...চেয়ে নিলেই তো তিনি পাবেন...আমার মা-বোনের অন্নকষ্ট থাকবে না...তা হলে তো সব সমস্যা মিটে যায়!

আমার জন্যে ঠাকুর নিশ্চয় তা চাইবেন!

একেবারে সোজা দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুরের সামনে...

—আপনি একবার আমার হয়ে মাকে বলুন! আমি নিজের জন্যে কিছু চাই না ...আমার মা, ভাই আর বোনদের যেন অন্নকষ্ট না হয়!

ঠাকুর হেসে বলেন, বেশ তো, তুই নিজে চেয়ে দেখ্! তোরও তো মা!

বিহ্বল নরেন্দ্র বলেন, মাকে তো আমি জানি না...

—সেই জন্যেই তোর এত কষ্ট রে!

—আমি কোন কথা শুনবো না, আমার হয়ে আপনাকে আজ বলতেই হবে।

—মাকে বলতে গেলে শুনবে কেন? তুই যে মাকে মানিস্ না আর আমি যে মার কাছে কথা দিয়েছি ওসব জিনিস মার কাছে চাইবো না...চাইতে পারি না...তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন?

—কি?

—আজ মঙ্গলবার...আজ রাত্রিতে তুই একা কালীর ঘরে যা...মাকে গিয়ে প্রণাম কর্...মা বলে ডাক...আমি বলছি, মার কাছে যা চাইবি, তাই পাবি...

নরেন্দ্রের মন আশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে...তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় ঠাকুর যখন বলছেন, তখন তা সত্য হবেই...

নিদারুণ উৎকণ্ঠা...আগ্রহ...দেহ-মন বেতস-লতার মত বেপথু...কখন রাত্রি আসবে...কখন সেই মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন...

আজ সব সন্দেহ নিরসন হবে...ভক্ত ও ভগবান দাঁড়াবে মুখোমুখি...বিশ্ব-সংসার, শাস্ত্র, পুঁথি-পত্র...অস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্ব...সব থাকবে বাইরে পড়ে...

অনুভূতি...প্রত্যক্ষ অনুভূতি...

মার স্তন থেকে স্তন-সুধা পান...অমৃতরস...

পাষাণী হবে বরদাত্রী...অন্নপূর্ণা নিজের হাতে তুলে দেবে অন্ন...জীবনের পরমান্ন!

আশায়, আনন্দে, উৎকণ্ঠায় আসে মধ্যরাত্রি...

ঠাকুর বলেন, এবার নিশুতি হয়েছে...যা...

নরেন্দ্র শ্রীমন্দিরের দিকে চলেন...কোন হুঁশ নেই কোথা দিয়ে চলেছেন...সর্ব-অঙ্গে যেন গাঢ় নেশা...চলতে চলতে পা টলে টলে পড়ে যায়...

অন্তরে শুধু এক চিন্তা...এতদিন পরে কি সত্যি দেখা পাবো? ওই মাটির পুতুল...ও কি সত্যি পুতুল নয়? ও কি সত্যিই বিশ্বজননী...চিন্ময়ী...সর্বশক্তি-মূলাধার?

ভাবতে ভাবতে কখন মন্দিরের ভেতরে ঢুকেছেন...প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়েছেন...

দেখেন বিশ্ব-ভুবন আলো করে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বরদাত্রী ...আদ্যাশক্তি...

ভুলে গেলেন সংসারের কথা, তুচ্ছ দুঃখের কথা...অনটনের ব্যথা...কেঁদে বলে উঠলেন, মাগো, বিবেক দাও...ভক্তি দাও...এমনি যেন অবাধ পাই তোর দর্শন।

টলতে টলতে ফিরে এলেন গুরুর কাছে...আনন্দে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত...এ কি দিব্য অনুভূতি...এ কি দর্শন!

হেসে ঠাকুর বলেন, কি রে, মাকে বললি সংসারের কষ্ট দূর করতে?

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনে নরেন্দ্র চমকে ওঠেন...মনে পড়ে সংসারের কথা...বলেন...

—ভুলে গেলাম...চাইতে তো পারলাম না...কি হবে?

—যা যা, ফের যা...ভুলে গেলে চলবে কেন?

নরেন্দ্র আবার যান...কিন্তু মার সামনে গিয়ে আর বলতে পারেন না...শুধু বলেন, মাগো, জ্ঞান দাও...ভক্তি দাও...

বিহ্বল হয়ে ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন...

—কিরে, বলেছিস্ তো?

নরেন্দ্র বলেন, বলবো বলে ঠিক করে যাই কিন্তু সামনে গিয়ে কী জানি কি হয় কিছুতেই বলতে পারি না...কী যেন নেশার মত আচ্ছন্ন করে বসে...কি হবে?

—দূর ছোঁড়া, একটু সামলে নিয়ে কাজের কথা বলতে পারলি না...পারিস তো... আর একবার চেষ্টা করে দেখ্...

নরেন্দ্র আবার ফিরে চলেন...এবার প্রতিজ্ঞা করেন, ঠিক বলবেন...কিন্তু মন্দিরে পা দিতেই তাঁর মনে হলো, এ কি লজ্জা...যিনি বিশ্বের বরদাত্রী তাঁর কাছে চাইবো কিনা এক মুঠো অন্ন?

এ কি দীনতা!

মার সামনে লুটিয়ে পড়ে নরেন্দ্র বলেন, মাগো, অন্য কিছু আর চাই না...তুমি দাও জ্ঞান—দাও ভক্তি...

ফেরবার মুখে মনে হলো, তিন তিনবার চেষ্টা করেও, তাঁর মুখ থেকে ও-কথা বেরুলো না কেন? এ নিশ্চয় ঠাকুরের কারসাজি!

ধরে বসলেন ঠাকুরকে—এ নিশ্চয় আপনার খেলা, কিন্তু তা বলে আপনাকে আমি ছাড়ছি না...আপনি বলুন আমার মা-বোনদের অন্নকষ্ট থাকবে না—তা হলেই হবে!

নরেন্দ্রকে আনন্দে আলিঙ্গন করে ঠাকুর অগত্যা বলেন, আমি বলছি তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

আনন্দে নরেন্দ্র বালকের মত নৃত্য করে ওঠেন...সারারাত ধরে একা গান গেয়ে চলেন—

"তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী মাগো...
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদা শিবের মনোহরা..."

ভোরবেলা ক্লান্ত দুরন্ত শিশুর মত মন্দিরের চাতালে ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনি ধারা চলে গুরু-শিষ্যের পরিচয়...

ফুল যেমন আপনা থেকে ফুটে ওঠে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন, নরেনের মন তেমনি আপনা থেকে ফুটে উঠুক...

বলতেন, ও যে সহস্র-দল কমল!

নিবিড় ধ্যানে নরেন্দ্র ডুব দিলেন...সারারাত্রি সংসারে যখন সবাই ঘুমে অচেতন, নরেন্দ্র ধ্যানে আত্মহারা...

ভোরবেলা শহরের কারখানাগুলো থেকে কলের বাঁশি বেজে ওঠে...

সে শব্দে ধ্যান ভেঙে যায়...ব্যাঘাত হয়...

শিষ্য গুরুকে এসে জানালেন...এর কি প্রতিকার?

সর্ব-সাধন-সিদ্ধ গুরু উপদেশ দেন, ওই কলের আওয়াজের ওপরই মন স্থির কর!

নিষ্ঠাবান শিষ্য তাই করে...

প্রতিদিন বাঁশি বাজে...কিন্তু আর ব্যাঘাত হয় না...

যে মন একদিন বিশ্ব জয় করেছিল, এমনিভাবে সে মন গড়ে উঠেছিল...বিশুদ্ধ দেহে দুষ্কর তপস্যার মধ্য দিয়ে...

ধ্যান করতে করতে অনেক সময় দেখতেন, নিবিড় ধ্যানের মধ্যেও দেহ-অনুভূতি রয়েছে...

তবে শাস্ত্র যে বলে, মনের আছে সে শক্তি, দেহ-অনুভূতিকে যা দিতে পারে একেবারে বিলুপ্ত করে?

আবার শরণাপন্ন হন গুরুর...

গুরু নখ দিয়ে দুই ভ্রূর মাঝখানে আঘাত করে বলেন, ওই আঘাতের ওপর চিত্ত স্থাপন কর!

শিষ্য তাই করেন...

জাগে দেহজয়ী বীর সন্ন্যাসী।

আত্মসর্বস্ব অবিশ্বাসী যুগের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদস্বরূপ জাগে ভারতের দিব্য-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ...নূতন মানব...

নূতন মানব, বিশ্ব রয়েছে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে নূতন সন্ন্যাসী...বিশ্বের আছে নূতন দাবি তোমার ওপর...

সেকথা জানে না তখন কেউই...জানে না নূতন মানব নিজে।

ধ্যানের আছে তীব্র মাদকতা...যে মাদকতার নেই জগতে তুলনা...

নরেন্দ্রের মন পেয়ে বসে সে মাদকতা...সমাধি...মুক্তি...

শঙ্কিত হয়ে ওঠে গুরু...নূতন মানবের স্রষ্টা...

সেদিন জগতে একমাত্র তিনিই জানতেন, কি মহা ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে ওই ধ্যানসর্বস্ব শিষ্যটির জন্যে...

ধ্যানের আত্মবিলুপ্তির মাদকতা থেকে ফেরাতে হবে নূতন মানবকে...

নূতন সন্ন্যাসীকে দীক্ষিত করতে হবে নূতন কর্ম-সন্ন্যাসে...

অরণ্য নয়, জগত চায়, নূতন সন্ন্যাসীকে...

সেদিন সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাঙলার এক নগণ্য গণ্ডগ্রামে অশিক্ষিত এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আপনার অসাধারণ সাধনার দিব্য-জ্যোতিতে দেখেছিলেন নিখিল মানবের মুক্তির স্বপ্নকে...বুঝেছিলেন, ধর্মকে দিতে হবে নূতন সংজ্ঞা...সুনিশ্চিত অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করতে হবে মানুষের বামদর্পী বাহির সর্বস্ব সভ্যতাকে—

তাই দেব-দুর্লভ মহাশক্তির অধিকারী হয়েও, তিনি সেদিন দীন ভিক্ষুকের মত অপেক্ষা করে ছিলেন, আর এক মহামানবের জন্যে যে নিজের বিরাট স্কন্ধে বিশ্বের সেই কর্মভার বহন করতে পারবে...

তিনি দেখেছিলেন, সে মহামানব, তারই শিষ্য...আত্মমুক্তির স্বপ্ন থেকে ফেরাতে হবে তার মনকে বিশ্বের মুক্তির পথে...

তাই তাঁর শঙ্কা...নরেন্দ্রের ধ্যান-মাদকতা দেখে...

কথা হচ্ছিল বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে...ঠাকুর বলছিলেন, বৈষ্ণব ধর্মের তিনটি প্রধান বিষয়, নামে রুচি, জীবে দয়া আর বৈষ্ণব পূজন...

ব্যাখ্যা করে শিষ্যদের বোঝাচ্ছিলেন সব জীবকে ঈশ্বরের অংশ জেনে দয়া করা......

কিন্তু হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন...সমাধিস্থ...বহুক্ষণ পরে সমাধি ভাঙলে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, জীবে দয়া, তুই কীটানুকীট...জীবে দয়া করবার তুই কে? ওরে জীবে দয়া নয়...দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

নরেন্দ্রের মনে যেন দপ্ করে অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে...সেবা...আর্ত মানবতার সেবা...

পরমহংসদেবের অন্য শিষ্যরাও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন...কিন্তু তাঁরা বুঝলেন না, কেন তিনি সে কথা বললেন আর সে কথার তাৎপর্যই বা কি?

কিন্তু যাঁর জন্যে সে কথা বলা...তাঁর মনে তীব্র আলোড়ন জেগে উঠলো...

বেদান্ত কি মানুষকে মানুষের সংসার থেকে টেনে বনে নিয়ে যাবে?

বনের বেদান্ত কি ঘরে আনা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়...গুরু তো তাই বললেন...

জীব ও জগৎ...তাঁরই একান্ত প্রকাশ...

সম্মুখে কোটি কোটি নারায়ণ ক্ষুধার্ত আর্তমূর্তিতে আমারই জীবনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে...তাদের ছেড়ে কোথায় খুঁজছি ঈশ্বর?

বেদান্তের নতুন রূপ নরেন্দ্রের চোখের সামনে ফুটে ওঠে...

কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীর তাতে মন ভরে না...তৃষ্ণা ওঠে বেড়ে...প্রেম চায় স্পর্শ...তত্ত্ব নয়...

যে স্পর্শে সব চেতনা যাবে লুপ্ত হয়ে...ভাবের অতল গভীরে ভক্ত আর ভগবান যাবে একাকার হয়ে...

কোথায় সে ভাব-সমাধি? কতদূরে সে দিব্য-অনুভূতি? যার দিব্য প্রকাশ দেখেছেন গুরুর মধ্যে?

নরেন্দ্র আরও গভীর ভাবে, নিবিড় ভাবে মেতে ওঠেন ধ্যান-সাধনায়...দেখেন, ঠাকুরের কোন কোন শিষ্য সেই দিব্য-অনুরাগে নাম স্মরণেই বিবশ হয়ে পড়েন...যেন দেহে প্রাণ নেই...

নরেন্দ্রের মনে শঙ্কা জাগে, কই, আমার তো ওরকম হয় না?

থাকতে না পেরে গুরুকে নীরবে মনের বেদনা জানান...

গুরু আশ্বাস দিয়ে বলেন, ওরে এতে দুঃখ পাবার কি আছে?

হাতি যখন ছোট পুকুরে এসে পড়ে, তখন পুকুরের জল তোলপাড় হয়ে ওঠে...কিন্তু যখন গঙ্গায় নামে তখন জল যেমন থির, তেমনি থিরই থাকে...যাদের দেখে তুই দুঃখ করিস ওরা হলো সেই ছোট্ট পুকুর...বিরাটের একটু ছোঁয়া লেগে, ওরা তাই মূর্ছিত হয়ে পড়ে...তুই হলি যে সেই নদী...বিরাট সাগর...

তবু মন বোঝে না—

সংসার ব্যঙ্গ করে...বন্ধুরা সন্দেহ করে...

সকলে এসে নরেন্দ্রকে ধরে, তোর সঙ্গে বাগানে যেতে হবে...

সরল মনে নরেন্দ্র রাজী হয়...

সব বন্ধু মিলে গাড়ি করে কলকাতা থেকে কিছু দূরে এক বাগানবাড়িতে এসে হাজির হলেন...

খাওয়া-দাওয়া...গান-বাজনা প্রচুর হলো—

নরেন্দ্র একটার পর একটা গান গেয়ে যান—বন্ধুরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শোনেন—

হঠাৎ একজন বলে ওঠে, নরেন, তুই একটু জিরো...

নরেন্দ্র ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলেন...

—বারান্দার ওই ঘরে তুই একটু বিশ্রাম কর গে যা...তোর দরকার...

সত্যই বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ হওয়ায় নরেন্দ্র উঠে বারান্দার ঘরে যান...

তার কিছুক্ষণ পরেই দেখেন, সেই ঘরে এক তরুণী নারী...সুন্দরী সুবেশা, তাঁর কাছে এসে বসলো...

নরেন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না...সহজভাবে সহোদরা-জ্ঞানে তরুণীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন—কে সে? কি পরিচয়?

তরুণী তার জীবনের নানা কাহিনী বলে যায়...কত দুঃখে...কত যন্ত্রণায়...কত অভাবে তার দিন কাটে...

নরেন্দ্রের মন অসহায় নারীর সেই করুণ কাহিনীতে ব্যথিত হয়ে ওঠে...

সেই সুযোগে তরুণী তাঁর সঙ্গ কামনার ইঙ্গিত জানায়...

সর্প-আহত ব্যক্তির মত নরেন্দ্র উঠে দাঁড়ান, বলেন,—ক্ষমা করবেন...আমি চললাম ...আপনার কথা শুনে সত্যিই আমি ব্যথিত। যে জীবন যাপন করছেন, তা যদি মনে প্রাণে বুঝে থাকেন যে অন্যায় ও অস্বাভাবিক, তাহলে একদিন হয় তো তার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন...

এই বলে নরেন্দ্র দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন...

দরজার সামনে বন্ধুদের দেখে বলেন,—একজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে এরকম খেলা করা কি ঠিক ভাই!

যত দিন যায়, গুরু শিষ্যকে ততই আঁকড়ে ধরেন...

কিন্তু সে আকর্ষণের মধ্যে কোন বন্ধন নেই...সব শিষ্যদের মধ্যে তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি, নরেন্দ্রের উপর সদা-সর্বদা...

শত-জীবন সাধন করে যা পাওয়া যায় না সেই অপূর্ব দেবশক্তি, তিনি আজ বহু সাধনার ফলে, বহু বেদনার ফলে অর্জন করেছেন...তিনি জানেন সেইটুকুই তাঁর আয়ু ...তাঁর ভবিতব্যতা...

তাই গঙ্গার তীরে, সেই অপরূপ ঐশ্বর্য নিয়ে, কৃপণের মত নিজেকে লুকিয়ে, তিনি অপেক্ষায় ছিলেন, কখন আসবে তাঁর আত্মার উত্তরাধিকারী...যার হাতে তাঁর সঞ্চিত সব ধন তুলে দিয়ে তিনি হবেন রিক্ততায় সম্পূর্ণ...

ধ্যানের তৃতীয় নয়নে তিনি দেখেছিলেন, নরেন্দ্র তাঁর সেই উত্তরাধিকারী... ভারতের পুঞ্জীভূত তপস্যার ফল যাঁর হাতে তাঁকে তুলে দিয়ে যেতে হবে...জগতের কল্যাণে—সমগ্র মানবতার কল্যাণে...

তাই তিলে তিলে, দিনে দিনে, নিজেকে রিক্ত করে, সেই মহাজনদের যোগ্য করে শিষ্যকে গড়ে তুলছিলেন...

এ দেওয়া-নেওয়ার তুলনা মানুষের লেখা ইতিহাসে আর নেই...

এ ভালবাসা মৃত্যুমলিন মর্ত্য-ভূমিতে স্বর্গখণ্ডের মত মানবচেতনায় অমর হয়ে রয়ে গেল...

যখন শুনলেন, নরেন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ ঘটেছে, তাঁর সংসারের ভাবনায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মন কেঁদে উঠলো।

তাঁর এক ধনী শিষ্যকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, নরেনের বাড়িতে খাবার সংস্থান নেই...এই সময় যদি তার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতো, বড় ভাল হতো!

সেই কথা শুনে নরেন্দ্রের আত্মাভিমানে নিদারুণ আঘাত লাগে!

তাঁর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা অপরকে বলবার কি দরকার?

শিষ্যটি চলে গেলে নরেন্দ্র রাগে বলে উঠলেন,—ওঁকে ওসব কথা আপনি বলতে গেলেন কেন?

নরেন্দ্রের মনে আঘাত লেগেছে বুঝে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো... তাঁর দুহাত ধরে ছোট ছেলের মত কাতরভাবে ঠাকুর বলে উঠলেন—ওরে, তুই কি জানিস না, তোদের জন্যে না করতে পারি এমন কোন কিছু নেই...দরকার হলে, তোর জন্যে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াতে পারি।

নরেন্দ্রের সব ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যায়...

অগাধ ভালবাসা সেই সঙ্গে তেমনি কঠোর শাসন...

সামান্যতম অশুচিতা যাতে নরেন্দ্রকে স্পর্শ না করে, তার জন্যে ছিল তাঁর অতন্দ্র সজাগ দৃষ্টি...

মহাশক্তির আধার যাকে হতে হবে...তাকে হতে হবে নিশ্ছিদ্র মহান্...

অজ্ঞাতসারে কোন অশুচি লোকের সংসর্গের স্পর্শটুকু যদি নরেন্দ্রকে লাগতো, তিনি জানতে পারতেন এবং অতি রূঢ়ভাবে তখন বলতেন, তোর মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত আমি পারছি না...

তাই যখন শুনলেন নরেন্দ্রের আত্মীয়রা তাঁর বিয়ে দিয়ে দেবার আয়োজন করছেন, পাগল হয়ে তিনি জননী ভবতারিণীর কাছে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন, মাগো, নরেনকে ডুবতে দিসনে মা! ওর যে অনেক কাজ!

এমনি ধারা গুরু-শিষ্যে যখন চলেছে দেওয়া-নেওয়া, গুরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন...

কঠিন গল-রোগ...

শিষ্যরা বিচলিত হয়ে উঠলেন, বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথ, কারণ নরেন্দ্রনাথ তখন সম্পূর্ণভাবে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন...

বেদ নয়, বেদান্ত নয়, দর্শন নয়, বিজ্ঞান নয়...ওই যে চোখের সামনে যে লোকটি রয়েছেন...তাঁর জীবনই ধর্ম...তাঁর কথাই বেদ...

এমন জীবন্ত পুঁথির কি দরকার?

তাই ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা, ওঠা-বসা, ভাবা-চিন্তা, ভাব-ভঙ্গী, নরেন্দ্র পুঁথি-পড়ার মত করে দেখেন...

নিদ্রায়, জাগরণে, স্বপ্নে...সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব...

তাই ঠাকুরের অসুখে নরেন্দ্র বিচলিত হয়ে উঠলেন। অন্তরের অন্তঃস্তলে মহা আশঙ্কা জাগে, এখনও যে অনেক বাকী...সামনে যে সুদীর্ঘ পথ...সাথী, বন্ধু, গুরু বলতে তিনি একা...সহসা যদি তিনি তাঁদের ত্যাগ করে চলে যান?

তাই সহযাত্রী শিষ্যদের ডেকে নরেন্দ্র বলেন,—আর সংশয়ের দোলায় দুলে সময় নষ্ট করা চলবে না...যেটুকু সময় আছে, যতক্ষণ তিনি আছেন, আর কোন কাজ নয়, আর কোন কথা নয়...বস পদ্মাসনে, বল বুদ্ধের মত, যদি এ দেহ ধুলোয় যায় মিশে, যাক...তবু, আসন ছেড়ে উঠছি না...

নরেন্দ্রের প্রেরণায় শিষ্যদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দেয়...তাঁরা বোঝেন আজ থেকে তাঁদের পথ স্বতন্ত্র...

গুরু নিভৃতে নরেন্দ্রকে বলেন,—ওরে, ওদের ভার তোরই ওপর দিলাম...

সে কথার মধ্যে নরেন্দ্র যেন শুনতে পান বিদায়ের পূর্বরাগিণী...

স্থির করেন, আর ঘরের মায়া নয়, ওরে বৈরাগী...জীবন-বীণায় জাগিয়ে তোল রুদ্র রাগিণী!

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলে...

দক্ষিণেশ্বর থেকে চিকিৎসার সুবিধা হবে না বলে, ঠাকুরকে কলকাতায় আনা হলো...সেখান থেকে কাশীপুরে একটা বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো...

নরেন্দ্র সহযাত্রী গুরুভাইদের নিয়ে পালা করে ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা করেন...

ডাক্তার চলে গেলে নরেন্দ্র রাত্রি জেগে নিজে ডাক্তারি বই পড়েন...মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন...

দেখেন, সেই অসুখের পরিণাম, ক্যান্‌সার...দুরারোগ্য...

বিদায়-দিনের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে...

কই, এখনো তো হলো না পাওয়া—চরম-পাওয়া...যা পেলে আর পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না...

অন্তর-মন্দিরে চির-বাঞ্ছিতের আবির্ভাব...অনন্ত পুরুষের সঙ্গে অন্তর রমণ...

কত দূরে সে মহা-লগ্ন?

চকিতে আভাসে যার ছোঁয়া পাওয়া গেল...সে কি তার বেশী দেবে না ধরা?

ঈশ্বর-বিরহে নরেন্দ্রের দেহে-মনে যেন বাড়বানল জ্বলে ওঠে...

সেই সঙ্গে যখনি ভাবেন, যাঁর কৃপায় এই সুদুর্লভ অনুভূতির সামান্যতম স্পর্শ পাবার পরম সৌভাগ্য ঘটেছে, হয় তো বেশীদিন তাঁকে আর কাছে পাওয়া যাবে না... তখনি শিশুর মত আকুল হয়ে ওঠেন...

বাড়িতে তখন মামলা-মকদ্দমা নিয়ে মহা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে...সুজন আত্মীয়েরা তাঁর মা ভাই-বোনদের ভিটাছাড়া করবার জন্যে জাল বিস্তার করেছেন...

রাত্রিতে স্থির করেন, দু'-একদিনের জন্যে কলকাতায় গিয়ে ও ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে আসবেন...

কিন্তু রাত্রিতে শুতে গিয়ে ঘুমোতে পারেন না...

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন...সঙ্গীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন...তাঁদের জাগিয়ে তোলেন, বলেন, চল, বাগানে একটু ঘুরে বেড়াই...

তাঁরা সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করেন...কি ব্যাপার?

নরেন্দ্র বলেন,—মনে হয় ঠাকুর আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন শিগগির—আর সময় নেই দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলবার...আমরা ভাবছি, সংসারের সব কাজ গুছিয়ে তারপর ঈশ্বর-সাধনায় ডুববো...তা হয় না...এই করে করে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি চলে গেলে আর দুঃখের অন্ত থাকবে না...তাই আমি ঠিক করলুম...আজ...এই মুহূর্তে ...সব বাসনা জলাঞ্জলি দেবো...মূল সুদ্ধ টেনে উপড়ে ফেলবো...

সকলের মনে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগে...

তারা-ঝিমঝিম পৌষের রাত্রি...তরুণ তপস্বীর দল সমিধ সংগ্রহ করে...শুকনো গাছের ডাল, পাতা, খড়কুটো...

এক জায়গায় স্তূপাকার করে, তার চারপাশে তাঁরা বসেন...

নরেন্দ্র নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দেন...বলেন, ঠিক এমনি সময়ে সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে...আগুন জ্বালা...বল্...এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক সব বাসনা...

দেখতে দেখতে আগুনের শিখা তারার দিকে মাথা তুলে ওঠে...

সেই রক্ত আলোয় রাঙা হয়ে জাগে বাঙলাদেশে বিংশ-শতাব্দীর প্রথম প্রভাত...

ঠাকুরের সেবার অবকাশে যখনি সময় পান, নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসেন... পঞ্চবটীর তলায়...

সেখানে গুরু-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে ধ্যানে বসেন...

অসাধারণ একাগ্রতার ফলে...অতি কঠিন আসন অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলেন...

একটার পর একটা দ্রুত...অতি দ্রুত...

গুরু সবই জানতে পারেন...আনন্দে তাঁর অন্তর ভরে আসে...

অন্য শিষ্যদের দেখিয়ে বলেন, দেখেছিস্ বিরহ কাকে বলে?

একদিন নিভৃতে প্রিয়তম শিষ্যকে তিনি কানে কানে রাম-মন্ত্র দিলেন, বলেন, আমার গুরু আমাকে এই দুটি অক্ষর দিয়েছিলেন, আমি তোকে দিয়ে গেলাম...

সেই দুটি অক্ষর গুরুর মুখ থেকে পাওয়া...যেন কুবেরের ঐশ্বর্য!

নরেন্দ্র অবিরাম সেই নাম জপ করে চলেন...সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়ান পাগলের মত...মুখে রাম নাম...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়...দিন যায়...সন্ধ্যা আসে...

শিষ্যরা এসে ঠাকুরকে জানান...

ঠাকুর বলেন, ওকে বাধা দিস্ না...সময় হলেই ও আবার শান্ত হবে...

রাত্রিতে নরেন্দ্র আবার প্রকৃতিস্থ হন...

কিন্তু রস-তৃষ্ণা দুর্নিবার...

ঠাকুরের কাছে ছোট ছেলের মত কেঁদে পড়লেন, অনেকে অনেক কিছু পেলো... আমি পেলাম কই?

ঠাকুর হেসে বলেন, বল্, কি চাস তুই?

নরেন্দ্র বলেন, আমি চাই দিনের পর দিন সমাধিতে ডুবে থাকতে...

গুরু গর্জন করে উঠলেন, ওরে বোকা, তার চেয়েও বড় অবস্থা আছে...যা আগে বাড়ি গিয়ে ওদের একটা বন্দোবস্ত করে আয়...আমি নিজে তোকে তা দিয়ে যাব...

ভোর না হতেই নরেন্দ্র বাড়ি ফিরে আসেন...

সকলে মিলে একসঙ্গে অনুযোগ করে, এ কি রকম ছেলে...অন্ততঃ পাসটা দিয়ে ফেলতে আপত্তি কি?

নরেন্দ্র আইন পরীক্ষা দেবার জন্যে সেই সময় প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি আবার বই নিয়ে বসলেন। কিন্তু যেই বই খুলে পড়তে যাবেন, অমনি যেন মনে হলো, জগতের সবচেয়ে বড় পাপ করতে চলেছেন...

তাড়াতাড়ি বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ছুটতে আরম্ভ করলেন...

দিক-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি ছুটতে আরম্ভ করলেন...পা থেকে চটিজুতো রাস্তায় পড়ে গেল...কাপড় বিস্রস্ত...পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত...দক্ষিণেশ্বরে এসে তবে তিনি থামলেন...গুরুর পায়ে পড়ে কেঁদে বলে উঠলেন, আমায় এমন কিছু খাইয়ে দিতে পারেন, যাতে আমি যা কিছু পড়েছি, সব একেবারে ভুলে যাবো!

সস্নেহে গুরু শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন...

বিদায়ের দিন এগিয়ে আসে...

সে-কথা জানেন শুধু অস্তাচল-পথ-যাত্রী মহামানব...মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে আভাসে সে-কথা শিষ্যদের জানান...

যাবার আগে, যা কিছু সঞ্চয় নিঃশেষে হবে তা দিয়ে যেতে...

মানবতার কাছে ঋণ... মানবতার সেবায় তার হবে পরিশোধ—

দেখে আনন্দিত হন, তাঁর কথামত, নরেন্দ্র শিষ্যদের ভার নিয়েছেন...

নরেনের সাহচর্যে তাঁরা সবাই চলেছেন সেই মহাপথে এগিয়ে...

একটি একটি করে গুরু দিয়ে যান, পথের নির্দেশ—

একদিন তাঁদের সকলকে ডেকে বললেন, ওরে আজ তোদের একটা নতুন কাজ করতে হবে...যা দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে চাল নিয়ে আয়...সেই চাল আজ খাওয়া হবে...

নরেন্দ্র বোঝেন, এ বিধান শুধু আজকের জন্যে নয়—

বারোটি তরুণ তপস্বী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে বেরোয়...

কেউ বলে, ঢং...

কেউ দেয় তাড়িয়ে...কেউ দেয় হিতোপদেশ...কেউ করে বিদ্রূপ...তিরস্কার...

ভ্রূক্ষেপ করে না নতুন ভিক্ষুর দল...আনন্দে নামগান করতে করতে দিনের শেষে আসে ফিরে...

মহা-উল্লাসে সেই ভিক্ষার ধন রান্না হয়...নিজে গুরু প্রথমে তার একটি দানা মুখে দিয়ে বলেন, পরমান্ন!

এই অন্নই দেবতারা খান।

শিব-চতুর্দশীর রাত্রি...

সারাদিন উপবাসে কেটেছে...নরেন্দ্র গুটিকয়েক শিষ্য নিয়ে সারারাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাবেন বলে বসেছেন।

বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল...আকাশে তখনো টুকরো টুকরো কালো মেঘ...

নরেন্দ্র গভীর ধ্যানে মগ্ন...

সহসা ধ্যান ভেঙে দেখেন, তাঁর এক গুরুভাই কালী তাঁর পাশে ধ্যানে বসেছে...

দুজনেরই ধ্যান ভেঙে গেল...

হঠাৎ নরেন্দ্র কালীকে বললেন, আমি আবার ধ্যানে বসছি...কয়েক মিনিট পরে তুই আমাকে ছুঁবি!

এই বলে নরেন্দ্র আবার ধ্যানে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রের জানু স্পর্শ করতেই কালীর সর্বশরীর কেঁপে উঠলো...যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ তাঁর শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হয়ে গেল...

ধ্যান-অন্তে নরেন্দ্র দেখেন, কালী সেই অবস্থায় বিহ্বল হয়ে রয়েছে...

তরুণ সাধক আজ দেখতে চেয়েছিল, নিজের শক্তির প্রকাশ...

প্রাপ্তির আনন্দে নরেন্দ্র গুরুর কাছে এলেন...

দেখলেন, ঠাকুর গম্ভীর...নরেন্দ্রকে পাশে ডেকে তিনি হঠাৎ তিরস্কার করে উঠলেন, এরি মধ্যে এত লোভ? ওরে অনেক সময় পাবি, যখন এই শক্তি তোকে কাজে লাগাতে হবে...

এখন বাজে খরচ করছিস কেন? খবরদার, এ-রকম আর করবি না!

নরেন্দ্র স্তম্ভিত...শয্যাশায়ী তিনি...কি করে দেখলেন?

...হে অন্তর্যামী...কোটি কোটি প্রণাম তোমাকে!

গুরুর আদেশে সহযাত্রী গুরুভাইদের নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেন...

ইওরোপের জ্ঞানগুরু আর ভারতের আরণ্যক ঋষি...প্রত্যেকের রচনা নরেন্দ্র গুরুভাইদের নিয়ে আলোচনা করেন...

কাশীপুরের সেই বাগান হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়...

নরেন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসু মন সব জানতে চায়...সব বুঝতে চায়...

গুরু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খেপিয়ে আলোচনা আরো জমিয়ে তোলেন...

এইভাবে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র নরেন্দ্র আয়ত্ত করে ফেলেন...ভগবান বুদ্ধের অমিত ত্যাগ ও কঠোর সাধনা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করে...

কিন্তু পাঠে তাঁর সর্বগ্রাসী চিত্ত তৃপ্তি পায় না...মনে মনে স্থির করেন, বুদ্ধ-গয়ায় গিয়ে যে বৃক্ষ-মূলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন তিনিও সেখানে গিয়ে সাধনায় বসবেন...

অন্তর দিয়ে ভারত-ইতিহাসের সেই মহাপুরুষের ভাবধারাকে উপলব্ধি করবেন...

কাউকে কিছু না বলে, ঠাকুরের সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি তারক আর কালীকে সঙ্গে করে বৌদ্ধ-গয়া যাত্রা করলেন...

গয়া থেকে সাত মাইল পথ পায়ে হেঁটে তিন বন্ধুতে বৌদ্ধগয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন...

চারদিক্ নির্জন...নীরব...অতীতের স্মৃতিতে সুপবিত্র...

সন্ধ্যায় তিনজনে বোধি-বৃক্ষতলে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রের সর্ব-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো...দুই চোখ ফেটে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে...আকুল আবেগে তারককে জড়িয়ে ধরেন...

মুখে দিব্য-করুণার ছায়া...

ব্যাকুল আগ্রহে বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, কি হলো নরেন?

নরেন্দ্র বলেন, ভগবান তথাগতের ধ্যান করতে করতে দেখলাম, ভারত-ইতিহাসের দিব্য-রূপ...ছবির মত চোখের সামনে একটার পর একটা ভেসে চলে গেল...শাশ্বত ভারত...দিব্য ভারত...আমি যেন যুগে যুগে তার মধ্যে বাস করে এসেছি...

এধারে নরেন্দ্রের অদর্শনে গুরুভাইরা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

তাঁরা ঠাকুরের কাছে তাঁদের অন্তরের ব্যাকুলতার কথা জানান।

ঠাকুর তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, সে কোথায়ও যায় নি রে! এই এলো বলে!

ক্রমশঃ দিন আরও কাছে এগিয়ে আসে...মহা-বিদায়ের দিন...

একদিন বড় রাখাল কতকগুলি গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষ নিয়ে এসে ঠাকুরকে দিলেন, সাধুদের দেবার জন্যে!

ঠাকুর যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন।

তাঁর শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন, ওরে এদের চেয়ে ভালো সাধু আর কোথায় পাবি? এগুলো এদের দে!

গুরু নিজে তাদের হাতে গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের মালা তুলে দিলেন...

তারপর একদিন তাদের সকলকে ডেকে দীক্ষা দিলেন...

বললেন, আজ থেকে তোদের আর কোন জাত রইলো না!

গুরুর কথা শুনে শুনে নরেন্দ্রের স্থির বিশ্বাস হয়, আর বেশীদিন দেরি নেই...

অন্তরে হাহাকার নিবিড় হয়ে ওঠে...কিন্তু বাইরে আর প্রকাশ করতে পারেন না...

হায় সর্বগ্রাসী মন! চরম পাওয়া তো এখনো রয়েছে বাকী...

সব সাধনার সার—সেই বিরাট আত্ম-বিলুপ্তি—ব্রহ্মে একান্ত লীন হওয়া...

অনন্ত কোটী রমণের স্বাদ যার স্বাদের তুলনা নয়।

বিদায়-পথ-যাত্রী তরুণ পথিকের মনের দিকে চেয়ে বোঝেন, কোথায় তার বেদনা!

একদিন বড় গোপাল, আর নরেন এক ঘরে বসে ধ্যান করছেন।

সহসা নরেনের মনে হলো, ঠিক তাঁর মাথার পেছনে দপ্ করে তীব্র আলোর ঝলক যেন জেগে উঠলো...সে-আলোর বিন্দু ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো...

...বড় হতে হতে তা যেন নিজের তেজে নিজে ফেটে পড়লো...

সে আলোতে তাঁর সব চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেল...এবং সেই পরমক্ষণে যে মহা-অনুভূতি তাঁর চিত্তলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, জগতের কোন ভাষা নেই তার আংশিক বর্ণনাও করতে পারে!

কিছুক্ষণ পরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, গোপালদা, গোপালদা আমার দেহ গেল কোথায়?

গোপালের ধ্যান ভেঙে গেল, তিনি দেখলেন, নরেন্দ্রের সর্বদেহ পাথরের মত হয়ে গিয়েছে...

কি করবেন স্থির করতে না পেরে ছুটে ঠাকুরকে খবর দিতে উঠলেন।

ঠাকুরের ঘরে এসে দেখেন, ঠাকুর স্থির, নিস্পন্দ!

তবুও গোপাল ভীত কণ্ঠে নরেন্দ্রের সংবাদ জানালেন।

ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, ওকে ওইভাবে থাকতে দে...আমাকে বড় জ্বালিয়েছিল ...এর জন্যে!

মধ্যরাত্রির দিকে নরেন্দ্রের চেতনা ফিরে এলো...ধীরে ধীরে নয়ন মেলে দেখেন, তাঁকে ঘিরে গুরুভাইরা সবাই বসে আছেন—কারুর মুখে কথা নেই...ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে আসতে লাগলো—যেন অমৃতসাগর থেকে স্নান করে এই সবে উঠেছেন ...চারিদিকে অমৃত সৌরভ...আর কোন ক্ষোভ নেই...কোন দুঃখ নেই...কোন চাঞ্চল্য নেই...

স্মিত-আননে ধীরে ধীরে গুরুর কাছে এসে তাঁর পায়ে প্রণাম করলেন।

সস্নেহে প্রিয়তম শিষ্যকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, মার দয়ায় সব তো এবার বুঝলি! কিন্তু এ অনুভূতি আমি বাক্সতে চাবি দিয়ে রাখলাম...আর সে চাবি রইলো আমার কাছে...জগতে তোকে অনেক কাজ করতে হবে...

যখন তোর কাজ শেষ হয়ে যাবে...তখন আবার এই বাক্স খুলে সব পাবি—এখন আর নয়।

গুরুকে প্রণাম করে নরেন্দ্র বিশ্রাম করতে যান।



কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে, বলে লোকে, হেতু কার্য প্রসবিবে শুভ কর্মে—শুভ, মন্দে মন্দফল, এ নিয়মরোধে নাহি কার বল।...
সন্ন্যাসীর গীতি—
পরিব্রাজক—স্বামী বিবেকানন্দ



স্বাধীন উন্মুক্ত যাও স্থানে স্থানে
অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো
অজ্ঞানে...
...সন্ন্যাসীর গীতি—
যোগী—স্বামী বিবেকানন্দ

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাকুর অন্য শিষ্যদের বলেন, যে-মুহূর্তে ও বুঝতে পারবে, ও কে, সেই মুহূর্তে ও দেহত্যাগ করবে...

দেওয়া-নেওয়া প্রায় চুকে আসে...

দিন হয়ে আসে শেষ...

ঠাকুর একদিন হঠাৎ নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন...

তাঁর সামনে তাঁকে বসালেন...

একদৃষ্টিতে প্রিয়তম শিষ্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গভীর সমাধিতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন...

নরেন্দ্র চলৎ-শক্তি-হীন হয়ে সেখানে বসে থাকেন...তাঁর স্পষ্ট মনে হয়, তাঁর সর্ব-দেহে কী এক তড়িৎ-শক্তি অনুরণিত হয়ে চলেছে...

ক্রমশঃ সব সংজ্ঞা তাঁর চলে যায়...

যখন আবার জ্ঞান ফিরে আসে তখন দেখেন, ঠাকুরের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

করুণায়, স্নেহে, সারা মুখ দিব্য-প্রভাতের মত সমুজ্জ্বল...

প্রিয় শিষ্যের হাত ধরে বলেন, ওরে, আমার যা কিছু ছিল, আজ উজাড় করে সব তোকে দিয়ে দিলাম...আজ আমার আর কানাকড়িও নেই...ফকির...জানি, এই দিয়ে তুই জগৎ টলাবি...

গুরু শিষ্যতে হলো লীন...

এই ঘটনার তিনদিন পরে...

কাশীপুর বাগান...মৃত্যু-তীর্থ...

গুরুর পার্থিব দেহ তাঁরা বহন করে গঙ্গার তীরে নিয়ে এলেন...

সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল...

পড়ে রইল শুধু এক মুঠি ভস্ম আর গুটিকতক দেহাস্থি...

সেই চিতা ভস্ম অবশিষ্ট...সেই পুণ্য সম্পদ তাম্র-কলসে পূর্ণ করে গঙ্গা-স্নান সিক্ত বসনে বহন করে তাঁরা ফিরে এলেন কাশীপুরের বাগানে...

বারোজন পরিচয়হীন সহায়সম্বলহীন দরিদ্র বাঙালী যুবক...তরুণ তপস্বী... আর তাদের নেতা নরেন্দ্রনাথ...

সেইদিন নরেন্দ্রনাথ শপথ করলেন, আর ঘরে ফিরবেন না...

বিশ্বের পথে এসে দাঁড়ালেন এক তরুণ তাপস—বিবেকানন্দ যাঁর নাম...

নরেন্দ্র আজ মহামৌনী...

যে ঘরে গুরুর শেষ-শয্যা ছিল তার মেঝেতে বসে গুরুর শূন্য শয্যার দিকে চেয়ে থাকেন...

বাইরের শয্যা ছেড়ে গুরু নিয়েছেন শিষ্যের অন্তরে চিরশয্যা...

বাসুকীর সহস্র ফণার মত জেগে ওঠে সহস্র অস্থির প্রশ্ন...কে দেবে তার উত্তর?

নিরুত্তর মৃত্যু-লোক থেকে আসবে'না কোন ইঙ্গিত?

যতদিন তুমি ছিলে, ভাবনা ছিল তোমার সঙ্গে...তুমিই ছিলে সব প্রশ্নের শেষ উত্তর...সব সমস্যার শেষ মীমাংসা...সব জিজ্ঞাসার শেষ উপনিষদ...মহামূল্য পরিব্যাপ্ত করে ছিল তোমার সুনিশ্চিত অস্তিত্ব...

...আজ তাই তোমার তিরোধান বিভ্রান্ত করে তুলেছে আর্ত আমাকে...যাবার সময় নিজের হাতে তুমি দিয়ে গেলে এদের ভার আমার ওপর...নিজের ভার যে এখনো শেখেনি নিজে বইতে, সে কি করে বইবে এদের ভার?

তাই গুরুভাইদের চিন্তা আরো ব্যাকুল করে তোলে নরেনকে...তাদের বাড়ি থেকে অভিভাবকরা এসে তাঁকেই ধরেন, তুমি ওদের ছেড়ে দাও!

নরেন্দ্রনাথ হাঁ-না কিছুই বলতে পারেন না। অভিভাবকেরা বার বার হাঁটাহাঁটি করার পর কুৎসিত ভাষায় তাঁকে গালাগালি দিয়ে যান...নরেন্দ্রনাথ তা শুনতে পান না। অন্তরে তখন তাঁর চলেছে সাগর মন্থন—কলরব...সদ্য জাগা কাল-বৈশাখীর উন্মাদ আর্তনাদ!

রাত্রিবেলা প্রেতমূর্তির মত অন্ধকারে বাগানের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান... অন্ধকারে অন্তর যেন খুঁজে বেড়ায়, কার দিব্য স্পর্শ...মৃত্যুর ওপার থেকে...কোন ইঙ্গিত...কোন আভাস...

সেদিন সঙ্গে আছে হরিশ ভাই। ঘুরতে ঘুরতে বাগানের মাঝখানে পুকুর-পাড়ে এসে বসলেন...

গুরুর চিন্তায় মন্থর অন্ধকার...

হঠাৎ কিসের যেন একটা আলো বাগানের ফটকের সামনে জ্বলে উঠলো... নরেন্দ্রনাথ দেখেন, গায়ে সাদা চাদর দিয়ে কে যেন বাগানের রাস্তা বেয়ে সেইদিকে আসছে...নিরুদ্ধ নিশ্বাসে নরেন্দ্র সেইদিকে চেয়ে থাকেন...

...মনে হয় যেন, ঠাকুর স্বয়ং! একি, তিনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন? না, তাঁর দেখার ভুল? জোর করে হরিশ ভাইএর হাত চেপে ধরেন...হরিশ ভাই চিৎকার করে ওঠেন, নরেন...নরেন...ওই...

উন্মাদের মত নরেন হেঁকে ওঠেন, কে? কে আপনি?

মূর্তি তখন দশ গজের মধ্যে যে যুঁই-ঝাড় ছিল, সেখানে এসে থমকে দাঁড়ালো...

নরেনের চিৎকারে অন্য গুরুভাইরা তখন সবাই ছুটে এসেছেন...

—কি ব্যাপার? কি হয়েছে নরেন? হরিশ?

বাক্যহীন...স্পন্দহীন দুজনে দাঁড়িয়ে...মূর্তি তখন যুঁইঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে...

...কে বলে তুমি গিয়েছ চলে...পাওয়ার অতীতলোকে, আমাদের চেতনার বাইরে? কে বলে, জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে রয়েছে সমুদ্র, যাতে পারাপার করে না কোন যাত্রী? কে বলে তুমি নেই?...

গুরুর দেহাবশিষ্ট-ময় সেই তাম্র-কলসের সামনে বসে, তাঁরা রাতদিন করেন ওই জপ, তপ, ওই মন্ত্র-উচ্চারণ, ওই ধ্যান...

...শ্মশান যেটুকু দিয়েছে ফিরিয়ে, আমাদের সাধনায় সবটুকু আমরা দেব পুরিয়ে ...ক্ষণিক মৃত্যুকে পরাভব করে তুমি আবার জাগবে, হে অবিনশ্বর...

জগতের শ্রেষ্ঠবিত্তের মত তারা আগলে থাকে সেই শ্মশান থেকে ফিরে-পাওয়া এক মুঠি দেহাবশেষ...

হঠাৎ একদিন ঠাকুরের গৃহী শিষ্যরা এসে নরেনকে বলেন, তোমরা সন্ন্যাসী, কখন কোথায় থাকবে কিছু ঠিক নেই...ঠাকুরের দেহাবশেষ আমাদের দিয়ে দাও!

সন্ন্যাসীরা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে...ওই তাদের একমাত্র সম্বল...দিয়ে দেবে কি?

গৃহীরা নাছোড়বান্দা। কাঁকুড়গাছির এক বাগানে পুণ্য দেহাবশেষ যথারীতি তাঁরা সমাধিস্থ করবেন...সেই সমাধিকে ঘিরে গড়ে উঠবে পুণ্যতীর্থ...

...সংসারের তাপিতজনের আতপত্র!

রামচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্ত নরেন্দ্রকে এসে ধরে বসলেন...

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শুরু হলো কঠিন বাদানুবাদ...

বাদানুবাদ পরিণত হয়ে হলো স্বাভাবিকভাবে তুমুল ঝগড়ায়...

নবীন নেতা নিজের নির্জনতার মধ্যে খুলে দেখেন, ভারত-ইতিহাসের পাতা... গুরুর তিরোধানের পরেই শিষ্যদের মধ্যে বাদানুবাদ...ঝগড়া...দলাদলি...গ্রন্থি এক যুগের মধ্যেই হয়ে আসে শিথিল...

তাই গুরুভাইদের ডেকে বলেন, গুরুর কৃপায় আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়েছি...কঠিন গুরু আমাদের...তাঁর আদেশে, নিজেদের মুক্তির চেষ্টা পর্যন্ত আমাদের দিতে হবে বিসর্জন...তাই আমাদের পরে যারা আসবে, তারা যেন আমাদের দিকে আঙুল তুলে না বলে, ঠাকুরের শিষ্যেরাও ভারত-ইতিহাসের সেই ভুল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে নি...

উত্তেজিত সন্ন্যাসীরা নবীন নেতার দিকে চেয়ে শান্ত হয়...

...নিয়ে যাক তারা ওই তামার কলসী...পুঁতুক মাটির তলায়...গড়ুক সমাধি-ভবন...আমাদের অন্তরে থাক্ তাঁর চির-বাসর...শয়ন...জয় শ্রীরামকৃষ্ণ...মৃত্যুহীন ভারতের নব-জন্মদাতা...

কারুর আর রইলো না অমত।

কিন্তু দিতে গিয়ে নরেন্দ্রের কেঁদে উঠলো মন।

গুরুভাইদের ডেকে বলেন, নিয়ে আয় কলসী!

কলসী থেকে বার করে নেন ভস্ম...রেখে দেন দেহাস্থি।

দেহাস্থি সুদ্ধ কলসী নিয়ে গৃহীরা আনন্দে চলে গেলেন কাঁকুড়গাছি বাগানে...

আর একটি পাত্রে সেই পবিত্র ভস্ম রেখে নরেন্দ্র জননী সারদেশ্বরীর হাতে তা তুলে দিলেন...তিনি তখন যাচ্ছিলেন বৃন্দাবনে।

হিন্দুর সংস্কার অনুযায়ী সেই পূতভস্মের কিছু অংশ গঙ্গানীরে বিসর্জন দিয়ে, সারদাদেবী সেই পুণ্যস্মৃতি ফিরে নিয়ে এসে আবার নরেন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন।

কাশীপুর বাগানের "লীজ" ফুরিয়ে এলো...দু' একদিনের মধ্যেই সে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

ছেড়ে দিয়ে যাবেন কোথায়? কপর্দকহীন সন্ন্যাসীদের লোকে বাড়ি-ভাড়া দেবেই বা কেন? কোন কোন গুরুভাই আগে যে যার বাড়ি থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেতেন, কিন্তু এখন নরেন্দ্রের ব্যবহারে চটে গিয়ে তাঁদের বাড়ির লোকেরা সবাই হাতের মুঠো একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন...তাঁদের ধারণা, দিন কতক পেট খালি থাকলেই "ধর্মের বাতিক" উবে যাবে...

ঠাকুর জীবিত থাকতে, যে সব ভক্তেরা আসা-যাওয়া করতেন, সাহায্য করতেন, তাঁরাও আর আসেন না...যদি বা আসেন, তা হলে এখানে নয়, তাঁদের স্থান তাঁরা আলাদা ঠিক করে নিয়েছেন গৃহী ভক্তদের সঙ্গে।

নরেন্দ্রনাথ ভেবে কোন কূল-কিনারা পান না...অন্তরে বিশ্ববিজয়িনী উন্মত্ত আশা...বাইরে তেমনি অকূল অসহায়তা...অনিশ্চয়তা...

এমন সময় একদিন সুরেন মিত্তির এসে হাজির হলেন...ঠাকুরের অসুখের সময় কাশীপুর বাগানের অধিকাংশ খরচই তিনি বহন করতেন...ঠাকুরের তিরোধানের পর ব্যক্তিগত শোকের মধ্যে তিনিও সেই গুটিকতক নিঃস্ব ভক্তদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন...

ভুলে যাবেনই বা না কেন? মৃত্যু...সেই তো শেষ...পরম সমাপ্তি...সবাই তাই জানে...

কিন্তু জগতে তখন কেই বা জানে যে, একজন যুবক সেই মৃত্যুকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে, অমৃতের লোভে? চিতার যে আলোয় সবাই দেখেছে অন্ধকার, সে দেখেছে তার মধ্যে নব জীবনের নীল-দ্যুতি...মহা সম্ভাবনার মাতৃ-বেদনা...

সুরেন মিত্তির নিভৃতে নরেন্দ্রকে ডেকে বললেন, কাল ঠাকুর এসেছিলেন!

নরেন্দ্র স্থির হয়ে শোনেন।

...স্বপ্নে...সেই হাসি...সেই স্নেহ...বললেন...যা নরেন খুঁজছে...

মিত্তিরমশাই বলেন, সামান্য যা পারবো, দেবো...

বাড়ি খোঁজা শুরু হয়...

খুঁজতে খুঁজতে বরানগরে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি পাওয়া গেল...কোন ভাড়াটে সে-বাড়িতে আসে না...ভূতের বাড়ি...ভয়ে দিনের বেলাতেও লোকে তার ত্রি-সীমানায় যায় না...

নরেন্দ্র ঠিক করলেন, সেই বাড়িই নেবেন।

বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইলো, দশটাকা। তাতেই রাজী হতে হলো।

কাশীপুর বাগান থেকে ঠাকুরের বিছানা-পত্র, চটি-জুতো, হুঁকো...যা কিছু

ছিলো স্মৃতি-চিহ্ন...মহাসম্পদের মত তা সযত্নে তুলে নিয়ে তাঁরা এলেন বরানগরে সেই ভূতের বাড়িতে...

বহুদিন আত্মীয়হীন জীবন যাপন করার পরে, সহসা সেদিন তাঁদের সঙ্গীরূপে পেয়ে, সেই বাড়ির আদিম অদৃশ্য অধিবাসীরা বোধ হয় সন্তুষ্টই হয়েছিল, কারণ তাদের অধিকারে হাত পড়লো বলে তারা কোনো নীরব বা সরব বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি, কিন্তু আশেপাশে জীবিত অধিবাসী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যে সন্তুষ্ট হন নি, তার নানারকম প্রমাণ সন্ন্যাসীরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই পেতে আরম্ভ করলেন।

আমরা অতি ধার্মিক জাতি বলেই অপর কাউকে ধর্মের গেরুয়া পরতে দেখলেই ধরে নি, ভণ্ড,...অতএব বদমায়েশ, অতএব নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে...

অতএব, লাগো তার পেছনে...

নতুন বাড়িতে এসে নরেন্দ্র গুরুভাইদের নিয়ে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হলেন...

গোড়ায় গোড়ায়, মাঝে মাঝে তাঁকে বাড়ি যেতে হয়েছে...কারণ আত্মীয়দের সঙ্গে হাইকোর্টে যে মামলা চলছিল তার মীমাংসা তখনও শেষ হয় নি...মা ভাই বোনদের জন্যে তাঁর স্নেহশীল অন্তর একটা কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না...সেইজন্যে সে সময় গুরুভাইদেরও জোর করে তিনি কোন কথা বলতে পারেন নি।

কিন্তু আজ সম্পূর্ণভাবে সে সংসারকে পেছনে ফেলে চলে এসেছেন...গুরুভাইরাও তাঁর আদর্শে আজ সবাই মুক্ত পুরুষ...

তাঁরা সবাই ব্যাকুল...মুক্তিকামনায়...আত্মিক সাধনার চরম শান্তি লাভের জন্যে ...সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, নরেন্দ্রকে পথ-নির্দেশক বলে...

কিন্তু পথ-নির্দেশক নিজে এখনও খুঁজে পায় নি পথ...একদিকে ডাকে, ধ্যান সমাধির সুগভীর শান্তি—যোগীর নিঃসঙ্গ জীবন...অরণ্যের মহানিস্তব্ধতা...আর একদিকে...কোথা থেকে আসে, এক অস্ফুট আর্তনাদ...দূর সমুদ্রের গর্জন...লক্ষদীর্ণ হৃদয়ের ছিন্ন-ভিন্ন হাহাকার...

কে বলে দেবে পথ? কিসে পাবে এই অশান্ত আর্তহৃদয় তার সব আর্তির শেষ-সমাধান? কে ডাকে? কেন সে আসে না স্পষ্ট মূর্তিতে সামনে? কেন তার ভাষা দূর নক্ষত্রের ভাষার মত অন্তর পারে না পাঠোদ্ধারে?

সর্ব ভাবনা থেকে নিজেকে সংহত করে নিয়ে নরেন্দ্র আবার নতুন করে ডুব দেন, জ্ঞান আর ধ্যানের সাগরে...

আদিম অরণ্যে যেমন জ্ঞান-ব্যাকুল ঋষিরা বসতেন, অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যে বিশ্ব-রহস্যের তত্ত্ব নিরূপণ করবার জন্যে, তেমনি সহযাত্রী বন্ধুদের নিয়ে নরেন্দ্র বসলেন, বিশ্বের জ্ঞান-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে...

সারাদিন চলে পাঠ—ক্যাণ্ট, হেগেল, মিল, স্পেন্সার...পশ্চিম যা কিছু করেছে

আহরণ...তার বিজ্ঞান...ইতিহাস...দর্শন...সমাজতত্ত্ব...তার সঙ্গে আসেন কপিল, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য...ভারতের ইতিহাস...দর্শন...সমাজতত্ত্ব...

জিজ্ঞাসা আর উত্তর...

সহযাত্রীরা জিজ্ঞাসা করে, পথ-প্রদর্শক দেন উত্তর...

সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্ধ হয় পুঁথি...বেজে ওঠে আরতির ঘণ্টা...

স্মরণ করেন, যাঁর স্পর্শে আজ জীবন-শতদল উঠেছে জেগে...মনে হয়, দিব্যরূপে যেন তিনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন তাঁদের সকলকে...

অন্ধকার ঘন হয়ে আসে...নরেন্দ্রের দিব্য-কণ্ঠে সংগীতে রাত্রির আকাশ ওঠে দুলে।

মধ্যরাত্রিতে জ্বলে ওঠে ধুনি...তাকে ঘিরে ধ্যানে বসে তরুণ তপস্বীর দল...

রাত্রি হয়ে আসে প্রভাত...

দোতলা বাড়ি...

ওপরের ঘরগুলো হুমড়ি খেয়ে যেন মাটির দিকে টলে পড়েছে...

নীচের ঘরগুলোতে ভিজে অন্ধকারে সাপ, গিরগিটি, ইঁদুর আর মানুষ এক সঙ্গে থাকে...

অন্ধকারে যতটুকু সম্ভব ভদ্রতা বাঁচিয়ে এ-ওর ঘাড়ে-পড়া বাঁচিয়ে চলে...

সারাদিনের যা বরাদ্দ আহার, তা থেকে প্রথম ঠাকুরের নৈবেদ্য হয়, কোনদিন একখানা, কোনদিন বা দুখানা...

দুপুরবেলা ভাতের হাঁড়ি নামে...

অধিকাংশ দিন ভাতের সঙ্গে তরকারি জোটে না...পাশের বন-বাদাড় থেকে তেলাকুচোর পাতা তুলে এনে সিদ্ধ করা হয়...সেই তরকারি...

থালা বাসন কিছুই নেই...

আশে-পাশের বাগান থেকে কলাপাতা কাটতে গেলে উড়ে মালী গালাগাল দিয়ে তাড়া করে আসে...অগত্যা মানকচুর পাতা...তাতে আর কেউ বাধা দেয় না...

মানকচুর পাতায় তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ আর ভাত...

প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে গলায় জানিয়ে দিয়ে যায়, শরীর আহার গ্রহণ করছেন...

কোন প্রতিবাদ নেই, কোন দুঃখ নেই...কোন দীর্ঘশ্বাস নেই...

বারান্দার একধারে দড়িতে একখানা ভাল কাপড় আর চাদর...বাইরের ভব্যতা রক্ষার একমাত্র উপায়...সকলের মিলিত সম্পত্তি...

মাঝে মাঝে হঠাৎ দল বেঁধে আসেন অভিভাবকের দল...ছেলেদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে...বিফল হয়ে ফিরে যান...যাবার সময় শাসিয়ে যান নরেনকে...

ক্রমশঃ পাড়ার লোকদের টনক নড়ে...রাতদিন গানবাজনা...হইচই...পাড়ার ভেতর একি কাণ্ড!

বেহুঁশ আনন্দে কীর্তন চলেছে...রাত্রিবেলা...ভদ্রলোকদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়...ভোর না হতেই তাঁরা এসে হানা দেন...

—যত সব...

দূর দিকরেখার দিকে চেয়ে নরেনের অশান্ত অন্তর বলে ওঠে, দেখা দাও হে পরম-প্রভাত...খুলে দাও তোমার রহস্য-দ্বার, দেখি তোমার দিব্য-রূপ, সহস্র রূপের অরণ্য থেকে জাগো হে অরূপ বনস্পতি!

এক বৃদ্ধা নারী নিমন্ত্রণ করে পাঠান নিঃস্ব সাধকদের।

বলরামবাবুর মা...আঁটপুরে...তাঁর নিজের ভিটেতে...

গুরুভাইদের নিয়ে নরেন্দ্র বহুদিন পরে তৃপ্ত হয়ে আহার করেন...

আহার-অন্তে সবাই জড়ো হয়ে বসে ঠাকুরের নাম-গান করেন...গাঁয়ের লোকেরা ভক্তিভরে এসে বসে...

সন্ধ্যার পর সভা ভেঙে যায়...যে যার ঘরে ফিরে যায়...

রাত্রির নির্জন অন্ধকারে গুরুভাইদের নিয়ে এক বৃহৎ ধুনি জ্বালিয়ে নরেন্দ্র অন্তরঙ্গ আলোচনায় বসেন...

অজানা কোন মহা-আকর্ষণে সহসা অন্তর আজ তাঁর উদ্বেল...যে মহামন্ত্রের অন্বেষণে অতন্দ্র আছেন জেগে, যেন শুনতে পান তার অস্ফুট গুঞ্জন...

তাঁর মন আজ বেরিয়েছে তীর্থ-যাত্রায়—মানব-ইতিহাসের তীর্থে তীর্থে নিয়ে চলেছেন সহযাত্রী বন্ধুদের...অনাদি মানুষের স্রোত চলেছে অনির্দিষ্ট কার আহ্বানে, যুগ থেকে যুগে...

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁরা শোনেন...অগ্নিময় সে বাণী...ইতিহাস হয়ে ওঠে সচল প্রাণময়...বাঙলার সেই নগণ্য গণ্ডগ্রামের ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকার পথ দিয়ে আজ আবার তারা চলেছে দলে দলে...মানবের মুক্তি-সাধকের দল...কথক একে একে দেন তাদের পরিচয়...

সহসা একজনের কাছে এসে থমকে দাঁড়ান কথক...রোমান বর্বরতার ক্রুশে লৌহ-বিদ্ধ যীশু...অন্ধকারে পঞ্চশিখার মত জ্বলে ওঠে কথকের দুনয়নে দিব্য-বিভা...

ক্ষীণ নবনীত কোমল দুই বাহু দুই দিকে লৌহ-বিদ্ধ...অন্ধকারে সূর্যোদয়ে রক্ত-রশ্মির মত ঝরে পড়ছে বেদনা-মুখ থেকে রক্ত-ধারা...তবু মুখে দিব্য হাসি... নীল দুনয়নে স্নিগ্ধ ক্ষমা...

কথক বলে ওঠেন, তোমাকে প্রণাম হে মহাপুরুষ...তোমাকে প্রণাম হে মহাবীর... মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার তুমি একা নিয়েছ তোমার স্কন্ধে তুলে...আজ তুমি আবির্ভূত হও আমাদের মধ্যে...তোমারই মত যেন বলতে পারি, একমাত্র তোমাকেই স্বীকার করি রাজা বলে...হে জগদীশ্বর...কর যদি দিতে হয়, দেব একমাত্র তোমাকেই।

যীশুর বেদনা-সুন্দর জীবনের মধ্যে সেই রাত্রি-নিশীথে...বাঙলার পল্লী-অন্তরে বসে একজন বাঙালী সাধক সহসা খুঁজে পেলেন, এ যুগের নতুন দেবতাকে...

মানবতা তার নাম...বেদনা তার বাহন...

গুরুভাইদের সম্বোধন করে নরেন্দ্র বলেন, গুরুর কৃপায় মানবতার সেবায় বিসর্জন

দেব আমাদের জীবন...চারদিক থেকে যেন তার ইংগিত পাচ্ছি আমি শুনতে... আর্তপীড়িত মানুষের বুকে কাঁদছে মানুষের ভগবান...

সেদিন আঁটপুরের সেই পল্লী-অন্ধকারে বসে তাঁরা যখন স্মরণ করছিলেন যীশুকে, তাঁরা জানতেন না যে, সেইদিন ছিল যীশুর জন্মদিন, তখন সমস্ত খ্রীষ্টান জগৎ তাদের মত করে পালন করছিল সেই পুণ্যতিথি।

একদিকে ডাকে, জনহীন অরণ্য, বিশ্ববিরহিত নির্জনতা, ধ্যান-সমুদ্রে আত্ম-নিশ্চয়...

অন্যদিকে ডাকে, অগণন জনতা, বেদনা-দগ্ধ অসহায় মানবের আর্তরোল... সহস্রের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে নিঃশেষে দেওয়া বিলিয়ে—কর্মের পাঞ্চজন্যে জীবনের জয়-গান...

কোন্ পথ? কোথায় আছে জীবনের চরম সার্থকতা? কি হবে আত্মার অবলম্বন? কে দেবে বলে?

অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে গুরু দিয়ে গিয়েছেন, পরম দায়িত্ব...এদের দেখিস—এদের ভার দিয়ে গেলাম তোর ওপর...

এতগুলি মানুষ...তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তাঁদের জীবনের চাকা...তাঁদের পেছনে নেই ঘরের বন্ধন...সামনে নেই আত্মীয়ের মায়া...গৃহহীন...বন্ধুহীন...বিত্তহীন...রিক্ত...

কি করবেন তাঁদের নিয়ে? কোন্ পথে, কোন্ ভবিতব্যতার দিকে চলবে তাঁদের রথ?

গুরু স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ গুরুর মত কাউকেই দেন নি দীক্ষা...তাই এখনো তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র...শতদলের এক একটি বিচ্ছিন্ন দল...

কর্মই যদি ধর্ম হয়, বিচ্ছিন্নতা তার মহা-অন্তরায়...এক বিশ্বাসে, এক এক ধর্মে, এক-ছন্দে, এক জীবন-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য বন্ধনে যদি গড়ে তোলা যায় শুধু গুটিকতক মন...

নতুন মানুষের দল...নতুন সন্ন্যাসের ব্রত...

বরানগরের সেই জীর্ণ বাড়িতে একদিন জ্বলে উঠলো হোমের শিখা...সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান...পুণ্যশ্লোক ঋষিদের বহু অভিজ্ঞতার দান...বিরজা-হোম...

হোমাগ্নিকে ঘিরে বসলো ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসীর দল...ভারতের সহস্র বর্ষের অনির্বাপিত হোমাগ্নি-শিখার দিব্য-স্পর্শে আজ হবে তাদের জীবন-দীক্ষা...

সাক্ষী আজ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল, যাজ্ঞবল্ক্য...

ঋষি আজ, মাত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষের অব্রাহ্মণ এক তরুণ বাঙালী...

হোমাগ্নিতে বিসর্জন দিতে হবে, পূর্বের নাম, পরিচয়, সংস্কার, সব...

নতুন নামে...নতুন সংকল্প নিয়ে...নির্জন অরণ্য থেকে নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসী ফিরে যাবে জনতার অরণ্যে...

সংসারে...ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে!...

গুরুভাইদের সকলের পূর্বনাম গেল সেই অগ্নিতে পুড়ে...

রাখাল আর যোগীন হলেন ব্রহ্মানন্দ আর যোগানন্দ...

বাবুরাম আর নিরঞ্জন হলেন স্বামী প্রেমানন্দ আর নিরঞ্জনানন্দ...

শশী, হরি, লাটু, আর সারদা...রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অদ্ভুতানন্দ আর ত্রিগুণাতীতানন্দ...

কালী, বড় গোপাল, তারক—অভেদানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, শিবানন্দ....

শরৎ, গঙ্গাধর, সুবোধ আর তুলসী—সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সুবোধানন্দ আর, নির্মলানন্দ...

সেই পনেরোটি প্রাণী এবং তাঁদের নায়ক, তিনি সেদিন অন্য কোন নতুন নাম গ্রহণ করেন নি...নতুন সংকল্প গ্রহণ করলেন...

—আজীবন কৌমার্য আর দারিদ্র্যব্রত, যতদিন না জীবনে হয় ঈশ্বর-লাভ...

চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে গেল পুরাতন পৃথিবীর সঙ্গে সব পার্থিব সম্পর্ক...

বরানগরের সেই ভুতুড়ে বাড়ি হলো বরানগর মঠ—

•

মঠ...সংঘ...দল

সে চায় একান্তভাবে তাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে...তার সেই চতুঃসীমানার মধ্যে নিজেকে দৃঢ় করে রাখতে হবে বেঁধে...

প্রতিদিনের জাগ্রত চেষ্টায় তাকে তুলতে হবে গড়ে...ইঁটের পর ইঁট, থাকের পর থাক...প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার দ্বারে...স্থাণু...অচল...

অন্যদিকে কেঁদে ওঠে তরুণ সন্ন্যাসীর তীর্থলোভী যাযাবর মন...

হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে, নিঃসঙ্গ গিরিগুহায়, দূর দুর্গম পথে, অরণ্য নিবিড়ে তীর্থ-দেবতা...

শত-তীর্থময় ভারতের অরণ্য-পর্বত...পুণ্যস্মৃতি বিমণ্ডিত তার সুমহান্ বিস্তার...লক্ষ লক্ষ যাত্রীর পদরেণুপূত যুগ যুগান্তরের স্মৃতি-বিজড়িত মন্দির-পথ ...আকুল করে তোলে সদ্য-বন্ধনমুক্ত অন্তর-পথের পথিককে...

তীর্থ-পথে দাঁড়িয়ে, তীর্থ-দেবতার দিক চেয়ে, এক নিমেষে ভারতের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে তার হৃদ্‌স্পন্দন যায় মিলে...যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত পুণ্য-কামনার ধারাস্রোতে ফুলের মত ভেসে যায় তার সত্তা...

সে পরম অনুভূতির আকর্ষণ থেকে কি করে নিজেকে সরিয়ে রাখবে তরুণ তপস্বী?

•

প্রত্যেকের মনে শুরু হয় মঠ আর মন্দিরের দ্বন্দ্ব...

মঠ টেনে রাখতে চায় মাটিতে, নির্দিষ্ট সীমানার বাঁধাধরার মধ্যে...

মন্দির ডাকে, মহাশূন্যের মুক্ত স্বাধীনতায়...

এই দুই মহা-আকর্ষণের মাঝখানে নরেন্দ্র নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চান, উদয়াস্ত কর্মের মধ্যে...

ভোর না হতেই শয্যা ছেড়ে ঘুমন্ত সঙ্গীদের শিয়রে শিয়রে প্রভাতী সুরে গান গেয়ে চলেন...

—ওঠো, জাগো, আকাশে জেগেছে সূর্য...

তারপর জপ...পূজা...

পূজা অন্তে পাঠ...অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা...নিজেদের তৈরি করা...আবার জপ... পূজা...অধ্যয়ন...অধ্যাপনা...ধ্যান...রাত্রি হয়ে আসে শেষ...

কিন্তু এই প্রাত্যহিক নিয়ম-নিষ্ঠার অন্তরালে তেমনি বইতে থাকে অশান্ত ঝড়... অনিশ্চয়তার জ্বালা...আদর্শের অস্পষ্ট রূপ...অরণ্যের আহ্বান।

সহসা একদিন সকালবেলা দেখা গেল, স্বামী ত্রিগুণাতীতকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না...

দূর-তীর্থের আহ্বান প্রতিরোধ করতে না পেরে, কাউকে না জানিয়েই রাত্রির অন্ধকারে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন...

মঠাধ্যক্ষের নামে একটা ছোট্ট পত্র রেখে গিয়েছেন, "পায়ে হেঁটে চললুম বৃন্দাবনে। আর এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ মনে হলো না। কখন মতের পরিবর্তন হয়ে যাবে কে জানে? স্বপ্নে দেখতুম, বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন...এক একবার মনেও হয়েছে ফিরে যাই। তাই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চললুম তীর্থের আহ্বানে দূর পথে।"

কিছুদিন পরে বেরুলেন অখন্ডানন্দ, হিমালয়ের পথে তিব্বতে।

অনুসরণ করলেন অভেদানন্দ, সারদানন্দ আর প্রেমানন্দ, পায়ে হেঁটে চললেন তীর্থের আহ্বানে পুরীধামে...

নরেন্দ্রকে ডেকে ব্রহ্মানন্দ একদিন বললেন, আমি যাব নর্মদার তীরে বিন্ধ্যারণ্যে...

মঠের নতুন তৈরী পাঁচিল ভেঙে এলো দূর-তীর্থের আহ্বান...

মঠাধ্যক্ষের মনও হয়ে উঠলো উদ্বেল...ত্রিগুণাতীত ফিরে এলেন বৃন্দাবন থেকে ...প্রেমানন্দ এলেন পুরী থেকে...

দূর তীর্থের পুণ্য-সুবাস তাঁদের অন্তর থেকে এসে লাগলো নরেন্দ্রের অন্তরে...

প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এবার তিনি বেরুলেন, মন্দিরময়ী কাশীর পথে...

•

কাশীর গঙ্গার তীরে, সন্ধ্যারতি লগ্নে, নরেন্দ্র নিজেকে ফেলেন হারিয়ে...ভারত-ইতিহাসের গহন গভীরে...

শঙ্করের কাশী...গৌতম-বুদ্ধের কাশী...হিন্দুসভ্যতার শত স্মৃতি-বিজড়িত কাশী...সারনাথ...মৃগদাব...ধর্মচক্র প্রবর্তন...

তার ধূলিতে ধূলিতে স্মৃতি...তার বাতাসে বাতাসে বিজড়িত অতীত মহিমা...

কত যাত্রী...কত সন্ন্যাসী...কত বিচিত্র-মানুষের ভিড়...ভারত ইতিহাসের বিচিত্র জীবন্ত চিত্রশালা...

তরুণ তপস্বী অনুভব করেন এক বিচিত্র স্পন্দন...অন্তরে জেগে ওঠে এক নতুন অনুভূতি...কিন্তু আবছা তার রঙ...অস্পষ্ট তার রেখা...পরশ-পাথরের খোঁজে

পাগলের মত ঘুরে বেড়ান, যেখানে দেখেন নুড়ি...একটুখানি পাথরের টুকরো... অশান্ত অন্তর হয়ে ওঠে আরো অশান্ত...

দ্বারিকাদাস বাবাজী—সাধু ত্রৈলঙ্গ স্বামী...ধ্যান-সমাধির মহা সমুদ্র...

হঠাৎ একদিন চলতে চলতে এক বনের ধারে, একদল হনুমান অতর্কিতে করলো তাড়া...সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটতে আরম্ভ করেন...

এমন সময় শোনেন, বনের ভেতরে কে একজন কেঁদে বলছে, পালিও না, রুখে দাঁড়াও!

কথাটা যেন তীরের মত সোজা ভেতরে গিয়ে বিঁধলো!

নিজের ভীরুতায় লজ্জিত হয়ে রুখে দাঁড়ালেন...দাঁত মুখ ভেংচিয়ে হনুমানের দল চলে গেল...

সন্ন্যাসী বন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এমনি রুখে দাঁড়াবি বাবা...

নরেন্দ্র প্রণাম করেন, পথিক গুরু...

সেই একটি ছোট্ট কথা, কি ক্ষণে শুনেছিলেন, রয়ে গেল মনে গাঁথা...বীজ-মন্ত্রের মত...যখনি এসেছে অন্ধকার, এসেছে ভয়, এসেছে ভয়ংকর...দাঁড়িয়েছে তপস্বী রুখে...

আশ্রমে ফিরে ভাবেন...পথে পথে আছে এমনি পথিক গুরু...এখনো তো হয়নি তাঁদের সঙ্গে দেখা?

জীবনের গ্রন্থ...ক'খানিই বা পড়েছেন তার পাতা? কি তাঁর সম্বল? কি নিয়ে দাঁড়াবেন মানুষের কাছে?

চলে আহরণ, অমৃত-মন্থন...

দেখা করেন স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে...সর্বশাস্ত্র-বিশারদ...মহাপণ্ডিত...

শুরু হয় শাস্ত্র-আলোচনা...সন্ধানী মন খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছে কি ধন...

হঠাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ বলে ওঠেন, কামিনী আর কাঞ্চনের লোভ মানুষ একেবারে পারে না ত্যাগ করতে!

সহসা জ্বলে ওঠে দাবানল।

মনে জাগে দক্ষিণেশ্বরের সেই উন্মাদ চিরশিশুকে...

প্রতিবাদ করে ওঠেন। বলেন, আমরা দেখেছি সে মানুষ। তিনি আমার গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ...

ভাস্করানন্দ হেসে ওঠেন। অবিশ্বাসের হাসি।

মহাক্ষোভে উঠে চলে আসেন নরেন্দ্র...

মনে পড়ে যায় দক্ষিণেশ্বর...কাশীপুর...বরাহনগর মঠ...গুরুর অন্তিম কামনা... এদের ভার তোর ওপর দিয়ে গেলাম...

মন আবার ফিরে যায়...কেন তিনি সে-দায়িত্ব ফেলে রেখে পাগলের মত বেরিয়েছেন নিজের মুক্তি-কামনায়? তাঁকে কেন্দ্র করে যে ক্ষুদ্র সংঘটি গড়ে উঠেছে, তাঁর অভাবে যদি তা যায় ভেঙে!

যে আকুলতায় মঠ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন পথে, সেই আকুলতায় আবার ফিরলেন মঠের দিকে...

মঠে ফিরে এলেন বটে কিন্তু মন পড়ে রইলো পথে...

এই অল্প কয়দিনের প্রবাস...বৃহত্তর জীবনের সংস্পর্শে...এনে দিল এক বিচিত্র অনুভূতির আভাস...

তার আকর্ষণ মনে মনে করেন অনুভব অথচ কি সে অনুভূতি...কি তার লক্ষ্য...তার স্পষ্ট কোন অভিব্যক্তি তখনো ওঠে না ফুটে...

এক একদিন সন্ন্যাসীদের ডেকে বলেন, মঠ থেকে আমাদের বেরুতে হবে জনতার মধ্যে...করতে হবে প্রচার...

সন্ন্যাসীরা নীরবে শোনেন কিন্তু সন্তুষ্ট হন না...তাঁদের মন সাড়া দেয় না। তাঁদের মন তখন আত্মিক সাধনার একান্ত নির্লিপ্ততার আদর্শে ভরপুর...প্রচলিত ধর্ম-সাধনার ধারা ব্যতিক্রম করে ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনের আবর্তের মধ্যে, প্রতিদিনের ধুলো-কাদার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে তাঁদের মন সাড়া দেয় না।

প্রচার...সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন প্রচারের?

নরেন্দ্র বলেন, এতদিন প্রচার বলতে আমরা যা বুঝে এসেছি, তা নয়...আমার প্রচার হলো, আমার আমিকেই প্রসার...এক-জীবনকে বহু-জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া...নিজেকে বিস্তার করা...এককে বহুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা...বনের বেদান্তকে ঘরে আনা...জগৎকে দেখানো, ভারতের বেদান্ত শুধু কতকগুলি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর নিভৃত সাধনার একান্ত তত্ত্ব নয়...এ হলো জীবনের বেদ...প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার প্রয়োগে যা হবে সিদ্ধ...

নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে নরেন্দ্র নিজেই বিচলিত হয়ে ওঠেন...যে আদর্শের কথা তিনি প্রচার করতে চান...দেখেন, নিজের মনেই তা এখনো রয়েছে নীহারিকা হয়ে...অস্পষ্ট...আধখানা ধোঁয়া...আধখানা মাটি...

তাঁর সর্বগ্রাসী মন এই অস্পষ্টতার অনিশ্চয়তায় নিজেই হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ...

...নিরুদ্ধ গৈরিক স্রাব চায় নির্গমনের পথ...মেদিনীর অন্তস্তরে আবদ্ধ তরল অগ্নি-ধারা যেমন নিজের আবদ্ধতার মধ্যে নিত্য বেড়ে ওঠে বিপুলতর উত্তাপে...

তেমনি অন্তরের প্রচণ্ড তাপ বিপুলতর বেগে নিজেকেই করে দহন...

বাইরের কোন অনুষ্ঠানে তাকে যায় না আর শান্ত করে রাখা...

তাই আবার একদিন উৎক্ষিপ্ত-ধারা-স্রোতের মত পড়লেন বেরিয়ে...নির্জনতা থেকে জনতার মধ্যে...এক থেকে বহুর মধ্যে...বহুর মধ্যে খুঁজে বার করতে সেই এক-কে...

আবার কাশী...

আলাপ হলো প্রমদা দাস মিত্রের সঙ্গে...দেখলেন, জ্ঞানের মহাসমুদ্র...সংস্কৃত ভাষায় যা কিছু লেখা আছে, সমস্তই যেন তাঁর কণ্ঠস্থ...

পরিচয় পরিণত হলো বন্ধুতে...বহু জটিল সমস্যা...বহু অমীমাংসিত প্রশ্ন... তার উত্তর পেলেন তাঁর কাছ থেকে...

সেখান থেকে অযোধ্যা...শুনলেন, আজও তার পথে প্রভাতে সন্ধ্যায় যাযাবর সন্ন্যাসীরা গাইছে রামসীতার পুণ্যকাহিনী...অনুভব করলেন সেই মহানগরীর বিস্মৃত ইতিহাস...স্মৃতির প্রদোষলোকে দেখলেন, নররূপী ভগবানের অপরূপ পার্থিব লীলা...

সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ...এখনো তার সংগীতে রয়েছে তার ঐশ্বর্যের রেশ... ভারতের স্বাধীনতার শেষ অধ্যায়ের বিষণ্ণ সুরভি...তার প্রাণহীন প্রাসাদের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, দলে দলে নতমস্তকে তারা চলেছে, ইতিহাসের পাতা থেকে ধূলির কবরে...মুকুটের মণি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে পথের ধুলোয়...

লক্ষ্ণৌ থেকে আগ্রায়...তাজমহলের আগ্রা...সাজাহানের আগ্রা...ভারতের শিল্পকলা ও ঐশ্বর্যবিলাসের আগ্রা...প্রতিদিন, দিবসে নিশীথে সন্ধ্যায় তাজের চারদিকে মধুগন্ধী ভ্রমরের মত ঘুরে বেড়ান...পাথরে কাটা প্রত্যেকটি নকশার সামনে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকেন...হাত দিয়ে অনুভব করতে গিয়ে সর্বশরীরে লাগে শিহরণ ...স্পষ্ট দেখতে পান, সমগ্র পূর্বজগতের সেই বিরাট শিল্পীসমন্বয়...এক কবি-সম্রাটের অন্তরের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্যে তাঁরা আজ দেশ-দেশান্তর থেকে সকলে এক জায়গায় সমবেত হয়েছেন...শিল্প-কলার সেই মহাতীর্থে...মহাপদ্মের এক একটি দলের মত...একটু একটু করে গড়ে উঠছে সেই শ্বেত-মর্মরের স্বপ্ন...ভারতশিল্পের দিব্য প্রকাশ...

সেখান থেকে বৃন্দাবন...শেষ ত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন...হাতে শুধু একটি দণ্ড, আর এক কমণ্ডলু জল, বগলে দুখানা বই...বৃন্দাবনের মধু-স্মৃতিতে ভরপুর মন...আর মাত্র দু-মাইল বাকী, কিন্তু ক্লান্ত পা আর যেন চলে না...হঠাৎ দেখেন পথের ধারে একজন লোক ধুলোয় বসে মনের আনন্দে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে...

হুঁকো দেখে মন ভিজে গেল...বহু দিনের অভ্যাস...তার ওপর সেই পথের শ্রমে ক্লান্ত দেহ...এ সময় যদি দু'এক টান তামাক পাওয়া যায়...

লোকটির কাছে এসে পথিক মনের বাসনার কথা অকপটে জানায়। হুঁকো নামিয়ে পথিকের সেই সন্ন্যাসীরূপ দেখে লোকটি জিভ কেটে বলে ওঠে, মাপ করবেন মহারাজ...আমি যে নীচ ভাঙ্গি! আমার এঁটো হুঁকো কি করে তিনি মুখে দেবেন!

সত্যিই তো...মেথরের হুঁকোয় কি করে মুখ দেবেন! স্বভাবজ জাতি-অভিমানের অন্ধ নির্দেশে পথিক হুঁকোর লোভ ত্যাগ করে আবার পথ চলতে আরম্ভ করেন। কয়েক পা যেতে না যেতে বৃশ্চিকদংশনের মত তাঁর মনে পড়ে, এ কি ধারণা, এ কি ভুল! আমি না সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী! ভাঙ্গি বলে আমি চলে এলাম...

সন্ন্যাসীর জাতি...অভিমান!

পথিক তখনি ফিরলেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখেন, লোকটি তখনও সেইখানে বসে তামাক খাচ্ছে। তার পাশে গিয়ে বসে বললেন, ভাই, আমি অন্যায় করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর...

লোকটি অবাক্!

পথিক বলেন, তোমার হুঁকো আমাকে দিতেই হবে...

লোকটি কিছুতেই দেবে না...পথিক তাকে সব বুঝিয়ে বলেন...ভাই ভুলের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর তুমি!

অবাক্ হয়ে লোকটি হুঁকো তুলে দেয়...দু'এক টান খেয়ে পথিক আবার চলতে শুরু করেন।

যেতে যেতে নিজেকে তিরস্কার করেন, বলেন, বল, আর কি রেখেছ মনের কোণে লুকিয়ে, নির্লজ্জ সন্ন্যাসী!

বৃন্দাবনে ঢুকে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সর্ব-দেহ...বর্তমানের শুষ্ক-ধূলিময় বৃন্দাবন থেকে ধ্যানসিদ্ধ মন নিমেষে চলে যায়, বেণুরব মুখরিত নূপুরনিক্কণিত বৃন্দারণ্য...গোপিনীর সঙ্গে লীলা-অভিসারে চলে পরিব্রাজকের মন কৃষ্ণদেহ-সঙ্গমে ...সারা দিন পরিক্রমণ করেন গিরিগোবর্ধন...বলেন, দেখা দাও...বিরহ কর দূর... আমাকে স্বীকার কর কি না কর! এই আমি ত্যাগ করলাম, তৃষ্ণা আর ক্ষুধা... যতক্ষণ তুমি না এনে দেবে, আমি স্বেচ্ছায় করবো না জলগ্রহণ বা মুখে দেবো না খাদ্য।

উন্মাদের মত সেই পণ করে তিনি এগিয়ে চলেন...দিন হয়ে আসে শেষ... তৃষ্ণায় তালু আসে শুকিয়ে...তবুও কোনদিকে না চেয়ে সোজা চলেন এগিয়ে...এমন সময় শোনেন, পেছনে কে যেন ডাকছে...মা যেমন ছেলেকে খাবার জন্যে ডাকে... অভিমানে তিনি আরো জোরে ছুটতে লাগলেন...লোকটিও যেন তাঁর পিছু পিছু তেমনি ছুটে আসছে...তিনি চলার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন...শেষকালে মাইলখানেক পথ ছুটে আসবার পর লোকটি তাঁকে ধরে ফেলল...তার সঙ্গে খাবার...বলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমাকেই খেতে হবে!

সন্ন্যাসীর মন আনন্দে ফুলের মত ফুটে ওঠে...তুমি আছ...তুমি আছ...তুমি স্বীকার করেছ আমাকে...আমি ধন্য...

আহার অন্তে পরিব্রাজক আবার চলে এগিয়ে...

ভারত-ইতিহাসের তীর্থ-পথিক চলে তীর্থ-দেবতার সন্ধানে...

চলে তীর্থ-পথিক...এক তীর্থ ছেড়ে আর এক তীর্থে...

শত তীর্থময় ভারত...

তার পথে-প্রান্তরে ধূলার অন্তরে সংগোপনে রয়েছে কত না মহাপুরুষের পদ-চিহ্ন-রেখা...তার বাতাসে বাতাসে আছে, অবিনাশী অদৃশ্য তড়িৎ-কণায়, ধুয়ে-যাওয়া কত না আহ্বান...সে-আহ্বান মহাশূন্যে এমনি কি ঘুরে বেড়াবে নিরাবলম্বন?

মুক্ত-অন্তরে চলে পথিক আকর্ষণ করে আনতে নিরাবলম্বন সেই আহ্বানবাণীকে নিজের অন্তরে। পৌঁছতে ভারতের মর্মস্থলে। নতুন করে আবিষ্কার করতে, সভ্যতার মহারণ্যে হারিয়ে-যাওয়া সভ্যতার আদিম-ধাত্রীকে। ভারতবর্ষকে।

মাটির তলায় বীজের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে অনাগত অরণ্যের বনস্পতি...

তেমনি লুকিয়ে আছে আজকের এই ভগ্ন-সৌধ লুপ্তকীর্তি শতাব্দীর ধূলির অন্তরালে, অনাগত ভারতের অবিনাশী দিব্য সত্তা...

মাটির মর্মে গিয়ে আনতে হবে তার সংবাদ...নিজের হৃদ্‌স্পন্দন দিয়ে অনুভব করতে হবে এই মহাভূমির হৃদ্‌স্পন্দন...সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে বলতে হবে, তোমাকে জেনেছি...তোমাকে চিনেছি...পেয়েছি তোমাকে, হে আমার অবিনাশী সত্তা, হে আমার সনাতন স্বদেশ!

চলে তীর্থ-পথিক সেই মহা-সন্ধানে।

বৃন্দাবন...গিরিগোবর্ধন...

গিরিগোবর্ধন থেকে রাধাকুণ্ড।

রাধাকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে সেই স্থির জলের দিকে পথিক এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে...

বৈষ্ণবের প্রিয়-তীর্থ...যুগ-যুগান্তরের মর্ম-রাঙা অনুরাগের স্মৃতিকুণ্ড... শ্রীমতীর অশ্রু-জলের পুণ্যোদক...দ্রবময়ী ভারতচেতনা...

সাধ যায় অবগাহন করতে...জল নয়...তরল ইতিহাস...

পথিকের তখন কৌপীন মাত্র সার...অঙ্গে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। কৌপীন ভিজে গেলে বস্ত্র-পরিবর্তনের কোন উপায় নেই। তাই তীরেতে কৌপীনটি খুলে রেখে দিয়ে, নগ্ন-দেহে পথিক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে...

তরল স্নিগ্ধতায় ডুবে যায় চেতনা...অন্তর ভরে ওঠে বৈষ্ণবের মহা-অনুরাগে... যে-অনুরাগের স্পর্শ পেতে ভগবান স্বয়ং ভিখারী হতে কুণ্ঠিত হন নি একদিন...

স্নান সেরে তীরে উঠতেই দেখেন, কৌপীন নেই...

সামনের এক গাছের ডালে কৌপীনটি নিয়ে নির্বিকার চিত্তে বসে আছে এক শাখামৃগ!

বৈষ্ণব-ভাব-রসে তখন অন্তর ভরপুর...সন্ন্যাসীর মনে এলো...নিদারুণ অভিমান...সামান্য সন্ন্যাসী আমি, আমার কৌপীন অপহরণ করে নিয়ে এ কি তোমার ছলনা?

সন্ন্যাসী বলে, এই নগ্ন-দেহেই আমি প্রবেশ করলুম গভীর অরণ্যে...যতক্ষণ না তুমি নিজে আবার ফিরিয়ে দেবে বস্ত্র, ততক্ষণ এমনি বস্ত্রহীন গভীর অরণ্যে প্রায়োপবেশনে থাকবো আমি!

এই বলে অভিমানী সন্ন্যাসী প্রবেশ করেন অরণ্যের মধ্যে...

কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতে সন্ন্যাসীর মনে হলো, কে যেন ডাকছে।

ফিরে দাঁড়িয়ে দেখেন, এক ভদ্রলোক বস্ত্র নিয়ে ছুটে আসছেন।

—আমি দেখেছি সব...তাই একখানা কাপড় নিয়ে ছুটে এলাম...পরিধান করুন!

সন্ন্যাসী ফিরে আসেন...দেখেন, রাধাকুণ্ডের ধারে যেখানে কৌপীনটি রেখে জলে নেমেছিলেন, কৌপীনটি ঠিক সেখানেই পড়ে আছে।

বৃন্দাবন থেকে পথিক চলে হরিদ্বারের দিকে...

মাঝখানে হাতরাস রেল-স্টেশনের একধারে সন্ন্যাসী ক্ষণিক বিশ্রামের জন্যে বসেন...

স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত তখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখেন প্ল্যাটফর্মের একধারে পদ্মাসনে এক সন্ন্যাসী বসে...

সন্ন্যাসীর দিব্য-আনন থেকে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

হরিদ্বারের পথ...কত সাধু, কত সন্ন্যাসী দুবেলা সেখান দিয়ে যাচ্ছে, আসছে ...কিন্তু এ-রকম দিব্য-জ্যোতির্ময় তরুণ সন্ন্যাসী তিনি আর কখনও দেখেন নি... মনে হলো কি যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে...অদৃশ্য কি এক বিপুল তড়িৎ-শক্তি!

হাতজোড় করে মাস্টারমশাই সন্ন্যাসীর সামনে এসে বলেন, স্বামীজী, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত...

সন্ন্যাসী বৃথা বিনয় না করে সহজ ভাবেই বলে ওঠেন, হ্যাঁ সত্যিই আমি ক্ষুধার্ত!

—তবে যদি অনুগ্রহ করে দীনের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন...

মৃদু হেসে ক্ষুধার্ত বালকের মত সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি খেতে দেবে আমাকে?

সুরসিক স্টেশন-মাস্টার তার উত্তরে একটি ফরাসী শ্লোক বলে উঠলেন, হে প্রিয়তম, আজ তুমি আমার গৃহে এসেছ...তোমার জন্যে হৃদয়ের পাত্রে অন্তর-নিঙড়ে তৈরি করে রেখেছি সুপেয় পানীয়!

সন্ন্যাসী আনন্দে স্টেশন-মাস্টারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

স্টেশন-মাস্টার আজ অভিভূত...তাঁর জীবনের টাইম-টেবল নিমেষে কে দিল উলটিয়ে...এক নিমেষের পরিচয়...কোথা থেকে কেমন করে তার মধ্যে এলো এত নিবিড়তা, এত অন্তরঙ্গতা?

সন্ন্যাসী লক্ষ্য করেন...আহার-অন্তে আপনার মনে গেয়ে ওঠেন, ওগো প্রিয়, তোমার চন্দ্রাননে আজ আমার জন্য মাখতে হবে ভস্ম...

কিছুক্ষণ পরে দেখেন, সারা মুখে ছাই মেখে গৃহস্বামী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে... হাতজোড় করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে...

হাতরাস স্টেশন দিয়ে তেমনি রেল আসা-যাওয়া করে, কিন্তু স্টেশন-মাস্টারের আজ আর সেদিকে লক্ষ্য নেই...

সারাদিন সারারাত অতিথিকে নিয়ে ব্যস্ত...চারদিকে সংবাদ রটে গিয়েছে...দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করেছে...

সন্ন্যাসী ভীত, বিব্রত হয়ে ওঠেন...বলেন, আর তো থাকা চলে না...আমি সন্ন্যাসী, এতদিন ধরে আটক পড়ে থাকা আমার উচিত হয় না।

গৃহস্বামী মিনতি জানায়, আর একটা দিন...

রাত্রিতে সন্ন্যাসী একা জেগে...নিদ্রাহীন দৃষ্টি চলে গিয়েছে অন্ধকার ভেদ করে কোন্ সুদূরে...

নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামী।

সহসা সন্ন্যাসীর অন্তর আলোড়িত করে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

গৃহস্বামী বলে, স্বামীজী, যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—বল, কি জিজ্ঞাসা করতে চাও?

—আপনি কেন এত বিষণ্ণ?

সন্ন্যাসী তাঁকে পাশে ডেকে নিয়ে বলেন, সেই কথাই, এই মুহূর্তে আমার অন্তর জুড়ে বসে আছে...কঠিন গুরু আমার—আমার ঘাড়ে এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন...সে দায়িত্ব যত বড় আমি ঠিক তত সামান্য...অথচ গুরুর আদেশ, সে দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে।

বিস্ময়ে গৃহস্বামী সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ন্যাসী আবিষ্টের মত বলে চলেন, আমার নিজের মুক্তির বাসনা পর্যন্ত আমার কঠিন গুরু আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন...

তার পরিবর্তে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, এই লক্ষ লক্ষ ম্লান মূক সব মানুষের মুক্তির আদর্শ...

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে চলে যায় নিঃসীম দিগন্তরেখায়...

—এই ভয়ে পঙ্গু, খিদেয় আধমরা, অশিক্ষায় অন্ধ, অশক্ত দুর্বল দেশকে জাগিয়ে তুলতে হবে...ধর্মের জন্মভূমিতে ধর্ম আজ অচল, অনড়...নতুন করে নতুন ধর্মে তাকে দিতে হবে দীক্ষা—তুলে ধরতে হবে আবার তাকে জগতের সামনে...নতুন পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে তার করিয়ে দিতে হবে পরিচয়...এ দুঃসাধ্য ব্রত...কি করে পালন করবো, কি করে পালন করবো গুরুর আদেশ, সেই আমার একমাত্র চিন্তা...জগদ্দল পাথরের মত আমার বুকে চেপে বসে আছে...

কৃতাঞ্জলি পুটে গৃহস্বামী বলে, স্বামীজী, আমিও অতি সামান্য...অতি ক্ষুদ্র... কিন্তু এই আজ আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিবেদন করে দিচ্ছি... আমাকে গ্রহণ করুন...আপনার শিষ্য করে আমাকে আপনার পাশে তুলে নিন...

গৃহস্বামীর কাতরতা সন্ন্যাসীর অন্তর স্পর্শ করে। বলেন, কিন্তু তুমি জান যে-কাজের জন্যে তুমি নিজেকে নিবেদন করছো, সে কত কঠোর, কত দুরূহ?

—জানি...আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই পালন করবো...

—বেশ, এ মুহূর্তেই তা হলে তার আরম্ভ হোক্। রাত শেষ হলেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তুমি তোমার কুলীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনবে!

রাত প্রভাত হতেই শরৎচন্দ্র ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভিক্ষুকের মত একবস্ত্রে কুলী ধাওড়া থেকে ভিক্ষা করে এনে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রাখলেন।

—এবারে তাহলে আমাকে দীক্ষা দিন।

কঠোর কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলেন, আমার কাছে দীক্ষা নিলেই কি তোমার সব হবে যাবে!

কিন্তু তাতেও শরৎচন্দ্র দমলেন না।

অগত্যা সন্ন্যাসী তাঁকে দীক্ষা দিলেন...প্রথম মন্ত্র-শিষ্য...

হাতরাস রেল-স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের বদলে পৃথিবীতে এলেন স্বামী সদানন্দ...বিবেকানন্দের প্রথম কর্ম-সহচর...

পড়ে রইলো রেল-স্টেশন...

গুরুর সঙ্গে চললেন শিষ্য...দুর্গম পর্বত-পথে...

গুরু নিষেধ করলেন...বড় কঠিন এই যাত্রা...বড় কঠোর এই পথিক জীবন...

কিন্তু কোন নিষেধই শুনলেন না শিষ্য...

হৃষিকেশের পর্বত-পথ...

রাত্রিতে বনের মধ্যে গাছের তলায় শয়ন—অরণ্যচারী হিংস্র প্রাণীদের জাগ্রত জগৎ...

প্রভাতে বন্ধুর পর্বত-পথে রুধিরাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পদে অগ্রগমন...আহার...বনের বুনো ফল...কখনও বা সৌভাগ্যবশতঃ কোন পর্বত-কুটীরে থেকে মুষ্টি-ভিক্ষা... নতুবা উপবাস...

তীর্থ-যাত্রা...সন্ন্যাসীর আত্ম-পরীক্ষা...ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, আশ্রয়হীনতাকে জয় করবার কঠোর ব্যায়াম...

দুরধিগম্য পার্বত্য-বনের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে, সবুজ ঘাসের ওপর শুভ্র শুষ্ক কঙ্কাল...নর-কঙ্কাল...

শিষ্যকে দেখিয়ে সন্ন্যাসী বলেন, এমনি নর-কংকালে ভরা এই অরণ্য...অসহায় পথচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে অরণ্যচারী হিংস্রজন্তুর সংগ্রামের স্মৃতি-চিহ্ন...ভয় করছে?

সদানন্দ স্থির কণ্ঠে বলেন, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে জগতে কিছুই ভয় করে না!

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই অনভ্যস্ত নবীন শিষ্য বুঝলেন, সংসার আশ্রমে লালিত এই দেহ এ পথের যোগ্য নয়...

এ পথের প্রতি বাঁকে অনিশ্চয়তা...প্রতি অনিশ্চয়তার আগে পাছে অসহায় আত্মনির্যাতন...

একদিন বনের মধ্যে চলতে চলতে সদানন্দ আর চলতে পারলেন না...

ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় অবশ হয়ে পথের ওপর বসে পড়লেন। এক পা অগ্রসর হবার শক্তি নেই। বৃষস্কন্ধে অসহায় শিষ্যকে তুলে নিয়ে সন্ন্যাসী হাঁটতে আরম্ভ করলেন। সারাদিন এইভাবে হেঁটে একটা চটিতে এসে পৌঁছলেন...সারারাত জেগে সেবা করলেন।

সুস্থ হলে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার সদানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সামনে বর্ষার দুরন্ত পার্বত্য নদী। একটু পা নড়ে গেলে, কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

একহাতে অসুস্থ শিষ্যকে ধরে, আর হাতে শিষ্যের পুঁটলি এবং জুতো নিয়ে সন্ন্যাসী সেই দুরন্ত নদী পায়ে হেঁটে পার হলেন। এক একবার মনে হয়েছে, বুঝি

শিষ্যকে আর ধরে রাখতে পারলেন না...দুরন্ত নদী টেনে নিয়ে যায়...দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে মৃত্যুর মুখ আগলে দাঁড়ান...অসহায় শিষ্য শুধু কৃতজ্ঞতায় ভরা অশ্রুসজল দৃষ্টি দিয়ে গুরুর দিকে চেয়ে থাকে...

এমনি ভাবে তাঁরা অবশেষে হৃষিকেশে এসে পৌঁছলেন।

সামনে তুষার-কিরীট হিমালয়ের শুভ্র শতশির...আশে-পাশে বাতাসে গঙ্গার কল-কল্লোল...সন্ন্যাসী ভুলে যান সব পথশ্রম...কি প্রশান্ত স্নিগ্ধ নীরবতা...ভরে ওঠে মন...বলে, এইখানেই, ওরে পথচারী সন্ন্যাসী, এইখানেই তোর স্বদেশ...

হিমালয়ের সেই আরণ্য-নির্জনতায় সন্ন্যাসীর মন নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে ডুবে যায়। পেছনে কোথায় পড়ে থাকে, কর্মকোলাহলময় সংসার...বরানগর মঠ...সন্ন্যাসীদের কর্ম-সংঘ...গুরুভাইদের চিন্তা...

আবার জেগে ওঠে মনের গহন গভীরে, সমাধির নিস্তরঙ্গ নীরে নিজেকে নিঃশেষে ফেলতে হারিয়ে...কর্মহীন নির্বাণের অপার আনন্দে...ধ্যানের সাগরে শুধু ভেসে চলা প্রস্ফুটিত শতদলের মত...

কিন্তু সব বাধার হাত থেকে দূরে সরে এসে দেখেন, মস্ত এক বাধাকে তিনি নিজেই সঙ্গে টেনে নিয়ে এসেছেন...শিষ্য সদানন্দ...

সদানন্দ আবার অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। মায়ের মত স্নেহে সন্ন্যাসী সেবা করেন...সন্ন্যাসীর কেন এই মায়া? হোক শিষ্য...তবুও এ বন্ধন!

ঠিক করলেন, অসুস্থ সদানন্দকে হাতরাসে রেখে আসবেন।

সদানন্দ একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তিনি তাঁকে নিয়ে আবার প্রান্তরের দিকে ফিরলেন...

এলেন হাতরাসে...কিন্তু এবার তাঁর নিজের লৌহ-দেহ পড়লো ভেঙে...কঠিন ম্যালেরিয়ায় তিনি অচৈতন্য মত হয়ে গেলেন...হিমালয়ের ভিজে জঙ্গলের দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া...

সেই সংবাদ যখন বরানগর মঠে এসে পৌঁছল তখন গুরুভাইরা সকলে ভীত ও বিব্রত হয়ে উঠলেন। মঠে গুরুতর সব সমস্যা জেগে উঠেছে...তার সমাধান আর কেউ করতে পারবে না...এই মর্মে তাঁর কাছে চিঠি আসতে লাগলো...সুতরাং অবিলম্বেই তাঁকে মঠে ফিরে আসতে হবে...

এতদিন যে মঠের চিন্তা তিনি মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, সহসা তা আবার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো...

মনের দুই মেরু...এক মেরুতে, শুধু নির্জনতা, ধ্যান আর সমাধি...আর এক মেরুতে, মঠ, কর্মের বিপুল ভার, জনতা, সংগঠন...

দুইদিক থেকে দুই মহা-আকর্ষণ...

রোগশয্যায় শুয়ে তাই যখন মঠের সেই বিপন্ন আহ্বান তাঁর কানে এসে পৌঁছল, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না।...

সেই রোগ-দুর্বল দেহ নিয়েই আবার তেমনি আকুল-আবেগে ছুটলেন মঠের দিকে, যেমন আকুল-আবেগে একদিন সেই মঠ থেকেই পালিয়ে এসেছিলেন দুরাধিগম্য হৈম-নির্জনতায়।

বরানগর মঠ...

সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় নিয়মিত ক্লাস বসে...

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ...

শিষ্য, মঠবাসী গুরুভাইরা...

গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে হলে, যাকে গ্রহণ করতে হবে বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, আগে তাকে ভাল করে জানতে হবে।

আধা-আধি অসম্পূর্ণ জানা নয়...সম্পূর্ণ সবিশেষ জানা...

ভারতবর্ষকে জানতে হবে...শুধু তার বর্তমানকে নয়...তার অতীতকেও...

অতীত ভারতবর্ষ পড়ে আছে, তার শাস্ত্রে, বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে...

সমগ্রভাবে তাকে আয়ত্ত করতে হবে...সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে বুঝতে হবে...

শুরু হয় কঠোর অধ্যয়ন...

শাস্ত্রে প্রবেশ করতে হলে চাই ভাষাজ্ঞান।

সে ভাষার চাবি পাণিনির হাতে...কঠোর...কঠিন...নীরস।

নরেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ করেন সমগ্র পাণিনি। এবং গুরুভাইদেরও প্রত্যেককে সেই দুরূহ শব্দ-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলেন!

ফাঁকি দিয়ে জ্ঞান লাভ হয় না।

কিন্তু সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের বই কোথায়? শাস্ত্র আজ দুর্লভ...দুষ্প্রাপ্য...বহুমূল্য...কেনবার সংগতি নেই...

নরেন্দ্রনাথ কাশীর মহাপণ্ডিত বাবু প্রমদা দাসের শরণ নিলেন...

তাঁর অনুরোধে প্রমদাবাবু বই পাঠিয়ে দেন...

কোন জটিল শাস্ত্রীয় শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ যখন ঠিক বোধগম্য হয় না, তখন প্রমদাবাবুকে লিখে জানান...

পত্রের মধ্যে চলে শাস্ত্রালাপ...গড়ে ওঠে অপূর্ব আত্মিক মৈত্রী...

শেষ হয়ে আসে পরিক্রমা। অতীত ভারতের মানসিক পরিক্রমা...গুরুর আশীর্বাদে নরেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করে ফেলেন সর্ব-শাস্ত্র...সে বিরাট মহাদেশের প্রত্যেকটি শিলাখণ্ড তাঁর নখদর্পণে যেন তিনি প্রতিবিম্বিত দেখতে পান...

অস্পষ্টতার নীহারিকা-লোক থেকে স্পষ্ট দিব্য-মূর্তিতে দেখা দেয়, সনাতন ভারতবর্ষ।

বাগবাজার, ৪ঠা জুলাই
১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয় (*),—

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণদর্শন করিয়া এবং সদালাপে আত্মাকে চরিতার্থ করিব—এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না...কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ...এক দিবসের আলাপেই আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে।...

ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস আমার এখনও যায় নাই এবং যাইবার নহে। কিন্তু...আমার জীবনের গত পাঁচ-সাত বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শশাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মানুষ এই চক্ষে দেখিয়াছি অথচ নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না...এই যাতনায় আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে।

বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় নাই। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস্ পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু হইতে বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে আড়াইয়া দিয়াছিল! হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃকবাটীর অংশ পাইয়াছেন কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর!

কলিকাতার নিকটে থাকিলে, তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া প্রবল আত্মঅহংকারে আঘাত লাগে, তখন কার্যকরী বাসনার উদয় হয়। সেই সময় মনে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাধে। তাই বলিয়াছিলাম মনের অবস্থা বড়ই ভয়ংকর।

এবার এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আশীর্বাদ করুন। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার হৃদয় মহা-ঐশীবলে বলীয়ান হয়...

For "we have taken up the cross"
Thou hast laid it upon us, and
Grant us strength that we bear it unto
death. Amen. †

ইতি—
নরেন্দ্রনাথ

---

* কাশীর বাবু প্রমদা দাস।

† উক্ত অংশ Imitation of Christ হইতে উদ্ধৃত—সারাংশ, কারণ তোমার পতাকা তুমি নিজেই আমাদের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়াছ—শক্তি দাও, আমরণ যেন তাহা বহন করিতে পারি।

প্রয়াগধাম
৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,—

দুই এক দিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলিয়া আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যোগেন্দ্র নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা, চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এ-স্থানে আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন সংবাদ পাই, তাই তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি...

ইতি—
নরেন্দ্রনাথ

গাজিপুর
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু—

অদ্য তিনদিন যাবৎ গাজিপুরে পেঁাছিয়াছি। আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি।...এখানে যেজন্য আসিয়াছি, অর্থাৎ বাবাজীকে দেখা এখনও হয় নাই। অতএব দুই চারিদিন বিলম্ব হইবে।...

ইতি—
নরেন্দ্রনাথ

"দুই চারিদিনের" জায়গায় অনেক দিন কেটে যায়...

মহা-রহস্যের মত সহসা "বাবাজী" পথ আটকে দাঁড়ান...

গাজিপুরে এসে শুনলেন সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের তৈরী এক সুড়ঙ্গের ভেতর এক অদ্ভুত যোগী বাস করেন...

লোকে তাঁকে ডাকে পওহারী বাবা বলে...অর্থাৎ বায়ু-ভক্ষণ করে নাকি তিনি বেঁচে আছেন...

মহা-কৌতূহল জেগে উঠলো মনে...

অনুসন্ধান করে জানলেন, কাশীর কাছে এক সামান্য গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে পওহারী বাবা জন্মগ্রহণ করেন। বালক কালেই তিনি গাজিপুরে আসেন এবং সেখানে এক পণ্ডিতের কাছে যথারীতি ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ব্যাকরণ ও ন্যায়-শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে তিনি রামানুজী বৈষ্ণবদলে যোগদান করে বাউলের মত সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান।

ঘুরতে ঘুরতে গিরনার পাহাড়ে এসে গুরুর দর্শন পেলেন...

তিনি যোগ-শাস্ত্রে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। গুরুর কৃপায় বহুবৎসর সেই নির্জন

পর্বতে যোগ-সাধনা করার ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন এবং ভারতবর্ষ ঘুরতে ঘুরতে আবার গাজিপুরে এসে উপস্থিতও হলেন।

গাজিপুরে গঙ্গার ধারে তিনি মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে তার ভেতর সারাদিন ধ্যান করতেন...

...সন্ধ্যা হলে তিনি গঙ্গার অপর তীরে অরণ্যের মধ্যে চলে যেতেন। সারাদিনের মধ্যে কখনও এক মুঠো নিমফল, কখনও বা গোটাকতক লঙ্কা...এই ছিল তাঁর আহার।

এইভাবে কয়েকমাস কেটে যাওয়ার পর তিনি, একবার সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে যে প্রবেশ করলেন, আর বেরুলেন না। মাসের পর মাস চলে গেল...এক বৎসর দু'বৎসর করে পাঁচ বৎসর চলে গেল...লোকে ধরে নিল, তিনি দেহরক্ষা করেছেন...হঠাৎ পাঁচ বৎসর পরে একদিন লোকে আবার দেখলো সেই সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে তিনি বেরিয়েছেন...

চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো...দলে দলে লোক তাঁর দর্শনের জন্যে আসতে লাগলো...কিন্তু তিনি একান্ত বিনীত ভাবে সকলকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন ...লোকে তাঁর ভোগের জন্যে নানা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসে...তিনি দরিদ্র লোকদের বিলিয়ে দেন...পশু-পক্ষী ডেকে খাওয়ান...

এইভাবে যখন লোকের ভিড় বেড়ে উঠতে লাগলো, তখন তিনি এক অদ্ভুত আশ্রম তৈরি করলেন। তার চারদিকে পাঁচিল...পাঁচিলের ভেতরে একটা সুড়ঙ্গ ঘর...সেই সুড়ঙ্গের ভেতর তিনি রাত্রিদিন একা থাকেন, কি খান, কিভাবে বেঁচে থাকেন তা কেউই জানে না। জগতের কারুর সঙ্গেই কোন সম্পর্ক নেই। ক্বচিৎ কখনো সেই পাঁচিলের ওপর দেখা দেন, তখনই লোকজনের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়।

ক্রমশঃ তা-ও বন্ধ করে দিলেন। আর তাঁকে কেউ দেখতে পান না। বহু চেষ্টার ফলে কেউ কেউ তাঁর সাড়া পেয়েছে বটে কিন্তু দরজার আড়ালে। পাঁচিলের গায়ে যে দরজা আছে, তার ওপার থেকে তিনি কথা বলেন, নিতান্ত মামুলী হাঁ-না... অতি অল্প কথা...কেউ তাঁর দর্শন আর পায় না...

সন্ন্যাসীর মনে তীব্র বাসনা জেগে উঠলো, এই মহাযোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে...রাজযোগের গূঢ়তত্ত্ব এঁর কাছ থেকে আয়ত্ত করতেই হবে...

জেগে উঠলো আবার কর্মহীন মুমুক্ষুত্ব...সমাধির সুগভীর শান্তির দুরাকাঙ্ক্ষা...

প্রতিদিন পওহারী বাবার সেই রুদ্ধ-দ্বার আশ্রম-গুহার সামনে গিয়ে বসেন... মাথার ওপর রোদ, বৃষ্টি, ঝড় বয়ে যায়...দরজার ওপার থেকে কোন সাড়া আসে না...

যত দিন যায়...পিপাসা তত তীব্র হয়ে ওঠে...

একদিন অবশেষে পওহারী বাবার দয়া হলো...দরজার ওপার থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল...

সন্ন্যাসী দরজার এপার থেকে আকুল আগ্রহে প্রশ্ন করেন...

দরজার ওপার থেকে শুধু উত্তর আসে, দাস ক্যা জানে?

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু নাছোড়বান্দা...শুধু সেই এক উত্তর নিয়ে রোজ ফিরে আসেন... আবার পরের দিন গিয়ে হাজির হন...

অবশেষে দু'একটা করে কথা বাড়তে থাকে...বাবাজীর কণ্ঠস্বরে কি অপূর্ব মাধুর্য...নরেন্দ্রনাথের মন অভিষিক্ত হয়ে ওঠে...

গাজিপুর
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু—

এমন মিষ্ট কথা আমি কখন শুনি নাই। কোন Direct প্রশ্নের উত্তর দেন না...তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জেদাজেদি করাতে বলিলেন যে, "আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" এপ্রকার কখন কহেন না। ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পীড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, কিছুদিন থাকুন। সেই আশায় আছি।

ইতি—
নরেন্দ্রনাথ

ইতিমধ্যে অন্তরের অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

কোন্ পথ?

একদিকে গুরুর দেওয়া বিরাট দায়িত্বের ভার...বিপুল কর্ম...কি করে সে কর্মের সূচনা হবে, কি করেই বা হবে তার পরিণতি...মনের মধ্যে স্থির হয়ে দেখা দেয় না কোন ব্যবস্থাই...

আর এক দিকে...সর্ব কর্ম সর্ব কর্মের বাসনা ছেড়ে মন ছুটে যেতে চায় নির্বিকল্প সমাধির অতল গভীরে...ধ্যানের জনহীন উত্তুঙ্গ শিখরে...

মাঝখানে, বিরাট দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় তরুণ সন্ন্যাসীর মন...

যেন আহত সিংহ...

নিশ্চয়ই এই অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় আছে এই চিত্ত-দাহের প্রলেপ...

পওহারী বাবা কি দয়া করবেন না? সেই নিগূঢ় তন্ত্রের কর্মপদ্ধতিতে তিনি কি দীক্ষা দেবেন না?

ক্ষুব্ধ আশা-প্রতিহত চিত্তে শেষ উপায় স্বরূপ তীব্র বাসনা হলো, পওহারী বাবার কাছে যদি প্রয়োজন হয়, দীক্ষা নেবেন...গুরু বলে তাঁকে বরণ করবেন...

সে কথা জানালেন বাবাজীকে।

সেদিন রাত্রিতে সহসা একাকী যখন ধ্যানে বসেছেন, দেখেন, রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে আলোর শিখা জ্বলে উঠলো...সেই শিখার মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠলো, সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, মাতৃ-স্নেহ উদ্ভাসিত মুখ...গুরু রামকৃষ্ণের মুখ...একদৃষ্টিতে শিষ্যের দিকে চেয়ে আছেন...সে দৃষ্টি ক্রমশঃ নরেন্দ্রনাথের দেহ ভেদ করে অন্তরে এসে বিঁধলো...এক অমৃত-জোয়ারে নরেন্দ্রনাথ যেন মুহ্যমান হয়ে পড়লেন...

জ্ঞান ফিরে এলে নরেন্দ্রনাথ বালকের মত কেঁদে উঠলেন...স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, কি দুর্বার মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল...অমৃতের ভাণ্ডারে বসে ভিক্ষুকের মত কার কাছে তিনি হাত বাড়িয়ে ছিলেন? কি করে ভুলে গিয়েছিলেন, গুরুর উপদেশ? কিছু নেই, কিছু নেই...ওই যোগ-যাগ তুক-তাক ভেলকিতে...অদ্বৈত-বেদান্তের পূর্ণ-উপলব্ধি গুরু দিয়ে গিয়েছেন তাঁকে...কেন তাঁর এ মোহ?

...ক্ষমা করো...ক্ষমা করো...হে গুরু...হে সচ্চিদানন্দ পুরুষ...

গাজিপুর
৩রা মার্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,—

***...এখন দেখিতেছি, উলটা সমঝালি রাম। কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, এখন তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহিতেছেন। বোধহয় ইনি (পওহারী বাবা) এখনও পূর্ণ হয়েন নাই...কর্ম, ব্রত, আচার, এই সব লইয়াই আছেন...তাই বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র যখন পূর্ণ হয়, তখন আর বেলাবন্ধ থাকে না। অতএব ইঁহাকে আর উত্তেজিত করা ঠিক নহে। স্থির করিয়াছি, শীঘ্রই বিদায় লইব।

ইতি—
নরেন্দ্রনাথ

গুরু আর শিষ্যের মধ্যে কি হলো...কি অলৌকিক অভিজ্ঞতা তিনি সেদিন দেহাতীত সেই মহাপুরুষের দিব্য-আবির্ভাব থেকে পেয়েছিলেন, সে কথা তিনি কাউকেই বলেন নি। তবে সেদিন থেকে তাঁর মনের অস্থিরতা সব দূর হয়ে গেল। স্বচ্ছ মুক্ত অন্তরে ঘোষণা করলেন,

"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না...এখন স্থির বুঝিয়াছি—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই...**সে অপূর্ব সিদ্ধি...সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া...বদ্ধ জীবের জন্য সে প্রগাঢ় সহানুভূতি এ জগতে আর নাই।

"তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার কোন প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই,—

আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এত ভালবাসা, আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই।

ইহা কবিত্ব নহে...অতিরঞ্জিত নহে...কঠোর সত্য...তাঁহার শিষ্য মাত্রেই জানে।

বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি, কেহই উত্তর দেয় নাই।

কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজের অন্তর্যামিত্ব-গুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।

যদি আত্মা অবিনাশী হয়, যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি,—

হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা, হে রামকৃষ্ণ ভগবন, আমি তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দাস...এই আমার পরম ভাগ্য"*।

বহুদিন প্রবাসে প্রান্তরে ঘুরে, পথিক যেদিন নিজের ঘরের স্নেহছায়ায় ফিরে আসে, সেদিন তার অন্তরে যে প্রশান্তি আপনা থেকে দেখা দেয়, আজ সেই প্রশান্তিতে নরেনের অন্তর ভরপুর...

বহুদিনের বিচ্ছেদের পর যেন তিনি নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন...

শিষ্য যেন ফিরে এসেছে আবার গুরুর চরণ-প্রান্তে...

অন্তরে একমাত্র লক্ষ্য, হে গুরু, তোমার দেওয়া মন্ত্রকে সফল করে তোলা...

গাজিপুর থেকে তিনি ফিরে এলেন বরানগর মঠে...গুরুভাইদের মধ্যে...

নতুন সাড়া পড়ে গেল মঠের জীবনে...

সামনে বিরাট কর্তব্য...নিজেদের প্রথমে তৈরি করতে হবে সেই বিরাট দায়িত্বের উপযুক্ত করে...অর্জন করতে হবে, জ্ঞান, শক্তি, আলো...যে-আলোর স্পর্শে দূর হয়ে যাবে যুগ-যুগান্তরের জমাট-বাঁধা অন্ধকার...

—হে গুরু, আমরা সফল করবো তোমার স্বপ্ন...সার্থক করবো তোমার এই পৃথিবীতে আসা!

এক মহা-আদর্শের বহ্নি-শিখায় ভরে উঠলো তাঁর অন্তর...চাই শক্তি...বজ্রশক্তি ...যে-শক্তির স্পর্শমাত্রে জড়ে জাগবে চৈতন্য...

অর্জন করতে হবে সে-শক্তি...নিবিড় তপস্যার মধ্যে দেবতার কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে হবে মৃত-সঞ্জীবনী বর...পাশুপত অস্ত্র...

এ অন্ধকার এত নিবিড়...একে দূর করতে হলে চাই তেমনি সুতীব্র আলো...

নরেন্দ্রনাথ ইষ্টদেবতার কাছে সকলের অজ্ঞাতে শপথ করেন, সর্বচিন্তা সর্ব-কর্ম পরিত্যাগ করে, নিবিড় তপস্যায় আমি অর্জন করবো সেই শক্তি...

একদিন গুরুভাইদের সকলকে ডেকে জানালেন, আজ আমি তোমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবো...

গুরুভাইরা এই অকস্মাৎ ঘোষণায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়!

নরেন্দ্রনাথ বলেন, যতদিন না ফিরে আসি, তোমরা কেউ আমার অনুসন্ধান করবে না, আমার জন্য কোন চিন্তা করবে না...এই মঠ আগলে তোমরা অপেক্ষা করে থাকবে...

গুরুভাইরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে...বাক্যহীন...নিস্পন্দ।

শপথ করেন পুরুষসিংহ, যতদিন না আমি অর্জন করতে পারি সেই শক্তি, যার স্পর্শে মানুষ যাবে বদলে, ততদিন আমি আর ফিরবো না লোকালয়ে।

---

* পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত।

সেই রাত্রির অন্ধকারে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করে...দণ্ডকমণ্ডলু হাতে আবার চললো নতুন এক বুদ্ধ তার বোধিদ্রুমমূলের সন্ধানে।

বাঙলা তখন নিশীথ-ঘুমে অচেতন।

গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি গ্রাম, ঘুষুড়ি।

সেখানে এক পর্ণ-কুটীরে বাস করেন এক বিধবা...

বিধবা, কিন্তু অঙ্গে তাঁর বৈধব্যের চিহ্ন নেই...

স্বামী তাঁর মৃত্যুহীন...অমর।

নরেন্দ্রনাথ ধীরে বিধবার চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেন। বলেন, মাগো, গুরু আজ বিদেহী, কিন্তু তোমার মধ্যে তিনি আজও রয়েছেন জীবিত...আশীর্বাদ কর মা, যেন অভিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করবার শক্তি নিয়ে আসতে পারি!

পরম স্নেহে নরেন্দ্রকে কাছে টেনে নিয়ে রামকৃষ্ণ-জায়া বলেন, কিন্তু বাছা, সংসার ত্যাগ করবার আগে নিজের মাকে দেখে যাবে না?

তরুণ তপস্বী উত্তরে জানায়, মাগো, তুমিই আমার একমাত্র মা।

মার আশীর্বাদ নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে হাঁটতে আরম্ভ করে পরিব্রাজক...সঙ্গে একমাত্র সাথী...গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ।

গঙ্গার দুই তীরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছে দুটি জ্বলন্ত শিখা...

জগতে বহু ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হয়েছে—পড়েছিও অনেক ভ্রমণকাহিনী...

কিন্তু সেদিন বরানগর থেকে শুরু হলো যে ভারত-পরিভ্রমণ...মনে হয়, সভ্যতার ইতিহাসে তা দুর্লভ...দুর্লভ তা জগতের সাহিত্যে...

যেখানে যেখানে পড়েছে সেই দুটি পা সেখানে সেখানে ফুটে উঠেছে শতদল...পড়ে গিয়েছে সেই মাটির বুকে চিরকালের মত সেই দুটি পায়ের ছাপ...মহাকালের বুকে চির-বিদ্রোহী ভৃগুর চরণ চিহ্ন...

ভাগলপুরের উকিলবাবু মন্মথনাথ চৌধুরী একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির রোয়াকে বসে আছেন, এমন সময় দেখেন, দুজন সাধু এসে উপস্থিত।

ধর্মপ্রাণ বলে মন্মথবাবুর ভাগলপুরে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সাধুদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, তাঁরা দূর তীর্থে হেঁটে যাচ্ছেন...সে-দিনটির মত তাঁরা একটু আশ্রয় চান।

মন্মথবাবু নিজের বাড়ির একধারে তাঁদের খাবার এবং বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মন্মথবাবু বাইরের রোয়াকে একটা ইজিচেয়ারে বসে বৌদ্ধ-শাস্ত্র সম্পর্কে একখানি ইংরেজী বই পড়ছিলেন।

সাধু দুজন কাছেই চুপ করে বসে আছেন।

সাধুরা সাধারণতঃ নিরক্ষর হয়, এই ধারণায় মন্মথবাবু তাঁদের সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না...আপনার মনে পড়েই যেতে লাগলেন।

হঠাৎ সেই দুজন সাধুর মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কি বই পড়ছেন?

বই থেকে মুখ তুলে মন্মথবাবু উত্তর দিলেন, এটা একটা ইংরেজী বই! আপনারা ইংরেজী জানেন?

সাধুটি বিনীতভাবে ইংরেজীতেই উত্তর দিলেন, যৎসামান্য!

হঠাৎ সেই সামান্য দুটি কথা কিন্তু তার উচ্চারণ-ভঙ্গী মন্মথবাবুর কানে গিয়ে লাগলো...নিখুঁত উচ্চারণ!

তখন কৌতূহলী হয়ে মন্মথবাবু ইংরেজীতেই বৌদ্ধ-শাস্ত্র সম্পর্কে সেই বইটির কথা তুললেন।

পাঁচ মিনিট পরে মন্মথবাবুর হাত থেকে বইটি আপনা থেকে পড়ে গেল...ইংরেজী উচ্চারণ করতে মনে হলো যেন তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে...চেয়ার থেকে বিস্ময়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

লজ্জায় মন্মথবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল।

যাকে নিরক্ষর মূর্খ মনে করে কথা বলেন নি, দেখলেন সে-ব্যক্তি তাঁর অপেক্ষা সহস্রগুণ শিক্ষিত!

শুধু তাই নয়, মন্মথবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন এ-রকম প্রতিভা তো সচরাচর দেখা যায় না।

সন্ন্যাসী সংস্কৃতও জানেন, জানতে পেরে, মন্মথবাবু নিজের লাইব্রেরী থেকে সমগ্র উপনিষদ্ নিয়ে এলেন।

উপনিষদের জটিল প্রশ্ন একে একে জিজ্ঞাসা করেন।

সন্ন্যাসী একে একে উত্তর দিয়ে যান...সমগ্র উপনিষদ্ তাঁর কণ্ঠস্থ!

লজ্জায় মন্মথবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করেন, জীবনে যখন আপনার মত লোকের দেখা পেয়েছি, আপনাকে আর ছেড়ে দেবো না!

সেই অদ্ভূত সন্ন্যাসীর কথা সারা ভাগলপুরে ছড়িয়ে পড়ে।

এক রাত্রির আশ্রয়...ক্রমশঃ এক সপ্তাহ চলে যায়।

সন্ন্যাসী যাবার জন্যে উদ্যোগ করেন...মন্মথবাবু কাতর হয়ে হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করেন।

একদিন হঠাৎ মন্মথবাবু শুনতে পেলেন, সন্ন্যাসী গুণগুণ করে গান গাইছেন।

—আপনি গাইতে পারেন?

—যৎসামান্য!

পরের দিন মন্মথবাবু ভাগলপুরের সম্ভ্রান্ত লোকদের ডেকে এক বিরাট আসর করলেন।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সংগত করবার জন্যে বিখ্যাত তবলচী কৈলাসবাবুকে নিয়ে আসা হলো।

আসর দেখে সন্ন্যাসী বিব্রত।

এঁরা সবাই বড় আগ্রহ করে এসেছেন! অন্ততঃ দু' একটা গান আপনাকে গাইতেই হবে!

সন্ন্যাসী গান আরম্ভ করেন।

মন্ত্রমুগ্ধ সভা...মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে ভরে ওঠে শূন্যতা...

সন্ন্যাসী আপনার মনে গান গেয়ে চলেন...একটার পর একটা...লোকে ভুলে যায় বাড়ি ফেরবার কথা...সময়ের কথা...হঠাৎ কৈলাসবাবু তবলা ফেলে হাত তুলে ধরলেন...তাঁর হাত অবশ হয়ে আসছে...আঙুল আর চলছে না...

গৃহস্থ দেখলেন, রাত তিনটে বেজে গিয়েছে!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসর ভেঙে দিতে হল।

একদিন মন্মথবাবু আদালত থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সন্ন্যাসীদের ঘর খালি... সন্ন্যাসীরা চলে গিয়েছেন...

সাক্ষাতে তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁরা চলে গিয়েছেন...

মন্মথবাবুর মনে হলো যেন, দূর পথ থেকে সেই সন্ন্যাসী তাঁকে টানছেন...

শুনেছিলেন, তাঁরা যাবেন বদরিকার পথে...

মন্মথ ঘরে থাকতে পারলেন না...ছুটে চললেন সন্ন্যাসীকে ধরবার জন্যে...

আলমোড়া পর্যন্ত গিয়ে যখন শুনলেন, সন্ন্যাসী সেখান থেকেও চলে গিয়েছেন ...কোন্ পথে গিয়েছেন, কেউ বলতে পারে না!...

হতাশ হয়ে মন্মথবাবু ঘরে ফিরে এলেন...

সন্ন্যাসীর নামটাও পর্যন্ত জানতে পারলেন না...

এক এক জায়গায় গিয়ে শোনেন...এক-এক রকম নাম...

বুঝলেন, কোনটাই তাঁর আসল নাম নয়।

ধরা যে দেবে না, তাকে ধরতে যাওয়া বৃথা!

পথ চলতে চলতে অখণ্ডানন্দ বললেন, চলুন, দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া যাক...

পরিব্রাজক আপত্তি করেন না, মানুষ, দেবতা আর মন্দির...সারা ভারতের মধ্যে যেখানে যা আছে, সব দেখতে হবে...

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু...মহাপণ্ডিত...ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার একটি জীবন্ত টুকরো...

কিন্তু যাবার আগে পরিব্রাজক একটা শর্ত করে নিলেন, দুজনে কেউই ইংরেজী বলতে পারবে না...একটা ইংরেজী শব্দও না...

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর ইংরেজী বলা বড় বিপত্তি!

বৃদ্ধ আদর করেই সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দিলেন।

পরিব্রাজক প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কোন রকমেই এবার আর বিদ্যা জাহির করা হবে না...

বৃদ্ধ কিন্তু নানা রকমের কথা তোলেন।

পরিব্রাজক ক্রমশঃ আলোচনায় জড়িয়ে পড়েন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ পরিব্রাজক থেমে গেলেন, তিনি যে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তাতে ইংরেজীতে Plus কথাটা ব্যবহার করতে হবে...হঠাৎ কি করে তা এড়িয়ে যাবেন, ঠিক করতে না পেরে তিনি হাতের আঙুল দিয়ে Plus চিহ্ন দেখান...

বৃদ্ধের কোন সন্দেহই রইলো না...সন্ন্যাসীরা ইংরেজী আদৌ জানে না।

সেখানে একদিন থেকে সন্ন্যাসীরা কাশীর দিকে রওনা হলেন।

কাশীতে ধর্ম-বন্ধু প্রমদাবাবুর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। প্রমদাবাবু কিছুদিন তাঁর কাছে সন্ন্যাসীদের ধরে রাখতে চাইলেন। কিন্তু পরিব্রাজকের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল হিমালয়ের নিঃসঙ্গ হিম-নির্জনতা।

তাই প্রমদাবাবুর সঙ্গে ধর্মালোচনার সমস্ত লোভ ত্যাগ করে পরিব্রাজক বেরিয়ে পড়লেন।

প্রমদাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আবার কবে ফিরবেন?

পরিব্রাজক উত্তরে বললেন, এবার যখন ফিরবো, বোমার মত সমাজের ওপর ফেটে পড়বো...দেখবেন, কুকুরের মত এই সমাজ তখন আমার পিছু পিছু চলবে।

পরিব্রাজক চললেন...

সেখান থেকে অযোধ্যা...পণ্ডিত জানকীশরণের আশ্রম...

সংস্কৃত এবং ফারসী সাহিত্যে মহাপণ্ডিত...ধর্মাত্মা লোক...

সেখান থেকে নৈনিতাল...

নৈনিতাল থেকে আলমোড়া হয়ে বদরিকাশ্রম।

সন্ন্যাসীরা ব্রত নিলেন, এই পথে তাঁরা সঙ্গে একটিও পয়সা রাখবেন না।

তিনদিন পায়ে হাঁটার পর এক নদীর ধারে, বৃদ্ধ এক পিপুলগাছের তলায় পরিব্রাজক ধ্যানে বসলেন।

এক কূট-সমস্যা তাঁর মনকে বিব্রত করে তুলছিল। ধ্যানের মধ্যে স্থির করলেন, সেই সমস্যার সমাধান হয় কিনা দেখবেন।

ধ্যান ভেঙে পরিব্রাজক আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, গঙ্গাধর, পেয়েছি...পেয়েছি... এতদিন পরে, এই পিপুলগাছের তলায় একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান পেয়েছি... দিব্য দৃষ্টিতে আমি উপলব্ধি করেছি!

এই বিরাট বিশ্ব...আর সেই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রতীক, এই মানব...তাদের সম্পর্কে...

সেদিনকার তারিখে তাঁর রোজনামচায় ইংরেজীতে সংক্ষেপে এইটুকু লেখা ছিল—

"—আদিতে ছিল শব্দ, ইত্যাদি—মাইক্রোকজম্ (ক্ষুদ্র বিশ্ব অর্থাৎ মানব) আর ম্যাক্রোকজম্ (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড) একই পরিকল্পনায় সৃষ্ট। যেমন ব্যক্তিগত আত্মা

জীবন্ত দেহের আবরণে নিহিত; তেমনি বিশ্ব-আত্মা জীবন্ত প্রকৃতির অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের মধ্যে নিহিত। শিবা আলিঙ্গন করে আছে শিবকে।

যেমন শব্দের মধ্যেই তার অর্থ ওতপ্রোত। তারা একই...শুধু মন পারে তাদের পৃথক করে দেখতে। শব্দ ছাড়া ভাব অসম্ভব। তাই আদিতে ছিল শব্দ ইত্যাদি—

বিশ্ব-আত্মার এই দ্বৈত-প্রকাশ অনাদি ও অনন্ত। তাই আমরা যা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তা হলো এই রূপময় অনাদি আর রূপহীন অনাদির সম্মিলন।"

আলমোড়ায় এসে শুনলেন, সেখানে তাঁর দু'জন গুরুভাইও এসেছেন...সারদানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ...

রামকৃষ্ণের স্পর্শধন্য বরানগর মঠের সেই সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই তখন হিমালয়ের হিম-নির্জনতায় এক এক টুকরো অগ্নিকণার মত ছড়িয়ে পড়েছেন...

তপস্যার নিবিড় নিঃসঙ্গতায় তখন তাঁরা প্রত্যেকেই চলেছেন, নিজেদের সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্যে...

সে এক অপূর্ব বিজ্ঞাপন-হীন বিজন সাধনা...

অম্বা দত্তের বাগানে আবার তাঁরা চারজন একত্র হয়ে ধুনি জ্বালিয়ে বসেন...

মনে পড়ে, কাশীপুরের বাগান...

এমন সময় একদিন ফেলে-আসা পৃথিবী থেকে ধেয়ে এল এক টেলিগ্রাম... সংসারের ক্রন্দন...

পরিব্রাজক টেলিগ্রাম পড়ে নির্বাক প্রস্তরবৎ হয়ে গেলেন, তাঁর এক ভগিনী আত্মহত্যা করেছে...

সারাদিন সেই সংবাদ সংসার-পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর মনকে আচ্ছন্ন করে থাকে...

ব্যক্তিগত শোকের ছিদ্রপথ দিয়ে সন্ন্যাসী দেখেন, একটি নারী নয়...একটি ভগিনী নয়...যে দেশে তিনি জন্মেছেন...সেই দেশে, যে সমাজে তিনি জন্মেছেন...সেই দেশের সেই সমাজের বহু নারীকে...

দেখেন, বাঙলার কুটীরে কুটীরে, প্রতি গৃহস্থের ঘরে নারীর অমর্যাদা...

কানে এসে লাগে, তরঙ্গের গর্জনের মত, রুদ্ধ-দ্বার গৃহে নিশি-নির্জনতায় বঙ্গনারীর প্রতিবাদহীন নিঃশব্দ আর্তনাদ...

সে আর্তনাদ থেকে যায় সন্ন্যাসীর অন্তরে...

মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত বজ্র হয়ে যা একদিন ভেঙে পড়বে গলিত-শব-সমাজের শিরে...

এগিয়ে চলেন সন্ন্যাসী, কোন ক্রন্দন, কোন হাহাকার আজ আর পারবে না ফেরাতে তাঁকে...

আজ নয়...তবে ফিরতে হবে একদিন...

সে প্রত্যাবর্তন মহাকালের বুকে আনবে আলোড়ন...

তারই জন্যে আজ চলতে হবে এগিয়ে—

এবার দুজন নয়...চার জন...

সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, বৈকুণ্ঠ আর পরিব্রাজক...

সংগে একজন কুলী...তারই কাছে সন্ন্যাসীদের মোটপত্র...

গন্তব্য এবার ঘারওয়াল।

কর্ণপ্রয়াগে এসে তাঁরা শুনলেন, আর অগ্রসর হবার উপায় নেই...বদরিকাশ্রমে যাবার পথ ভারত সরকারের আদেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিছু দিনের জন্যে...

ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে সে অঞ্চলে।

হঠাৎ পথে অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন...পরিব্রাজকও সেই সংগে কিছু দিনের জন্যে শয্যাশায়ী হলেন।

পথের ধারে এক চটিতে বাধ্য হয়ে তাঁদের কয়েকদিন অপেক্ষা করে থাকতে হলো।

সেরে উঠে চললেন...রুদ্রপ্রয়াগের পথে।

রুদ্রপ্রয়াগে এসে আবার তাঁরা দুজনে ভয়ংকর জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

বেহুঁশ অবস্থা। কোন ওষুধ নেই...কোন ডাক্তার নেই।

ভাগ্যক্রমে তখন সেখানে ঘারওয়ালের সদর আমিন বদরী দত্ত যোশী তাঁবু ফেলে ছিলেন।

সন্ন্যাসীদের কথা জানতে পেরে তিনি তাঁর নিজের কাছে যা কবিরাজী ওষুধ ছিল, তাই দিলেন। ভাগ্যক্রমে তাতেই জ্বর সেরে গেল।

সেখান থেকে তাঁরা চললেন শ্রীনগরে। সংগের কুলীকে এইখান থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো।

অলকানন্দা নদীর ওপরে নির্জন এক কুটীরে তাঁরা একমাস থেকে গেলেন...

ধ্যানের উপযুক্ত ক্ষেত্র...

মাধুকরী ভিক্ষা করে দিন চলে...

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চলে শাস্ত্র পাঠ, আলোচনা, ব্যাখ্যা...সাধনা...

সেখান থেকে তিহ্‌রী...

পথে পথে মাধুকরী বৃত্তি...আর সুকঠোর অনুশীলন...তপস্যা...

তিহ্‌রীতে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাই রঘুনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন তিহ্‌রী রাজের দেওয়ান।

তিনি মহাসমাদরে সন্ন্যাসীদের অভ্যর্থনা করলেন।

সন্ন্যাসীরা জানালেন, তাঁরা নদীর ওপর সাধনার জন্যে নির্জন একটা আশ্রয় চান।

রঘুনাথবাবু আনন্দে স্বীকৃত হলেন।

কিন্তু হঠাৎ আবার অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বুকে সর্দি জমে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগলো।

গুরুভাইরা প্রাণপণে সেবা করেন।

সেখানকার চিকিৎসায় বিশেষ কোন সুফল না হওয়ায়, পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দকে নিয়ে দেরাদুনে চলে এলেন।



আমরা জগতে পাপ-তাপ দেখি কেন?
কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। ....আমরা নিজেরা যেমন জগৎকেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকি—
যুক্তিবাদী—বিবেকানন্দ



মিসেস ওলি বুল, নিবেদিতা প্রমুখ শিষ্যা সহ

দেরাদুনে এসে প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঘরে তিনি অসুস্থ গুরুভাই-এর জন্যে একটুখানি আশ্রয় ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন।

কিন্তু সকলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

শেষকালে অনন্তনারায়ণ বলে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ তাঁদের সাহায্য করলেন।

সেখান থেকে পরিব্রাজক তিন সপ্তাহ ধরে গুরুভাইকে সেবা করে সারিয়ে তুললেন।

সারদানন্দ এবং বৈকুণ্ঠ সেখানে এসে যোগদান করলেন।

অখণ্ডানন্দকে বিশ্রামের জন্যে এলাহাবাদে এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে তাঁরা আবার চললেন হৃষীকেশের পথে।

হৃষীকেশে এসে সেখানকার পার্বত্য অরণ্যের শোভায় পরিব্রাজক বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন।

ঠিক করলেন, সেইখানেই তিনি বসবেন গভীর ধ্যানে।

যতবার চেষ্টা করতে গিয়েছেন, একটা-না-একটা বাধা এসেছে। এবার আর নয়। এইখানে এবার তিনি বসবেন, বুদ্ধের মত নিরুত্থান তপস্যায়।

কিন্তু এবারেও হঠাৎ এলো বাধা। বারে বারে কোথা থেকে আসে এত বাধা?

পরিব্রাজকের তপস্যা-ক্ষীণ-দেহ সহসা ভীষণ জ্বরে অসাড় হয়ে পড়লো।

চারদিকে নিবিড় অরণ্য। কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

জ্বর ক্রমশঃ বিকারে পরিণত হলো। দেহ হিম হয়ে এলো। মুখে জল দিতে গেলে জল বাইরে থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। গুরুভাইদের অন্তরে হাহাকার জেগে উঠলো। বন্ধু, ভ্রাতা, গুরু, সহায়-সম্বল বলতে সেই শুধু একজন। তাঁকে ছেড়ে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারেন না।

হে গুরু, তোমার বাণী কি এমনি ব্যর্থ হয়ে যাবে অরণ্যে?

হঠাৎ সেদিন বিকেলবেলা কোথা থেকে একজন পাহাড়ী সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

পরিব্রাজকের অবস্থা দেখে, বন থেকে সে গাছ-গাছড়া তুলে এনে তার রস বার করে রোগীর মুখে দিতে বললে।

গুরুভাইরা জোর করে পরিব্রাজকের মুখের ভেতর সেই রস ঢেলে দিলেন।

রাত্রিতে জ্বর কমে এলো...পরের দিন আরও কমে গেল...দেখতে দেখতে পরিব্রাজক আবার উঠে বসলেন।

সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে তাঁরা হরিদ্বারে এলেন। সেখানে তাঁরা এসেছেন খবর পেয়ে কনখল থেকে ব্রহ্মানন্দ এসে দলে যোগদান করলেন।

সেখান থেকে সকলে মিলে সাহারানপুর হয়ে মীরাটে এলেন।

মীরাটে তখন অখণ্ডানন্দ ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের সেবায় সেরে উঠেছেন।

পরিব্রাজকের চেহারা দেখে অখণ্ডানন্দ শিউরে উঠলেন...কোথায় সে বৃষস্কন্ধ—সে বিরাট দেহ...এ যেন শীর্ণ শুষ্ক বৃক্ষচ্যুত জীর্ণ পত্র...

পরিব্রাজকের জন্যে গুরুভাইরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সেখানে শেঠজীর বাগানে তাঁরা সকলে মিলে কিছুদিন বিশ্রামের আয়োজন করলেন।

বিশ্রাম মানে, ভ্রমণ-হীনতা।

আবার তাঁরা পাঁচজন একত্র হয়েছেন...ভেঙে যাওয়া বরানগরের মঠ আবার যেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো।

পরিব্রাজক গুরুভাইদের নিয়ে গভীরভাবে শাস্ত্র-আলোচনায় দিনযাপন করেন।

সুবিধা হলো, সেখানকার লাইব্রেরি থেকে পাওয়া যায় বই।

শাস্ত্র-আলোচনা থেকে বিষয়ান্তরের জন্যে পরিব্রাজক লাইব্রেরি থেকে স্যার জন ল্যাবকের গ্রন্থাবলী আনান।

পরের দিনই সমগ্র গ্রন্থাবলী ফেরত দিয়ে দেওয়া হলো।

গ্রন্থাগারিক ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বই না পড়েই ফেরত দিলেন?

পরিব্রাজক হেসে বলেন, সে কি কথা! সমস্ত গ্রন্থই পড়েছি!

গ্রন্থাগারিক চিৎকার করে ওঠেন, অসম্ভব! এক রাত্রির মধ্যে এতগুলি বিরাট গ্রন্থ পড়া কখনই সম্ভব হতে পারে না!

পরিব্রাজক বলেন, বেশ তো, আপনি যে-কোন গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন করুন।

গ্রন্থাগারিক প্রশ্ন করেন, পরিব্রাজক উত্তর দেন।

কিছুক্ষণ পরে গ্রন্থাগারিক প্রশ্ন না করে শুধু নির্বাক-বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

পাঁচমাস মীরাটে শেঠজীর বাগানে বাস করার পর যাযাবর পরিব্রাজকের মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হিমালয়ের অগম্য তুহিন-নির্জনতা আবার তাঁকে ডাকে, চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে সেই মানব-স্পর্শহীন শুভ্র সম্পূর্ণ নীরবতায় ডুবে যেতে...

তাই একদিন গুরুভাইদের ডেকে বললেন, দীর্ঘদিন এক জায়গায় এরকম ভাবে বাস করা চলে না। মনস্থ করেছি, এবার একাই বেরুবো!

অখণ্ডানন্দ অনুনয় করে, আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি...আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

সন্ন্যাসী বলেন, দেখলাম পরিব্রাজকের সঙ্গী থাকা উচিত নয়। গুরুভাই হলেও, তোমাদের মায়া...মায়াই! তুমি অসুস্থ হলে, আমাকে দেখতে হবে। আমি অসুস্থ হলে, তোমাকে দেখতে হবে...পরস্পর পরস্পরকে এইভাবে মায়ায় বেঁধে রাখবো। তা হয় না। সব মায়া থেকে এবার নিজেকে বিমুক্ত করে শেষ-দেখা দেখবো!

একান্ত বেদনায় গুরুভাইরা আর প্রতিবাদ করেন না।

রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী একা আবার বেরিয়ে পড়েন...

নামহীন, পরিচয়হীন, ভারত পথের একক যাত্রী...

বিমর্ষ অন্তরে নরেন্দ্রনাথকে বিদায় দিয়ে, গুরুভাইরাও তীর্থযাত্রায় বেরুলেন।

ঘুরতে ঘুরতে দিল্লীতে এসে তাঁরা শুনলেন, সেই শহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসেছেন। ইংরেজীতে কথা বলেন...নাম, বিবিদিশানন্দ...

গুরুভাইদের মহা কৌতূহল হলো, কে এই ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী?

একদিন তাঁরা সকলে মিলে সেই সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে চললেন।

বহু অনুসন্ধানের পর তাঁরা স্বামী বিবিদিশানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন।

আনন্দিত অন্তরে দেখেন, ইংরেজী-জানা সাধু আর কেউ নন...তাঁদেরই নেতা... নরেন্দ্রনাথ...

গুরুভাইদের আনন্দের সীমা নেই...কিন্তু তাঁদের দেখে, নরেন্দ্রনাথ যেন খেপে উঠলেন।

—তোমাদের বার বার করে বলেছি, আমি একা থাকতে চাই। বার বার করে অনুরোধ করেছি, আমাকে অনুসরণ কোরো না!

ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা বলেন, শহরে এসে শুনলাম, ইংরেজী-জানা কে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসেছেন...তাই কৌতূহল হলো, দেখা করবার জন্যে!

পরিব্রাজক বলেন, তোমাদের আবার বলছি, আর আমাকে অনুসরণ করো না তোমরা! এখুনি আমি দিল্লী ছেড়ে চলে যাবো...কোথায় যাচ্ছি...কেউ জানতে চেয়ো না। মনে রেখো, এ আমার আদেশ। আমি নামহীন, পরিচয়হীন, সম্পূর্ণ নতুন...পুরোনো পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার...যেখানে আমার মন আমাকে টেনে নিয়ে যাবে, পাহাড়ে হোক, সমুদ্রে হোক, মরুভূমিতে হোক, গহন বনে হোক, সেইখানেই আমি যাবো...প্রার্থনা করি, তোমরা প্রত্যেকেই যে যার বাসনা অনুযায়ী সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর...বিদায়!

দিল্লী ছেড়ে স্বামী বিবিদিশানন্দ আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

কি এক মহা-চাঞ্চল্য তাঁর দেহমনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না...দৃষ্টির অন্তরাল থেকে কোন মহা-ভবিতব্যতা যেন তাঁকে পলে পলে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে...এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁকে কোথাও স্থির থাকতে দেয় না।

সর্ব-মোহ, সর্ব-ভয়, সর্ব-মায়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কঠোর কঠিন সাধনায় অর্জন করতে হবে, অবিনাশী শক্তি...বন্ধন-মোচন মন্ত্র...

এই সময় ধর্মপদের একটি শ্লোক পরিব্রাজকের অস্থির চিত্তে বেদমন্ত্রের মত কাজ করে—

"পথ-হীন পথে, একা এগিয়ে চল পথিক...
ভয় যেন তোমাকে দেখে ভীত হয়,
কোন আসক্তি যেন পারে না তোমার অন্তর স্পর্শ করতে,
এগিয়ে চল পথিক।
এগিয়ে চল একা অরণ্যে করী-রাজের মত...
এগিয়ে চল একা মত্ত কেশরীর মত,

কোন শব্দ যেন বিচলিত না করে তোমার চিত্ত...
এগিয়ে চল হে পথিক নির্ভীক।
এগিয়ে চল চলমান বায়ুর মত,
কোন বন্ধনে যাকে যায় না বাঁধা,
কোন জালে যাকে যায় না ধরা,
এগিয়ে চল চলমান বায়ুর মত,
চিত্ত হোক্ তোমার পদ্মপাতার মত,
জলকণাও যা থেকে আপনি পড়ে যায় গড়িয়ে।”

চোখের সামনে রক্ষা কবচের মত দুলতে থাকে নামহীন কবির এই অমৃত আশ্বাস...

কবিতা নয়, যেন জীবন্ত স্পর্শ।

সাধনার সুমেরু-শিখর...জনহীন...অনন্ত নীরবতার রাজ্য!

ভক্ত আর ভগবান যেখানে করেন রমণ...বিশ্বের অধিকার নেই সেখানে প্রবেশ করবার।

নরেন্দ্রনাথের সাধনার জীবনের সেইসব মহা-মুহূর্তের কথা জানবার সৌভাগ্য ইতিহাসের হয় নি।

মানুষের প্রচলিত ইতিহাস শুধু তরবারীধারী জয়ী সেনাপতির বিজয়-বিজ্ঞাপন ...রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার নির্ভুল তালিকা...কে এল কে গেল তারই টাইম-টেবল...বাহির ঘটনার মুখর মেলা...অন্তরের মহা-মুহূর্তের নিস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্র...

পরিব্রাজককে অতঃপর আমরা আবার ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি আলোয়ার রেলওয়ে স্টেশনে, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন সকাল বেলা।

স্টেশন থেকে বাইরে এসে সেই সুন্দর নগরীর দিকে আনন্দিত হৃদয়ে পরিব্রাজক চেয়ে থাকেন।

মেঘচুম্বী অট্টালিকা...সুরম্য উদ্যান...অতীতের শত স্মৃতিবিজড়িত রাজপুতানার আকাশ...

পরিব্রাজক ঘুরতে ঘুরতে আলোয়ার স্টেটের সরকারী ডিস্‌পেনসারির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ইচ্ছা, ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে, এখানে কোন বাঙালী বাস করেন কি না!

ভাগ্যবশতঃ সেই ডিস্‌পেনসারির ভার যে ডাক্তারের ওপর ছিল, তিনি একজন বাঙালী...গুরুচরণ লশকর...

ডিস্‌পেনসারির বাইরে পথে অপরূপ-দর্শন জ্যোতির্ময় এক সন্ন্যাসীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, গুরুচরণবাবু তাড়াতাড়ি বাইরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন।

পরিব্রাজক সস্নেহে আশীর্বাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন...সন্ন্যাসীর থাকার মত এখানে কোন জায়গা আছে?

গুরুচরণবাবু তাঁকে নিয়ে বাজারে এক দোকানের ওপরে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, এই ঘরটি যাত্রীদের জন্যে রাখা হয়েছে। আশা করি, এই ঘরটিতে আপনার চলবে।

পরিব্রাজক সানন্দে সম্মতি জানালেন।

তাঁকে সেখানে পৌঁছে দিয়েই গুরুচরণবাবু ছুটলেন, তাঁর বন্ধুর কাছে...এক মুসলমান মৌলভী অতি ভক্তিমান সজ্জন ব্যক্তি। স্থানীয় স্কুলের উর্দু এবং ফারসীর শিক্ষক।

বন্ধুকে ডেকে জানালেন, এক বাঙালী দরবেশ এসেছেন! এ রকম জ্যোতির্ময় চেহারা জীবনে আমি আর দেখি নি! চলুন...আমি যতক্ষণ কাজ সেরে না আসি, আপনি ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করুন!

আমি যত শিগগির পারি যাচ্ছি!

মৌলভী সাহেব তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন, একজন দরবেশ শান্তভাবে ঘরের মধ্যে বসে আছেন... একটা পুঁটলিতে খানকতক বই, পরনের কাপড় ছাড়া আর একখানা গেরুয়া কাপড়... কমণ্ডলু আর একটি লাঠি...

মৌলভী সাহেবকে দূরে কুণ্ঠিতভাবে বসতে দেখে দরবেশ তাঁকে কাছে ডেকে নেন। শুরু হয় দুজনের আলাপ ও আলোচনা।

বাঙালী দরবেশের পাণ্ডিত্য দেখে মৌলভী সাহেব অবাক হয়ে যান। এই অল্প বয়সে এমন পাণ্ডিত্য সম্ভব হলো কি করে? ক্রমশঃ কোরান সম্বন্ধে কথা ওঠে। মৌলভী নিজেই সে কথা তুললেন। সাধারণতঃ হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সে-সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞান কেউই আশা করেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ আলোচনার পর মৌলভী নিজেই যেন বিব্রত হয়ে পড়েন।

আলোচনা শেষ করে দরবেশ বলেন, কোরান সম্পর্কে যখনি চিন্তা করি, তখনি বিস্ময়ে ভাবি, এগারো শো বছর আগে প্রথম যেদিন কোরানের বাণীর জন্ম হয়, সেদিনও তা যা ছিল, আজও ঠিক তাই-ই আছে। তার আদিম পবিত্রতা একটি অক্ষরের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সেদিনকার মত যখন আলাপ শেষ হলো, দুজনেই দুজনকার পাণ্ডিত্যে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

গুরুচরণবাবু বাড়িতে না ফিরে শহরের প্রত্যেক পরিচিত জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেদিন রাত্রিতেই সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা ঘোষণা করে বেড়ালেন।

ভোর হতে না হতে লোক আসতে শুরু করে দিল। একদল চলে যায়, আর একদল আসে। বাজারের ওপর সেই ছোট্ট ঘরখানি যেন সহসা তীর্থ হয়ে উঠলো!

সকলের মুখে এক আনন্দিত বিস্ময়!

শিয়া, সুন্নী, শৈব, বৈষ্ণব, ধনী, দরিদ্র...কুলী, চাষী...সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর

মানুষ চুম্বক-আকৃষ্ট লৌহের মত তাঁর কাছে আসতে শুরু করে দিল। সেই ক্ষণিক পরিচয় ও আলাপের স্মৃতি প্রত্যেকের মনে যেন চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়।

প্রত্যেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রশ্ন। নানান ধরনের প্রশ্ন।

পরিব্রাজক শান্তভাবে প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর দেন। যে উত্তর সোজা প্রশ্নকর্তার অন্তরে গিয়ে ধাক্কা দেয়। উত্তরের অভিনবত্বে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে।

তার মধ্যে অসংগত প্রশ্নও পরিব্রাজককে শুনতে হয়।

বিরক্ত না হয়ে, ধীরভাবে তাদেরও উত্তর দেন।

হঠাৎ কেউ জিজ্ঞাসা করে বসলো, মহারাজ, আপনার জাত—

সন্ন্যাসী সংগোপন করবার কোন চেষ্টা না করেই অতি সহজভাবে উত্তর দেন, ব্রাহ্মণ নই, আমি জাতিতে কায়স্থ।

—আপনি গেরুয়া পরেছেন কেন?

—ভিখারীর বেশ বলে। যদি আপনাদের মত সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়াই, তাহলে দরিদ্র ভিক্ষুকেরা হয়ত আমাকে দেখে আমার কাছ থেকে অর্থভিক্ষা চাইতে পারে। আমি নিজে ভিক্ষুক...অধিকাংশ সময়ই আমার কাছে একটিও পয়সা থাকে না। সে অবস্থায় যদি কেউ আমার কাছে ভিক্ষা চায়, তাকে বিমুখ করার যে যাতনা হবে তা আমি সইতে পারবো না। তাই এই ভিক্ষুকের বেশ নিয়েছি...দেখলেই ভিক্ষুকে বুঝবে আমিও তার মত নিঃস্ব।

এ প্রশ্নের যে এ উত্তর হতে পারে, তা প্রশ্নকর্তার ধারণাতেই ছিল না।

ক্রমশঃ সেই বাঙালী দরবেশকে ঘিরে একটি ধর্ম-চক্র গড়ে উঠতে থাকে।

সকালে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায়...দরবেশকে ঘিরে তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকে!

দরবেশ গান করেন, শাস্ত্র পড়েন, আলোচনা করেন...

আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব কথা বলেন, শ্রোতাদের কানে তা নতুন লাগে...মনে কি যেন আলোড়নের সৃষ্টি করে...এ কি রকম সন্ন্যাসী? মন্ত্র-তন্ত্রের কথা বলে না, স্বর্গ-নরকের ধারণা অতি বাস্তব জিনিস...মেঘের ওপরে অদৃশ্য কোন কল্পলোকে তার জন্মভূমি নয়, আমার ধর্ম জন্মেছে দরিদ্রের চোখের লোনা জলে, বঞ্চিতের হাহাকারে, বস্ত্রহীনের নির্লজ্জ অসহায় নগ্নতায়...আমার ভগবান শাস্ত্রের জটিল তর্কের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে না...আমার ভগবান সত্য, প্রত্যক্ষ, জীবন্ত... এই মর্ত্য পৃথিবীর মরণশীল মানব, এই আমার ভগবান...

লোকে বিস্মিত হয়ে শোনে...যেমন রাত্রির তন্দ্রার মধ্যে সমুদ্রতীরবাসীরা শোনে সমুদ্রে ঝড়ের গর্জন...

কথা বলতে বলতে তরুণ সন্ন্যাসীর বিরাট আয়ত চক্ষুতে যেন কোন্ চাপা আগুনের লাল আঁচ ঝিলিক দিয়ে ওঠে...দুটি চোখ যেন চোখ নয়, দুটি জ্বলন্ত প্রদীপ...

সে আগুনের আঁচ কখন অজ্ঞাতে শ্রোতাদের হিম-অন্তরে দিয়ে যায় প্রাণারাম উষ্ণতা, জীবন্ত সরলতার ইঙ্গিত...

বিস্ময়ে তারা চেয়ে থাকে, যেমন করে লক্ষ যোজন দূর থেকে মানুষ চেয়ে থাকে,

আকাশে সহসা যখন দেখা দেয় নতুন কোন জ্যোতিষ্ক...চেয়ে থাকে আর অনুভব করে, দৃষ্ট আর দ্রষ্টার মধ্যে যোজনান্ত ব্যবধান...

সব চেয়ে বিস্ময় লাগে, যখন তারা সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে শোনে, আর এক অনুরূপ মানুষের কথা...যে মানুষ নাকি নিজের জীবন দিয়ে জগতের সব মহাসত্যকে পরীক্ষা করে দেখে গিয়েছেন...অংকশাস্ত্রের মত যিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন, জগতের সব বিভিন্নতার মধ্যে আছে মিলনের মহাযোগফল...

সন্ন্যাসী বলেন, আমি সেই মহাপুরুষের বাণীকেই বহন করে নিয়ে চলেছি... আমার ব্রত, তাঁর বাণীকে আমি পৌঁছে দেবো বিশ্বের প্রতিঘরে...নতুন মানব-ধর্মে নবজন্মলাভ করবে এই মৃতা পৃথিবী!

বলতে বলতে সন্ন্যাসীর দুই চোখ বন্ধ হয়ে আসে...অধরোষ্ঠ মৃদু মৃদু কাঁপতে থাকে...অন্তরের গহন-গভীর থেকে শুধু শোনা যায়, উচ্চারিত হচ্ছে একটি অক্ষর... মা...মা...মা...

শ্রোতারা ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট অনুভব করেন, তাঁদের সামনে থেকে সেই মুহূর্তে তিনি যেন চলে গিয়েছেন বহু বহুদূরে...সাধনার সুমেরু-শিখরে বিশ্ব-রমার মাতৃক্রোড়ে...

মৌলভী সাহেবের দুর্দমনীয় বাসনা হলো, দরবেশকে একদিন তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবেন।

কিন্তু মুসলমান হয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীকে সে কথা বলতে তাঁর সাহসে কুলোয় না।

তিনি জানেন, এ আবদার নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন...

বিশেষ করে হিন্দু-সমাজের মধ্যে হিন্দু-ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যখন আছেন।

কয়েকদিন বাজারের ঘরে বাস করবার পর, আলোয়ার স্টেটের ভূতপূর্ব এঞ্জিনিয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজী বহু অনুনয় বিনয় করে স্বামীজীকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তাই মৌলভী সাহেবকে প্রথম সে কথা পণ্ডিতজীকে জানাতে হবে। কেমন করে একথা তিনি পণ্ডিতজীকেই বা বলেন?

কিন্তু বাসনার তীব্রতায় একদিন তিনি গোপনে পণ্ডিতজীকে তাঁর অন্তরের কথা জানিয়ে বললেন, আপনাদের সন্তুষ্টির জন্যে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যেদিন স্বামীজী আমার বাড়িতে যাবেন, আমি গঙ্গাজল দিয়ে আমার ঘরদোর সমস্ত ধুয়ে দেবো...তিনি যে খাদ্য গ্রহণ করবেন, আলাদা ব্রাহ্মণ দিয়ে ব্রাহ্মণদেরই বাসন-পাত্রে তা তৈরি করাবো...আমি শুধু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবো, তিনি আমার দেওয়া অন্ন গ্রহণ করছেন!

পণ্ডিতজী সে কথা স্বামীজীকে জানাতে, স্বামীজী বলে উঠলেন, তাঁকে এসব কাণ্ড করতে বারণ করে দেবেন, আমার কাছে জাত অজাতের কোন বালাই নেই। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো!

মৌলভী সাহেব যখন সেই কথা শুনলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

পরের দিন স্বামীজী তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করে এলেন।

মৌলভী সাহেবের দেখাদেখি, অন্য মুসলমান বন্ধুরাও স্বামীজীকে একে একে নিমন্ত্রণ করলেন।

প্রত্যেকের নিমন্ত্রণই স্বামীজী রক্ষা করলেন।

আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী সেই গেরুয়াধারীর কাছে মাথা নত করলেন। সন্ন্যাসীর কথা শুনে তাঁর অন্তরে এক গূঢ় বাসনা জেগে উঠলো। আলোয়ার রাজ্যের তদানীন্তন শাসক মহারাজ মঙ্গল সিং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার স্রোতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্যের এবং রাজার কল্যাণ-কামনায় দেওয়ানজী মনে মনে স্থির করলেন, মহারাজাকে এই সন্ন্যাসীর সামনে নিয়ে আসতে হবে। সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনি যে অপরূপ ব্যক্তিত্ব প্রথম সাক্ষাতেই লক্ষ্য করেছিলেন, তার ওপর আস্থা রেখেই তিনি এই মিলনের উদ্যোগ করতে সাহসী হয়েছিলেন। নইলে, কোথায় এক নামহীন গেরুয়ামাত্র সম্বল সন্ন্যাসী, আর কোথায় পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় সমর্পিত-দেহমন আলোয়ারের মহারাজা!

মহারাজা তখন শহর থেকে কিছু দূরে তাঁর প্রাসাদে বিশ্রামসুখ ভোগ করছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর তাঁকে পত্র লিখে জানালেন, শহরে সত্যিকারের একজন সাধুপুরুষ এসেছেন। তাঁর ইংরেজী ভাষাজ্ঞান দেখলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

চিঠি পড়ে মহারাজার কৌতূহল হলো। ইংরেজী জানা হিন্দু সন্ন্যাসী... কথাটার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বইকি!

পরের দিনই মহারাজা স্বয়ং অযাচিতভাবে দেওয়ানজীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীজী তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন।

দেওয়ান বাহাদুর মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীর সামনে উপস্থিত হলেন।

সন্ন্যাসীকে দেখে মহারাজা মাথা নত করে অভিনন্দন জানালেন।

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজাকে আশীর্বাদ করলেন।

মহারাজা বললেন, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

তারপর মহারাজা নিজেই আলাপ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন, স্বামীজী মহারাজ, দেওয়ানজীর কাছে শুনলাম আপনি একজন মহাপণ্ডিত লোক। আপনি ইচ্ছা করলেই মাসে মাসে প্রভূত টাকা উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু তা না করে, আপনি ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?

পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজার মতই প্রশ্ন!

সন্ন্যাসী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তার আগে মহারাজ, আপনি বলুন, আপনি কেন সাহেবদের সঙ্গে মিশে শিকার করে সময় নষ্ট করেন...রাজ্যের কাজের গাফিলতি করেন?

শাশ্বত ভারতের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতই জিজ্ঞাসা!

দেওয়ান বাহাদুরের হৃদ্‌স্পন্দন সহসা দ্রুততর হয়ে উঠলো, এ অনুমান করা হয়ত খুব অনৈতিহাসিক হবে না। মহারাজার সঙ্গে অনুচরবর্গ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা

রাগে সোজা হয়ে উঠলেন। মনে মনে তাঁরা সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

মহারাজা স্বয়ং এই ধরনের উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং কয়েক মুহূর্ত তাঁকে নীরব থাকতে দেখা গেল।

তারপর উত্তর দিলেন, কেন করি, তা হয়ত ঠিক বলতে পারি না, তবে, এ কথা ঠিক, করতে ভাল লাগে, তাই করি!

তৎক্ষণাৎ স্বামীজী বলে উঠলেন, আপনার প্রশ্নেরও আমি ঠিক সেই উত্তরই দিচ্ছি...আমার ভাল লাগে, তাই করি!

মহারাজা মঙ্গল সিংকে সে উত্তর হজম করে নিতে হলো। কিন্তু এই পরাভবকে ঢাকবার জন্যে তিনি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে ওঠেন, কিন্তু বাবাজী মহারাজ, আপনাদের ওই পুতুল পুজো তো আমি আদৌ মানি না! আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই খুব দুর্গতি আছে, কি বলুন?

সিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

তিক্তকণ্ঠে স্বামীজী বলেন, আপনি রহস্য করতে চাইছেন, না?

সে কণ্ঠস্বরের প্রতিক্রিয়ায় মহারাজা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, না স্বামীজী, না... আমি রহস্য করছি না! আমি সাধারণ লোকদের মত এই কাঠ মাটি পাথরকে পুজো করতে পারি না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, মৃত্যুর পর আমাকে বোধহয় নরকে যেতে হবে, না?

স্বামীজী গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, আমার ধারণা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত, তার নিজের অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণ করা!

উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে, দেওয়ালে মহারাজার একটা প্রতিকৃতি টাঙানো রয়েছে।

সন্ন্যাসী দেওয়ান বাহাদুরকে বললেন, ওই ছবিটা আনুন না, একটু দেখবো!

দেওয়ানজী ছবিটি নামিয়ে সন্ন্যাসীর হাতে দেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করেন, এ ছবিটি কার?

দেওয়ানজী বলেন, মহারাজেরই!

হঠাৎ আসন থেকে উঠে, ছবিটি দেওয়ানজীর সামনে ধরে সন্ন্যাসী আদেশ করে ওঠেন, দেওয়ানজী, থুতু ফেলুন এই ছবিটার ওপর!

এক মুহূর্তের মধ্যে রাজ-অনুচরদের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীর আস্পর্ধায় তাদের দেহ কাঁপতে থাকে।

ভ্রূক্ষেপ না করে সন্ন্যাসী স্পষ্টকণ্ঠে আবার বলে ওঠেন, কী, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনাদের মধ্যে কেউই পারেন না এটার ওপর থুতু ফেলতে? এটা কি? শুধু তো একটা কাগজ? কিসের আপত্তি আপনাদের?

দেওয়ানজী বজ্রাহতের মত একবার মহারাজার দিকে চান আর একবার সন্ন্যাসীর দিকে চান।

সন্ন্যাসী তেমনি অকুণ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো আপনাদের? থুতু ফেলুন।

আর থাকতে না পেরে দেওয়ানজী বলে উঠলেন, আপনি এ কি বলছেন? এ যে মহারাজার প্রতিকৃতি!

সন্ন্যাসী বলেন, তা হতে পারে...কিন্তু মহারাজ তো দেহধারী হয়ে এই ছবিতে নেই! এ তো শুধু এক টুকরো কাগজ! এতে নেই মহারাজার অস্থি, মজ্জা, রক্ত... এ জড়পদার্থ...ইট, কাঠ, মাটির সামিল...আপনাদের মহারাজার মত নড়ে না, চড়ে না, কথা বলে না। তবু আপনারা যে কেউই এর ওপর থুতু ফেলতে পারলেন না, তার কারণ এই জড় ছবির মধ্যে আপনারা দেখেন মহারাজার অস্তিত্বের ছায়া...আপনারা জানেন, এই জড় ছবির ওপর যদি থুতু ফেলা হয়, তা হলে, এই জড় ছবির প্রতীক যিনি, তিনি আপনাদের প্রভু, তাঁকেই অপমান করা হয়।

তারপর মহারাজার দিকে ফিরে সন্ন্যাসী বলেন, তাহলে দেখুন মহারাজ, এই জড় ছবি একপক্ষে আপনি নন্...আর একপক্ষে নিশ্চয়ই আপনি। এই ছবি যে আপনিই...সেই জন্যেই আপনার অনুরক্ত সেবকেরা এর ওপর থুতু ফেলবার কথা শুনেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

এই ছবির মধ্যে আপনার অনুকৃতি আছে, এই ছবি দেখলে আপনার কথাই স্মরণে জাগে। মাত্র একবার দৃষ্টিপাত করলেই ওঁরা এই ছবির মধ্য দিয়ে আপনাকে দেখতে পান। তাই, ওঁরা সাক্ষাৎ ভাবে আপনাকে যে শ্রদ্ধা করেন, সেই শ্রদ্ধা এই জড় ছবিকেও দেখালেন। তাই, যাঁরা ইট কাঠ মাটির প্রতিমা বা প্রতিমূর্তি গড়ে ইষ্টের আরাধনা করেন, তাঁরা সেই প্রতিমা যাঁর প্রতিকৃতি তাঁরই পূজা করেন। সেই ছবি বা প্রতিমার প্রয়োজন শুধু ইষ্টের প্রতি চিত্তকে আরোপ করবার সহায়তার জন্য। তাই তাঁরা কেউই ইট, কাঠ বা মাটিকে পূজো করেন না...আমি বহু দেশ বহু তীর্থ ঘুরে বেড়িয়েছি...কোথাও দেখি নি, কোন হিন্দু প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, হে প্রস্তর! হে কাষ্ঠ, হে কর্দম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও! বিশ্বাস করুন মহারাজ, প্রত্যেকেই আমরা পূজা করি সেই এক ঈশ্বরকে যিনি সর্বমূলাধার...পূর্ণ-জ্ঞানের অনাদি সত্তা! সেই এক অনাদি পুরুষ প্রত্যেক ভক্তের বাসনা-অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছেই তদ্-রূপে দেখা দেন। এই হলো আমার কথা...আমার বিশ্বাস আপনার কথা, আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে আমি অবশ্য কিছুই বলতে পারি না!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ মঙ্গল সিং হাতজোড় করে সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় নত হয়ে পড়েন, বলেন, ক্ষমা করুন, সন্ন্যাসী! এ কি আলো আপনি এনে দিলেন আমার মনে? দয়া করুন আমাকে!

সন্ন্যাসী কাতর হয়ে বলেন, আমি কি দয়া করবো মহারাজ? একমাত্র যিনি দয়া করতে পারেন, তাঁরই কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করুন...নিশ্চয়ই তিনি দয়া করবেন!

সেদিনকার মত সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহারাজা নিভৃতে রামচন্দ্রজীকে ডেকে বলেন, দেওয়ানজী যেমন করে হোক, এই মহাত্মাকে কিছুদিন অন্ততঃ এখানে ধরে রাখতে হবে!

দেওয়ানজী বলেন, চেষ্টা করবো! পারবো কি না, বলতে পারি না! এমন স্বাধীন মানুষ আমি আর দেখি নি মহারাজ!

মহারাজ মঙ্গল সিং দেওয়ান বাহাদুরকে নিভৃতে ডেকে বললেন, যেমন করেই হোক, দেওয়ানজী, সন্ন্যাসীকে কিছুদিন এখানে থাকতে রাজী করান।

দেওয়ানজী সন্ন্যাসীকে কাতরভাবে অনুরোধ করেন।

সন্ন্যাসী বলেন, আমি বেরিয়েছি ভারতবর্ষকে দেখবার জন্যে, জানবার জন্যে, একস্থানে আবদ্ধ হয়ে তো থাকতে পারি না, আমি পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করেছি... সে ব্রত আমাকে উদ্‌যাপন করতেই হবে।

তবু দেওয়ানজী অনুরোধ করেন।

সন্ন্যাসী অগত্যা রাজী হন ; কিন্তু এক শর্তে, রাজ-আশ্রয়ে থাকলেও তাঁর কাছে সাধারণ গরিব-দুঃখীদের সব সময়ে অবাধ যাওয়া-আসা করবার অধিকার থাকবে।

দেওয়ানজী সেই ব্যবস্থাই করলেন।

আলোয়ারের তরুণ ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে বসলো। তাদের নিয়ে সন্ন্যাসী রীতিমত অধ্যাপনা শুরু করলেন।

—মন-প্রাণ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর এবং সেই সঙ্গে গভীর ভাবে অনুশীলন কর পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান!

ছাত্রদের মধ্যে একজন বলে, কিন্তু সংস্কৃত কেন?

সন্ন্যাসী উত্তর দেন, আজ আমাদের জাতীয় কৃষ্টির জন্যে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন আমাদের দেশের সত্যিকারের ইতিহাসকে জগতের সামনে তুলে ধরা। ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ রাজতান্ত্রিক বিদেশী শাসকের ইঙ্গিতে অনুদার লেখনী দ্বারা বিকৃত। সে আমাদের লজ্জার ইতিহাস, আমাদের পরাজয়ের ইতিহাস, আমাদের দৈন্যের ইতিহাস। তার বদলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সত্য অনুশীলনের ভিত্তিতে লিখতে হবে ভারতের সত্য ইতিহাস, অপরাজেয় ভারতবর্ষের অমর ইতিকথা...তা কখনো বিদেশীদের লেখা দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। তাই আজ ভারতবাসীকেই লিখতে হবে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং তা কিছুতেই সম্ভব হবে না, যদি না আমরা ভাল করে সংস্কৃত জানি...

তরুণ ছাত্ররা নির্বাক-বিস্ময়ে শোনে, সন্ন্যাসীর মুখে জাতীয় শিক্ষার নব-পরিকল্পনার কথা...

বলতে বলতে এক অপরূপ দিব্য জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর মুখ...

—ডুব দাও মহাসাগরের জলে...তুলে নিয়ে এসো সেই অতল-তরল গহ্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া জাতির সম্পদ...হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত যেমন আকুল আগ্রহে ঘুরে বেড়ায় পিতা, তেমনি আকুল আগ্রহে কর অনুসন্ধান, যতক্ষণ না খুঁজে পাও হারিয়ে যাওয়া সেই মহাজ্ঞানকে...চলুক অতন্দ্র সাধনা, যতক্ষণ না ভারতের অতীত গৌরব গণ-চেতনায় পায় নবজন্ম...

গণ-চেতনায় ভারতের নব-জন্ম...
অদূর-আগত ভবিষ্যতের পথের রেখা...
পরিব্রাজক চলে বীজ বপন করে...

কত না রকমের লোক আসে যায়।

সবাই চলে গেলে এক বৃদ্ধ রোজ পায়ে লুটিয়ে পড়ে, বলে, বাবা দয়া কর।

সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন, বৃদ্ধ কি চায়।

একদিন তিনি বৃদ্ধকে উপদেশ দিলেন, দু' একটি সহজ ক্রিয়া দেখিয়ে দিয়ে তা নিয়মিত অভ্যাস করতে বললেন।

কিন্তু পরের দিনই বৃদ্ধ আবার সেই রকমভাবে কৃপা প্রার্থনা করে।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করে জানেন, উপদেশমত অভ্যাস সে করে নি।

বৃদ্ধ ফিরে যায়, আবার পরের দিন আসে। সন্ন্যাসী সেদিন মুখ ভার করে বসে থাকেন। বৃদ্ধের কোন কথার জবাব দেন না। বৃদ্ধ বারবার প্রশ্ন করেও যখন সন্ন্যাসীর কোন উত্তরই পেলো না, রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়ায়।

—যত শালা বুজরুক...ভণ্ড...

বৃদ্ধ ছুটে বেরিয়ে যায়। সন্ন্যাসী বালকের মত অট্টহাস্য করে ওঠেন।

কয়েকজন তরুণ ভক্ত সে দৃশ্য দেখেছিল, বিস্ময়ে তারা জিজ্ঞাসা করে, বৃদ্ধের প্রতি এত বিরূপ হলেন কেন?

সন্ন্যাসী হেসে বলেন, সারা জীবন অনাচার করে এসে, ওরা অসহায় হয়ে ছুটে আসে সন্ন্যাসীর কাছে...সন্ন্যাসী যোগের প্রভাবে ভেলকীতে ওদের সব দুঃখ দূর করে দেবে। নিজেরা কোন পরিশ্রম করবে না...কোন সাধনা করবে না। এই ভেলকী-দেখানো ধর্মের বিরুদ্ধেই আমার অভিযান। প্রত্যেক ভারতবাসীর দরজায় গিয়ে আজ বলতে হবে, কর্মই হলো আজ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম...ধর্মকে আজ ধার্মিকদের হাতের নিত্য অপমান থেকে রক্ষা করতে হবে...

দেখতে-দেখতে সাত সপ্তাহ কেটে যায়...

সাত সপ্তাহ এক জায়গায় আবদ্ধ পরিব্রাজকের মন অস্থির হয়ে ওঠে...কতটুকুই বা পথ এসেছেন, এখনও সামনে অনেক পথ বাকী...যাত্রা কর, যাত্রা কর হে যাত্রী, নিত্য আসে পথের আহ্বান...

আবার সন্ন্যাসী তুলে নেন দণ্ড কমণ্ডলু...

শিষ্যেরা পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে, অন্ততঃ পাণ্ডুপোল পর্যন্ত আপনাকে আমরা পেঁছে দেব...আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাব...

তারা নাছোড়বান্দা...এই পথটুকু পাদপহীন, শুষ্ক প্রখর মার্তণ্ড-তেজ-দগ্ধ মরুভূপ্রায়...এই পথটুকু পদব্রজে নয়, যেতে হবে তাদের সঙ্গে গরুর গাড়িতে।

সন্ন্যাসীকে রাজী হতেই হয়।

পাণ্ডুপোলে পেঁছে হনুমানজীর মন্দিরের চত্বরে নিশিযাপন করেন।

প্রভাতে সেখান থেকে গরুর গাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু কয়েকজন ভক্ত তখনও সঙ্গে রয়ে গেল। তাদের নিয়ে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু করলেন যাত্রা।

সামনে পার্বত্য-পথ...ঘন জঙ্গলে বিলুপ্ত...হিংস্র বন্যজন্তুর রাজ্য...

সন্ন্যাসী গল্প বলতে বলতে এগিয়ে চলেন...অনুচরেরা ভুলে যায় পথের ভয়...

বনের ধারে ছোট্ট গ্রামে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরের সামনে নেমে আসে সন্ধ্যা... সে রাত্রি সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণেই কেটে যায়...

প্রভাতে আবার শুরু হয় পথ-চলা—

সেখান থেকে আঠারো মাইল দূরে নারায়ণী গ্রামে এসে সন্ন্যাসী অনুচরদের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা চেয়ে নিলেন।

তারা ফিরে এলো স্বগ্রামের দিকে...পরিব্রাজক একা চললেন এগিয়ে।

এক প্রদীপ থেকে জ্বলে ওঠে সহস্র দীপ...যেখান দিয়ে যান...দুধারে জ্বলে ওঠে দীপান্বিতার মত আলোর মালা...

ঊনবিংশ-শতাব্দীর শেষ পর্বত-শৃঙ্গের আড়ালে দেখা দেয় অরুণিম-আভা... ভারতে বিংশ-শতাব্দীর নিঃশব্দ অভ্যুদয়...

নিদ্রিত ভারতে সন্ন্যাসী একা চলেন তাকে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে আসতে...

সন্ন্যাসীর পদধ্বনিতে বেজে ওঠে তার আগমনী-ঋক, নিদ্রিত ভারতের বোধন মন্ত্র।

গ্রাম থেকে সন্ন্যাসী এসে পড়েন শহরে।

জয়পুর...আজমীঢ়...

শতস্মৃতি বিজড়িত রাজপুতানার মর্মস্থল।

ধ্যান সমাহিত সন্ন্যাসীর চিত্তে জেগে ওঠে আবার বিগত দিনের সব মৃত-মুহূর্ত...

সেখানে আবার জ্বলে ওঠে জহর-ব্রতের চিতাগ্নি-শিখা, জেগে ওঠে 'ম্যঁয় ভূখা হুঁ'র আর্তনাদ...সূর্যালোকে ঝলমল করে শত সহস্র মুক্ত কৃপাণ...কানে এসে বাজে রক্তাক্ত রাজপুতানার ঊর্ধ্বলোকে অন্তিম আবেদন, হর হর মহাদেও...

রক্তাক্ত ক্ষতে হাত দেওয়ার মত সন্ন্যাসী অনুভব করেন ভারতবর্ষের ইতিহাস...

তপ্ত স্পর্শের মত গায়ে এসে লাগে, অতীতের দীর্ঘশ্বাস।

জনতা থেকে দূরে, আবু পাহাড়ের এক গুহায় সন্ন্যাসী তপশ্চরণে বসেন।

একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর কতকগুলি বই।

খাদ্যের প্রয়োজন হলে, গুহা থেকে বেরিয়ে নীচে প্রান্তরে মুষ্টি ভিক্ষা করেন।

ক্বচিৎ কখনো গুহার সামনে দিয়ে পথচারী কোন পথিক চলে যায়, গুহার ভেতরে যে কোন মানুষ আছে, তার কোন লক্ষণই তারা দেখতে পায় না।

হঠাৎ একদিন এক মুসলমান উকিল সেই পথ দিয়ে যেতে দেখেন, গুহার ভেতর

থেকে বেরিয়ে আসছেন দিব্যমূর্তি এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর দিব্য-রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ভদ্রলোক। একান্ত বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করতে অগ্রসর হন।

কয়েক মুহূর্তের আলাপেই ভদ্রলোক বুঝতে পারেন, অনন্য-সাধারণ এই সন্ন্যাসী।

মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন।

ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

একদিন ধরে বসলেন, বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

সন্ন্যাসী বলেন, আমার তো কোন জাগতিক বস্তুর প্রয়োজন নেই এখন!

—তবু, আমার অন্তরের তৃপ্তির জন্যে...

সন্ন্যাসী বলেন, বেশ, আমার এই গুহার মুখ একেবারে খোলা...এখানে কোন রকম একটা দরজা যদি করে দেন।

আশ্বস্ত হয়ে ভদ্রলোক প্রস্তাব করেন, আমি কাছেই এক বাংলোতে একা বাস করি...চমৎকার নির্জন জায়গা...আমার মিনতি আপনাকে রাখতেই হবে...আমার সেই বাংলোতে এসে যদি বাস করেন!

সন্ন্যাসী হাসেন।

ভদ্রলোক কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমি মুসলমান, কিন্তু আমি শপথ করছি, আমি আপনার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা বন্দোবস্ত করবো...

সন্ন্যাসী বলেন, তার কোনই প্রয়োজনই নাই...আমি যাব আপনার বাংলোয়।

ক্ষেত্রী মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুনশী জগমোহন লালের সঙ্গে ভদ্রলোকের যথেষ্ট খাতির ছিল।

একদিন তিনি মুনশীজীকে ডেকে নিয়ে এলেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে।

মুসলমানের বাড়িতে হিন্দু সন্ন্যাসী...মুনশীজী মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই সাধুবেশী কোন ধাপ্পাবাজ।

তাই প্রথম আলাপেই মুনশীজী প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা আপনি তো হিন্দু সন্ন্যাসী...এভাবে মুসলমানের সঙ্গে থাকতে আপনার খাওয়া-দাওয়া ছোঁয়া পড়তে তো পারে?

নিমেষের মধ্যে সন্ন্যাসীর মুখের চেহারা বদলে যায়।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, কি বলছেন আপনি? আমি সন্ন্যাসী...আপনাদের জাত-অজাতের বালাই আমাকে স্পর্শও করে না...প্রয়োজন হলে আমি মেথরের হাতেও খেতে পারি। তার জন্যে ভগবান আমার ওপর বিরূপ হবেন না...কারণ, সেইটেই হলো তাঁর নির্দেশ...এবং তার জন্যে শাস্ত্রের অনুশাসনকেও আমি ভয় করি না, কারণ, তাই হলো শাস্ত্রের বিধান...তবে, হ্যাঁ, আমি ভয় করি বটে আপনাদের মত লোককে...এবং আপনাদের নিয়ে যে-সমাজ, সেই সমাজকে!...ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে

সন্ন্যাসী বলেন, তৃণ থেকে কীটপতঙ্গ...সব প্রাণীরই মধ্যে আমি দেখেছি তাঁকে... শিব...শিব...শিব...

নিশ্চল স্থির দেহ...দৃষ্টি চলে গিয়েছে বহুদূর। দেহের রেখায় বন্ধ যেন আলোর স্তূপ। মুনশী জগমোহন শান্তভাবে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে পড়েন।

ক্ষেত্রীর মহারাজা তখন সেই শহরেই অবস্থান করছিলেন।

মুনশী ঠিক করলেন, এই মহাপুরুষের সঙ্গে মহারাজের দেখা করাতেই হবে!

মুনশীজীর মুখে অপরূপদর্শন সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথা শুনে মহারাজা নিজেই বলে উঠলেন, তুমি বন্দোবস্ত কর, আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো!

মুনশীজীর মুখে মহারাজার আগ্রহের কথা শুনে, সৌজন্যবশতঃ সন্ন্যাসী নিজেই চললেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

প্রথম আলাপেই মহারাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে মহারাজা প্রশ্ন করেন, সন্ন্যাসী উত্তর দেন। তীরের মত সে সব উত্তর মহারাজার অন্তর বিদ্ধ করে।

প্রতিদিন সন্ন্যাসী আসেন যান, মহারাজা তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শোনেন। শোনেন, গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এক নতুন মানুষের কথা...জগতের সব বিভেদের মধ্যে যিনি খুঁজে পেয়েছেন মিলনের পথ...যিনি প্রত্যক্ষভাবে একটি জীবনের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন বহু জীবন...বহু ধর্ম...বহু মত...এবং সব পরীক্ষার শেষে যিনি উপলব্ধি করেছেন এক মহাসত্য...সব পথ গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে...সব নদী এসে মিশেছে যে এক মহাপারাবারে...

তাঁরই সেই অভেদ-মন্ত্রের বাহক হয়ে, সন্ন্যাসী বলেন, আমি বেরিয়েছি ভারতের তীর্থ-পথে...ভেদ-বিক্ষুব্ধ জগতে পোঁছে দিতে তাঁর বাণী...সফল করে তুলতে তাঁর আবির্ভাবকে...

ঐশ্বর্যের অন্তরে কেঁদে ওঠে অন্তরের রিক্ততা।

মহারাজা হাত জোড় করে বলেন, দয়া করে আমাকে নিন আপনার সঙ্গে। যতটুকু পারি, যা পারি, আপনার ব্রতে সহায়তা করতে...

নতজানু হয়ে মহারাজা সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করেন।

বিস্মৃত ভারতের একটা টুকরো।

মহারাজার আন্তরিক আকুলতা সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসেন তাঁর রাজ্যে।

সন্ন্যাসীর কাছে অনুষ্ঠানমত দীক্ষা গ্রহণ করেন মহারাজা।

পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ সকলের সামনে ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে গুরুর চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন।

নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন গুরুর উপদেশ!

রাজার অনুসরণে দলে দলে আসে প্রজা। মুগ্ধ বিস্ময়ে তারা শোনে, দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলের কথা। তাদের সকলের দৃষ্টি নতুন করে পড়ে বাঙলার ওপর। শুরু হয় ভারত-চিত্তে বাঙলার নিঃশব্দ বিজয়-অভিযান।

সন্ন্যাসী নিদ্রা যান...মহারাজা নিঃশব্দে পদসেবা করেন।

সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবেন, হে গুরু, তুমি দিয়েছ যে ভার, তুমি দেবে তা বহন করবার শক্তি! যে-পথে তুমি এনেছ আহবান করে, সে-পথের শেষে তুমিই নিয়ে যাবে একদিন। জানি, এ তোমারই আয়োজন।

রাজপ্রাসাদেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলো, পণ্ডিত নারায়ণদাসের, রাজপুতানার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক।

গ্রহণ-উন্মুখ তরুণ সন্ন্যাসীর মন বলে উঠলো, এই তো সুযোগ! পাতঞ্জলীর মহাভাষ্য তখনো আয়ত্ত করা হয়নি। অসম্পূর্ণ বিদ্যা। অসম্পূর্ণতাই তো দৈন্য!

সেই দৈন্য দূর করবার জন্যে প্রচণ্ড জ্ঞান-পিপাসী পণ্ডিতজীর শরণাপন্ন হলেন।

পণ্ডিতজী স্বীকৃত হলেন।

প্রথম দিনের অধ্যাপনার পরই পণ্ডিতজী বুঝলেন, এমন শিষ্য তিনি তাঁর দীর্ঘ-জীবনে আর দেখেন নি।

কয়েকদিনের পাঠের পর পণ্ডিতজী একদিন পরীক্ষার জন্য শিষ্যকে প্রশ্ন করলেন। শিষ্য সমগ্র ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী সমেত মুখস্থ বলে গেলেন এবং সেই সঙ্গে নিজেরও ভাষ্য নতুনভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

পণ্ডিত নারায়ণদাস স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তার কয়েকদিন পরে, এমন অবস্থা হলো, পণ্ডিতজীই সন্দেহবশতঃ প্রশ্ন করেন।

শিষ্য তার উত্তর দেয়।

অবশেষে পণ্ডিতজী বলেন, স্বামীজী, আপনাকে শিক্ষা দেবার মত আমার আর কিছু নেই!

আবার ডাক দেয় পথ। নির্জনতার মহা আহবান!

মহারাজা বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন।

কিন্তু নিরুপায়।

—নিষ্ঠুর ভবিতব্যতা করেছে আমাকে চির চঞ্চল। আমার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে পথকে। পৌঁছতে হবে সে-পথের শেষে। তার আগে নেই বিশ্রাম। আমি চলেছি সেই পরম দুর্জ্ঞেয়ের আহবানে। চলেছি, এইমাত্র সত্য। আর কিছু জানবার পাই নি অধিকার।

বিদায়ের দিন আসন্ন হয়ে আসে।

গুরুকে নিভৃতে রাজ-শিষ্য অন্তরের বেদনার কথা জানান।

আমি অপুত্রক। একটি পুত্রের অভাবে সমস্ত অন্তর ম্লান হয়ে আছে। আমি জানি, যদি আপনি আশীর্বাদ করেন, আমার বাসনা সফল হবেই।

শিষ্যের কাতরতায় বিদায়-মুখে সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করেন, সফল হোক তোমার অন্তরের বাসনা।

রাজপুতানা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী প্রবেশ করেন বম্বে প্রদেশে। আহ্মেদাবাদ... পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদ মন্দির, মসজিদ...ভারত-ইতিহাসের ক্ষতচিহ্নের মত পড়ে আছে চারদিকে...সন্ন্যাসী একে একে তাদের সকলকে স্পর্শ করে চলেন...

সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হন লিম্বিডিতে।

পথে পথেই দিন চলে যায়। মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে, শয়ন...যেখানে এসে পড়ে রাত্রি।

অবশেষে একদিন খবর পেলেন, শহর থেকে একটু দূরে এক নির্জন অংশে এক মঠে সাধুরা বাস করেন।

সেই সংবাদে সন্ন্যাসী আনন্দিত হয়ে সাধুদের অন্বেষণে সেই মঠে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে মঠবাসী সাধুরা পরম-আদর করে গ্রহণ করলেন। তাঁর অসামান্য রূপ-জ্যোতি দেখে সাধুরা বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং প্রত্যেকে নানাভাবে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন।

পথে পথে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ—মঠবাসীদের স্নেহ স্বভাবতঃই সন্ন্যাসীর অন্তর স্পর্শ করলো।

কিন্তু দু' একদিন যেতে না যেতেই, সহসা একদিন তিনি শুনতে পেলেন, পাশের ঘরে পুরুষ কণ্ঠের সঙ্গে তরুণী নারীর কণ্ঠ।

উৎকর্ণ হয়ে যা শুনতে পেলেন, তাতে তাঁর সর্বদেহ আশঙ্কায় ও ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলেন, তিনি যেখানে এসে পড়েছেন সেটি মোটেই মঠ নয় ...একজাতীয় উৎকট যৌন-উপাসকের আড্ডা। ধর্মের আবরণের আড়ালে তারা নানা-বিধ উৎকট যৌন-আচারের নিয়মিত অনুষ্ঠান করে।

আজন্ম ব্রহ্মচর্যব্রতধারী সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্যে দরজার কাছে এসে দেখেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। এবং বাইরে বন্ধ দরজার সামনে, পাছে তিনি কোন রকমে পালিয়ে যান, তার জন্যে একজন প্রহরী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বুঝলেন, তিনি বন্দী। কিন্তু রাগ দেখালে পালাবার কোন আশাই আর থাকবে না। তাই তিনি বাইরে কোন চাঞ্চল্য দেখালেন না।

দরজা খুলে দিতে বলায়, প্রহরী মঠাধ্যক্ষকে ডেকে দিল।

মঠাধ্যক্ষ এসে সন্ন্যাসীকে জানালো, তোমাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তোমাকে দেখেই আমরা বুঝেছি তুমি আজন্ম ব্রহ্মচারী। তোমার বীর্যের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা। আমরা একটা যৌন-অনুষ্ঠান করবো যাতে তোমার বীর্যের প্রয়োজন হবে। ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করে তোমার সযত্নসঞ্চিত সেই বীর্য আমাদের নির্দেশমত ত্যাগ করতে হবে।

সন্ন্যাসী কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে হেসে উঠলেন। মঠবাসীরা বিশেষ কিছু সন্দেহ না করলেও তাঁকে নজরবন্দী করে রেখে দিল।

সন্ন্যাসী মহাপ্রমাদ গুণলেন, হে গুরু, আজন্ম সাধনার ধন, এমনিভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে? লিম্বিডির পথে পথে যখন ঘুরে বেড়ান, তখন সেখানকার একটি অনাথ বালক সন্ন্যাসীর অনুরক্ত হয়ে পড়ে। সন্ন্যাসী যে মঠে গিয়ে উঠেছেন, বালক তা জানতো। ভাগ্যক্রমে পরের দিন সেই বালক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে এলো।

সেই বালককে মনে হলো দেবদূত।

সন্ন্যাসী গোপনে একখানি পত্র লিখে বালকের কাছে লুকিয়ে দিয়ে দিলেন। পত্রখানি তিনি লিম্বিডির ঠাকুরসাহেবকে লিখলেন। তাঁর অবস্থার কথা জানিয়ে তিনি অনুরোধ করলেন যেন তিনি অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে সেই পাপপুরী থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

বালক সেই পত্র নিয়ে ছুটলো।

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুরসাহেব কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী পাঠিয়ে দিলেন।

মঠবাসী সাধুরা মৌন বেদনায় দেখলো, তাদের মুখের গ্রাস মুখ থেকে পড়ে গেল।

কিছুদিন লিম্বিডির ঠাকুরসাহেবের আতিথ্যে থেকে সন্ন্যাসী আবার চলতে শুরু করলেন।

ভাবনগর...সিরোহী...জুনাগড়...

আজ প্রাসাদে...কাল পথে...দরিদ্রের পর্ণকুটীরে...

প্রাসাদে থাকতে দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন।

সন্ন্যাসী বলেন, রাজাদের কাছে যাই তাঁদের ঐশ্বর্যের জন্যে নয়। সহস্র লোকের ভার তাঁদের ওপর। তাঁরা যদি সেই সহস্রের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হন, তাহলে ভারতবর্ষের সমস্যা সহজ হয়ে আসে। তাই বিমুখ ঐশ্বর্যকে জনমুখীন করতে চাই...

সেখান থেকে ভূজ...ভূজ থেকে আবার জুনাগড়...জুনাগড় থেকে ভেরাওয়াল... প্রভাস...

যেখানে যান সেখানেই প্রচার করেন পরমহংসদেবের বাণী...বাঙলার নববার্তা...

ভারতের দূর-দূরান্ত নগর-গ্রামের সঙ্গে হয়ে যায় বাঙলার আত্মিক মিলন...

বাঙলা যখন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছে, তখন বাঙলার বীর সন্ন্যাসী নিজের কাঁধে বয়ে চলেছেন একা বাঙলার ঐতিহ্যকে...

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সঙ্গে বাঙলার অন্তর-লক্ষ্মীও সেদিন সেই প্রথম বেরিয়েছিলেন ভারতের চিত্ত-জয়ে...

চলার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে মনের চাঞ্চল্য। কী অগ্নিজ্বালা জেবলে দিয়েছে গুরু অন্তরে। কোন্ মহাকর্তব্য তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেবেন তিনি? কতটুকুই বা তাঁর ক্ষমতা?

অস্পষ্ট নীহারিকার মত মনের ছায়াপথে ঘুরে বেড়ায় দুরন্ত বাসনা। পর্বতের

শিলাগাত্রে শুধু রুদ্ধ আবেগের আক্রোশের আঘাত করে বন্দী নির্ঝরিণী। পাষাণ ভেদ করে কবে পাবে সে মুক্তি?

আসমুদ্র হিমাচল এই ভারতবর্ষ...তাঁর প্রতি তৃণ, প্রতি ধূলিকণা তীব্রভাবে আকর্ষণ করে সন্ন্যাসীকে।

প্রভাসের ভগ্ন-মন্দিরের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে শোনেন, মন্দির-সংলগ্ন তিনশত গায়ক আবার যেন একসঙ্গে গাইছে সামগান...

সোমনাথের ভগ্নমন্দিরে দাঁড়িয়ে দেখেন, পুণ্যবতী রানী অহল্যাবাঈ নিজে দাঁড়িয়ে নতুন করে তৈরি করছেন আবার সেই মন্দির...

সূর্যমন্দিরে দাঁড়িয়ে উষার আলোকে নতমস্তকে গ্রহণ করেন সূর্যের আশীর্বাদ,—

ত্রি-ধারা-সংগম পুণ্য সলিলে নগ্নদেহে পড়েন ঝাঁপিয়ে...

সেখান থেকে পোরবন্দর...

সেখানকার দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহাসমাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন।

শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ তখন বেদের অনুবাদ করছিলেন। স্বামীজীকে পেয়ে তিনি মহা আনন্দিত হলেন।

বেদের কঠিন কঠিন অংশ স্বামীজী অনায়াসে ব্যাখ্যা করে দেন।

বিমুগ্ধ পাণ্ডুরঙ্গ অনুরোধ করেন, যতদিন না এই অনুবাদ কার্য শেষ হয়, ততদিন তাঁকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে।

এগারো মাস বেদের সেই অনুবাদ-কার্যে স্বামীজী তাঁকে সাহায্য করলেন।

সেই সময় একদিন পণ্ডিতজী প্রস্তাব করেন, আপনার মত বিদ্বান লোকের ফারসী ভাষা জানা দরকার।

স্বামীজী নিষ্ঠাসহকারে ফারসী পড়তে শুরু করলেন।

বিদায়ের সময় পাণ্ডুরঙ্গ বলেন, স্বামীজী, আমার কি মনে হয় জানেন? আপনার মত প্রতিভার আজ উচিত ইওরোপে যাওয়া...ভারতের সত্যিকারের পরিচয় ইওরোপকে দেওয়া...

কথাটা সন্ন্যাসীর বুকে গিয়ে লাগে।

ঠিক এমনি একটা অস্পষ্ট বাসনা তাঁর মনে তখন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছিল...

বিশ্বচেতনায় ভারতবর্ষের আজ কোন স্থান নেই...চলমান মানব-সভ্যতার মহা-যজ্ঞে শূদ্রের মত সে পরিত্যক্ত অনাদৃত...

সে লাঞ্ছনা থেকে কে বাঁচাবে তাকে?

পোরবন্দর ত্যাগ করে পরিব্রাজক মাণ্ডবীতে প্রবেশ করলেন।

অকস্মাৎ সেখানে গুরুভাই অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা।

পরিব্রাজক ক্ষুব্ধ হন, বলেন, আমি না বলেছিলাম, আমাকে অনুসরণ করো না।

তীর্থের পথে ক্ষণিকের দেখা...আবার তৎক্ষণাৎ ছাড়াছাড়ি...

জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গের মত রামকৃষ্ণের স্পর্শ তাঁর সেই গুটিকতক মন্ত্র-শিষ্যের রূপ ধরে তখন সারা ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাণ্ডবী থেকে নারায়ণ-সরোবর...আকাশপুরী...

সেখান থেকে পালিতানা...শত্রুঞ্জয় পর্বতের শিখরে উঠে দেখেন মাটি থেকে বহুদূরে, মেঘের রাজ্যে একই শিলাখণ্ডে, একদিকে হনুমানজীর মন্দির...অপরদিকে মুসলমান দরবেশ হেঙ্গারের মসজিদ...

সেখান থেকে পরিব্রাজক প্রবেশ করলেন বরোদারাজ্যে।

বরোদা থেকে খাণ্ডোয়া...

সেখানে এক বাঙালী উকিল, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, তাঁর বাড়িতে কয়েকদিন বাস...

একদিন হরিদাসবাবু কথাপ্রসঙ্গে বললেন, খবরের কাগজে দেখেছি, আমেরিকার চিকাগো শহরে নিখিল বিশ্ব ধর্মসম্মেলন হচ্ছে...

এর আগেও পোরবন্দরে একবার তিনি শুনেছিলেন, এই বিশ্ব সম্মেলনের কথা...

কিন্তু কোথায় খাণ্ডোয়া আর কোথায় চিকাগো! সন্ন্যাসী বলেন, কেউ যদি আমার ভাড়া দেয়, আমি যেতে পারি!

কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্তলে সন্ন্যাসী জানতেন, তিনি কোথাও যাচ্ছেন না...কিছুই করছেন না...যতক্ষণ না অন্তর থেকে তিনি পান প্রত্যাদেশ...

এই পরিব্রাজক অবস্থায় প্রত্যেকটি পরিচয় তাঁর মনে বৃহৎ সম্ভাবনার আশা জেবলে দিয়েছে...যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই শুনেছেন, অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা ...বিরাট কর্মের ইঙ্গিত...কিন্তু লোকে যত প্রশংসা করেছে, সন্ন্যাসী অন্তরে ততই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। যতদূরেই তিনি আসুন না কেন, তাঁর মন চেয়ে আছে, সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর দিকে...বাইরের সব কোলাহলের ঊর্ধ্বে সর্ব-ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে আছে, অলোক-অস্তিত্ব গুরুর দিকে...

—তুমিই আমার হাতে তুলে দিয়েছ এই পরিব্রাজকের দণ্ড...আমি চলেছি তোমারই পথে। যদি তোমার আমার মিলন সত্য হয়...তা হলে তুমিই দেবে পথের ইঙ্গিত। তুমিই জাগিয়েছ অন্তরে কর্মের সুবিপুল বাসনা...নিজের মুক্তির কামনা পর্যন্ত তুমি নিয়েছ কেড়ে...তাই আমি জেগে আছি, তোমারই প্রত্যাদেশের জন্যে... জানি একদিন পাবো সে আহবান...তোমার আহবান...

তাই শতদিক থেকে শত আহবান এলেও, সন্ন্যাসী অন্তরের সব চাঞ্চল্য অন্তরেই সমাহিত করে এগিয়ে চলেন। তিনি বিশ্বাস করেন, একদিন আসবেই সে মহালগ্ন ...শুধু নিজেকে প্রস্তুত করে চলেন, সে মহালগ্নের জন্য।

খাণ্ডোয়া থেকে বম্বে...বম্বে থেকে পুনা। পুনায় কয়েকদিন রইলেন বালগঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে...তাঁর অতিথি হয়ে...

—সেখান থেকে মহাবালেশ্বর।

লিম্বিডির ঠাকুর সাহেব তখন সেখানেই ছিলেন।

আবার স্বামীজীর দর্শন পেয়ে তিনি ধরে বসলেন, চলুন, কিছুদিন আমার ওখানে বিশ্রাম করবেন।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন, কোন কাজই করলাম না, বিশ্রাম কিসের? যদি বিশ্রামের অবসর আসে, আপনার নিমন্ত্রণ মনে রইলো।

সেখান থেকে কোহলাপুরের মহারাজার অতিথিরূপে কয়েকদিন...মহারানী কিছু নেবার জন্যে সন্ন্যাসীকে কাতরভাবে অনুরোধ করেন।

অগত্যা সন্ন্যাসী চান, একখানি গেরুয়া কাপড়।

বেলগম থেকে মারজুগাও...পোর্তুগীজ ভারতের একটি ছোট্ট বন্দর...

সেখান থেকে মহীশূর রাজ্যে, বাঙ্গালোর...

মন্দিরে...পথে...অরণ্যে...একা একা কয়েকদিন ঘুরে বেড়ান...কিন্তু সেই অপরূপ তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে...অবশেষে একদিন দেওয়ান বাহাদুর স্যার শেষাদ্রি আয়ারের কানে এই অপরূপ সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের কথা গিয়ে পৌঁছয়।

তিনি উপযাচক হয়ে স্বামীজীর সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের আলাপ করেই বুঝলেন, অনন্যসাধারণ এই তরুণ সন্ন্যাসী।

বহু আমন্ত্রণ করে তিনি স্বামীজীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে রাজসভা এবং শহরের প্রত্যেক গণ্যমান্য ব্যক্তি চুম্বক-আকৃষ্টের মত স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হলেন।

প্রভাতে, অপরাহ্ণে রীতিমত সভা বসে।

সভায় কত না বিষয়ের আলোচনা হয়। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সবাই শোনেন, প্রত্যেক বিষয়ে সেই তরুণ সন্ন্যাসী অভিজ্ঞ পণ্ডিতের মত আলোচনা করেন।

একদিন একজন অস্ট্রিয়ান সংগীতজ্ঞ কৌতূহলবশতঃ যোগদান করেন।

স্বামীজী সমানে তাঁর সঙ্গে ইওরোপের সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

আর একদিন একজন ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনীয়ার বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা তুললেন। স্বামীজী বিদ্যুৎ-তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিকতম আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকের মতই আলোচনা করলেন।

স্যার শেষাদ্রি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

কিন্তু সব কথার মধ্যে স্বামীজী তাঁদের কাছে তুলে ধরেন রামকৃষ্ণের কথা...

অপরূপ শ্রদ্ধায় তাঁরা শোনেন, বাঙলার এই মহাপুরুষের কথা...নতুন ধর্মের কথা...বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যা...

সেই সঙ্গে স্বামীজী নিজের জীবনের আদর্শের কথা উত্থাপন করেন...ভারতের নব-অভ্যুত্থান...

সে-অভ্যুত্থানে ধর্মকে রক্ষা করতে আজ তাদের বহুদিন-উপেক্ষিত দায়িত্ব পালন করতে হবে...

আচার আর অনুষ্ঠানের প্রাণহীন আয়োজনের জঞ্জাল থেকে...পৌরোহিত্য আর ধর্ম-ব্যবসায়ের মারাত্মক নিষ্ক্রিয়তা থেকে ধর্মকে আজ সুবিপুল কর্মের মধ্য দিয়ে গণ-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে...নপুংসকের দেশে মানুষ তৈরি করতে হবে...

বাঙলার সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বেজে ওঠে ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর আগমনী।

বিন্ধ্য পাহাড়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করে, নতুন করে শুরু হয়, বাঙলার সঙ্গে ভারতের মিতালি।

অখণ্ড ভারতের হারিয়ে-যাওয়া যোগসূত্র মূর্ত হয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর জীবনে।

স্যার শেষাদ্রি স্থির করলেন মহারাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ করিয়ে দেবেন।

আলাপে মহারাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

স্যার শেষাদ্রির কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসীর সেবার ভার কেড়ে নিলেন।

স্বামীজী হলেন মহীশূরের রাজার অতিথি।

দেখতে দেখতে অতিথি হলো মিত্র, পরামর্শদাতা...গুরু...

একদিন রাজসভায় মহারাজা সভাসদ্‌দের নিয়ে বসে গল্প করছেন, স্বামীজীও আছেন। হঠাৎ মহারাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা স্বামীজী, আমার সভাসদ্‌দের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

নির্ভীক সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, আমি জানি আপনার অন্তঃকরণ মহৎ, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার চারদিকে যাঁরা আছেন, অর্থাৎ আপনার সভাসদ্‌রা, চিরকাল রাজা-মহারাজাদের সভাসদ্‌ যা হয়ে থাকেন, এঁরাও তাই!

সমস্ত সভা এক মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

মহারাজা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, না, না, স্বামীজী, আপনি ভুল করছেন। অন্ততঃ আমার দেওয়ান সে রকমের লোক নন...। তিনি রীতিমত বুদ্ধিমান এবং একান্ত বিশ্বাসযোগ্য!

স্বামীজী তেমনিভাবেই উত্তর দিলেন, কিন্তু, মহারাজ, আজকের ভারতবর্ষে দেওয়ান কথাটার মানে বদলে গিয়েছে। মহারাজার ওপর ডাকাতি করে, যিনি পলিটিক্যাল এজেন্টের পেট ভরান তিনিই দেওয়ান।

মহারাজা মহাবিপদে পড়লেন। এমন স্পষ্টবাদী লোককে নিয়ে কি রাজসভায় বসা চলে?

তাড়াতাড়ি সে-কথা চাপা দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

সেদিন সভার শেষে নিভৃতে স্বামীজীকে ডেকে মহারাজা বলেন, স্বামীজী, এতখানি স্পষ্টবাদিতা জীবনযাত্রার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। আমার সভাসদ্‌দের সামনে আপনি যদি এইরকম স্পষ্ট কথা বলতে থাকেন, তাহলে ওদের মধ্যে কেউ হয়ত আপনাকে বিষ খাইয়ে মেরেও ফেলতে পারে!

সন্ন্যাসীর চোখ জ্বলে ওঠে...কণ্ঠস্বর তীব্র ও স্পষ্ট...বলেন, মহারাজ, আপনি কি ভাবেন মৃত্যুর ভয়ে সন্ন্যাসী মিথ্যা কথা বলবে, না চাটুবাদ করবে? ধরুন, আপনার পুত্র যদি আমাকে কাল জিজ্ঞাসা করে, আমার বাবার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

আপনি কি ভাবেন, তার উত্তরে, যে সব গুণ আমি জানি আপনার নেই, বলবো যে সে-সব গুণে আপনি মহিমান্বিত?

মহারাজা বুঝলেন, এখানে আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যাপার কিছু নেই! এ সোনায় এতটুকু খাদ চলে না।

হীরক-খচিত মুকুটের আভা সন্ন্যাসীর নগ্ন পদে এসে পড়ে।

কিন্তু সে হীরকের জ্যোতিতে সন্ন্যাসী দেখেন, রিক্ত, নিঃস্ব, ক্ষুধিত ভারতবর্ষ! কঙ্কালের শুষ্ক অস্থি!

মুকুট বলে, আদেশ করুন সন্ন্যাসী, কি করতে পারি আপনার জন্যে?

দণ্ডকমণ্ডলু বলে, আমি তো কিছু চাই না...চায় তোমার দেশ...তোমার প্রজা। দাও তাদের। পশ্চিম থেকে আনো বিজ্ঞান, আনো বীর্য...পূর্ব থেকে তাদের দাও জ্ঞান...ধর্ম...তত্ত্ব...আনন্দ...জীবনের চরম লক্ষ্য।

প্রাসাদ পথ আগলে দাঁড়ায়...আরো কিছুকাল...হে সন্ন্যাসী, রাজার বড় প্রয়োজন তোমার পুণ্য স্পর্শের!

সন্ন্যাসী বলেন, আমি যাত্রী...দু'দণ্ড বিশ্রাম করতে পারি মাত্র—থামবার অধিকার আমার নেই!

মহারাজা যখন বুঝলেন, সন্ন্যাসীকে আর ধরে রাখা যাবে না, আসন্ন বিচ্ছেদে তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

সাধ গেল, সেই তরুণ সন্ন্যাসীর পদ-বন্দনা করতে।

সন্ন্যাসী বাধা দেন।

—তবে বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

সন্ন্যাসী বলেন, আমি যে আদর্শ বহন করে চলেছি...তুমি হও তার সহায়...আজ, তোমার আমার সকলের সামনে একটিমাত্র দেবতা আছে, ভারতবর্ষ তার নাম... একটিমাত্র ধর্ম আছে, সে ধর্ম হলো...ভারতবর্ষকে আবার মহীয়ান করে তোলা। এই দুর্বল, অশিক্ষিত, উপবাসক্লিষ্ট কোটি কোটি মানুষ...যারা আজ ভেঙ্গে নুয়ে পড়েছে...তাদের আবার সোজা হয়ে দাঁড় করাতে হবে। জগৎকে জানাতে হবে, ভারতবর্ষ মরে নি...মরতে পারে না...ভারতবর্ষ যদি মরে যায় সভ্যতা মরে যাবে। সেই অবিনশ্বর মৃত্যুঞ্জয় ভারতকে আবার জগতের সামনে তুলে ধরতে হবে। তার জন্যে আমি যাবো ইওরোপে...যাবো আমেরিকায়...কিন্তু আমি সন্ন্যাসী...রিক্ত...

মহারাজা বলে ওঠেন, তার জন্যে যা খরচ লাগে, আমি দিচ্ছি...আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

সহসা সন্ন্যাসী নীরব হয়ে যান। মনে মনে যেন কি চিন্তা করেন।

বলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ মহারাজ! কিন্তু আপনার সাহায্য এখন আমি নিতে পারবো না! আমার ব্রত এখনো শেষ হয় নি!

মহারাজা ক্ষুব্ধ হন কিন্তু আর বেশী জোর করতে পারেন না। সন্ন্যাসীকে তিনি চিনেছেন।

তবুও তিনি বলেন, কিন্তু আপনার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আমাকে একটা কিছু দিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কি দিতে পারে সন্ন্যাসী?

হঠাৎ মহারাজের মনে একটা মতলব আসে। নতুন ফনোগ্রাফ যন্ত্র এসেছে। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর তিনি রেকর্ড করে রাখবেন!

স্বামীজী রাজী হন।

আজও পর্যন্ত মহীশূর রাজপ্রাসাদে স্বামীজীর কণ্ঠের সেই রেকর্ড পুণ্যস্মৃতি স্বরূপ সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

গাড়িতে ওঠবার সময় হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী একতাড়া একশো টাকার নোট সন্ন্যাসীর আলখাল্লার পকেটে ঢুকিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী হেসে সেগুলো বার করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দেন।

—একান্ত যদি দিতেই চান তাহলে ত্রিচুড়ের একখানা রেলের টিকিট আমাকে কিনে দিন!

ত্রিচুড় থেকে মালাবার হয়ে ত্রিভেন্‌দ্রাম...ত্রিভাঙ্কুরের যুবরাজের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার বাড়ির ভেতর বসে আছেন, এমন সময় তাঁর ছোট ছেলে এসে খবর দিল, বাইরে একজন মুসলমান ফকির এসেছেন!

অধ্যাপক বাইরে এসে দেখেন, আলখাল্লাধারী একজন তরুণ...আর তাঁর সঙ্গে একটি মুসলমান যুবক।

আলখাল্লাধারীকেও অধ্যাপক প্রথম দর্শনে মুসলমান বলেই মনে করেছিলেন কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন, তিনি হিন্দু। তবে তাঁর সঙ্গীটি মুসলমান, কোচিন স্টেটের একজন সামান্য পিয়ন।

সন্ন্যাসী বলেন, আজ তিন দিন ধরে এই যুবক আমার সঙ্গে আছে...আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে...তিন দিন পথে খাদ্য বিশেষ কিছুই জোটে নি!

অধ্যাপক সমাদরে সন্ন্যাসীকে আহারে আহ্বান করেন।

সন্ন্যাসী বলেন, আমার সঙ্গীর খাওয়া হলে, তবে আমি খাবো!

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করেন!

সেইদিন রাত্রিতে অধ্যাপক বুঝলেন, তাঁর দ্বারে অতিথি হয়ে যিনি এসেছেন, তিনি নিশ্চয়ই বিধাতার চিহ্নিত কোন মহাপুরুষ।

দেখতে দেখতে ত্রিভেন্‌দ্রামের সমস্ত গণ্যমান্য পণ্ডিত লোক সন্ন্যাসীকে ঘিরে বসে।

শুরু হয়, দক্ষিণ-ভারত-বিজয়-পর্ব।

ত্রিভাঙ্কুরের মহারাজা থেকে আরম্ভ করে দীনতম প্রজা পর্যন্ত...সকলের মুখে সেই অপূর্ব সন্ন্যাসীর কথা।

সকলের মুখে সেই এক অনুরোধ, এত শীঘ্র আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

কিন্তু ছেড়ে দিতেই হয়।

সন্ন্যাসী বলেন, আমি পরিব্রাজকের ব্রত নিয়েছি...সে ব্রত আমাকে উদ্‌যাপন করতেই হবে...ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে দাঁড়িয়ে সে ব্রত আমি উদ্‌যাপন করবো।

এবার সন্ন্যাসী চলেন, শেষ লক্ষ্য রামেশ্বরমের উদ্দেশ্যে।

পথে মাদুরায় কয়েকদিন অবস্থান।

সেখানে রামনদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে আলাপ।

ভাস্কর সেতুপতি তাঁর শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসী নবীন শিষ্যকে তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্যের কথা বলেন।

তাঁর এই পরিব্রাজক ব্রতের উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষকে দেখা, ভারতবর্ষকে জানা। তাঁর ইষ্ট, আরাধ্য এই মৃন্ময়ী ভূমি।

ভাস্কর সেতুপতি বলেন, তাঁর সংকল্পসাধনে সাহায্য করতে পারলে তিনি ধন্য হবেন।

সন্ন্যাসী বলেন, সে সাহায্য চাইবার সময় এখনো আসে নি...

মাদুরা ছেড়ে সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেন, ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের দিকে।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা...

পায়ে পায়ে সন্ন্যাসী অনুভব করে এসেছেন, এই বিরাট মহাদেশের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ...

শিরায় উপশিরায় প্রবহমান রক্তধারার মত, এই বিরাট দেশের দেহের শিরায় উপশিরায় মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর চেতনাকে...

জনহীন হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শিখরে, ঘন-অরণ্যে পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে মৃত্যু-রূপী মহাশার্দূল...ক্ষুধিত...

মরুভূমির মধ্যে দিনের পর দিন পথভ্রান্ত ঘুরে মরেছেন...তৃষ্ণায় মুমূর্ষু অবস্থায় সামনে দেখেছেন স্বচ্ছসলিল সরোবর...ছুটে জলপান করতে গিয়ে দেখেন, কোথায় জলাশয়...রৌপ্যশুভ্র সূর্যকরে ঝিকমিক করছে তপ্তবালুকণা...মরীচিকা-বিভ্রান্ত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে গিয়েছেন বালুস্তূপে...জ্ঞান ফিরে আসতে দেখেন, অজস্রধারায় জল ঝরে পড়ছে...সর্বদেহ সিক্ত জলে...কাপড় নিঙড়ে জলপান করে তৃষ্ণা দূর করেছেন...

"বহুবার বহুরূপে মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করেছে...অনাহারে...পথশ্রান্তিতে বহুবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছি। দিনের পর দিন দাঁতে একটি তৃণও কাটতে পারি নি...চলৎশক্তিহীন হয়ে পথের ধারেই শুয়ে পড়েছি। মনে হয়েছে, দেহ থেকে শেষ প্রাণ-স্পন্দন থেমে আসছে...কথা বলবার ক্ষমতা নেই...ভাববার শক্তি পর্যন্ত শেষ হয়ে এসেছে।

সহসা দেহ-মৃত্যু-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মন সজাগ হয়ে উঠেছে...স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি তখন, আমার তো মৃত্যু নেই...জন্ম নেই...ভয় নেই। তবে কিসের এ অবসাদ?

আমি ক্ষুধার অতীত...তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে...আমি অমর...আমিই সেই অনাদি অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির সাধ্য কি আমাকে পরাভূত করে? আমারই সে ক্রীতদাসী... আমি তার প্রভু! জাগো হে অবিনশ্বর, হে দেবতার দেবতা...ওঠো...চল এগিয়ে...। আবার উঠেছি...আবার চলেছি...এখনো সেই আমি মাটিতে পা দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি।"

ভারত-মহাসাগরের তীরে কন্যাকুমারিকার মন্দিরে এসে পরিব্রাজকের পরিভ্রমণ শেষ হয়।

সাষ্টাঙ্গে মাটিতে মাথা লুটিয়ে সন্ন্যাসী মন্দিরবাসিনী জননীর কাছে আত্মনিবেদন করেন।

তারপর ধীরে সমুদ্রতীরে শেষ শিলাখণ্ডে এসে দাঁড়ান...

সামনেই তরঙ্গময় ভারত-মহাসাগর...

অন্তরে তাঁর তেমনি আর এক মহাসমুদ্র, তরঙ্গে তরঙ্গে আছড়ে পড়ছে...

শেষ শিলাখণ্ড থেকে সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়েন তরঙ্গে...

সামনেই ছোট্ট শিলাময় দ্বীপ...

সন্ন্যাসী জল থেকে উঠে তার ওপর দাঁড়িয়ে...সামনে ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখেন...

তাঁর মানস-নেত্রে ফুটে ওঠে, বাঙলা নয়, পঞ্জাব নয়, মহারাষ্ট্র নয়, উৎকল-দ্রাবিড় নয়...

একটি সম্পূর্ণ শতদলের মত ফুটে ওঠে, ভারতবর্ষ...অখণ্ড, অবিভক্ত...সম্পূর্ণ...

মাথার ওপরে ধূম্রহীন নীল আকাশ...পায়ের তলায় আরো নীল সমুদ্র... চারিদিকে সুনীল প্রশান্তি...

সন্ন্যাসী বসেন মাতৃরূপ ধ্যানে...

সে ধ্যানের মধ্যে সন্ন্যাসী দেখেন, মানুষের হাতে তৈরী প্রদেশে প্রদেশে সীমান্ত-রেখা কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছে...বাঙলা বিহারে মিশে গিয়েছে...বিহার মিশে গিয়েছে যুক্তপ্রদেশে...যুক্তপ্রদেশ মিশে গিয়েছে পঞ্জাবে...আর সেই মিলিত-ভূমির মধ্য দিয়ে মিলন-সূত্রের মত বয়ে চলেছে ধূর্জটি-জটিল-জটা-চ্যুতা ভারতের ভাব-গঙ্গা... ভারতের মহা ঐতিহ্য।

সে মানস-ভূগোলে ধূলিবিন্দুর মত এক কোণে পড়ে আছে বিন্ধ্যগিরি...উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মাঝখানের ভূগোলের বেড়া একটি একটি করে ভেঙে দিয়েছে মধ্যযুগের সাধকেরা।

সন্ন্যাসীর চোখের সামনে চলে যায়, একটির পর একটি শতাব্দী...জপের মালায় এক একটি মুক্তাবিন্দুর মত...আর্য অনার্য, শক, হূন, তুর্কী, মোগল, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ...সন্ন্যাসী দেখেন, ভারত-চেতনার সূত্রে তাঁরা সবাই বাঁধা পড়ে গিয়েছে, একটির পর একটি। তরঙ্গের পর তরঙ্গ...নিম্নে তেমনি স্থির রয়েছে নীল সমুদ্র...ভারত-চেতনার মহাসমুদ্র। সে অথই স্থির সমুদ্রে রক্ত-কমলের মত

ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর সমগ্র চেতনা...লুপ্ত হয়ে যায় সব সত্তা...ভারত-অস্তিত্বে। কেটে যায় সব সংশয়...দূর হয়ে যায় অনির্দিষ্টতার সব চাঞ্চল্য...স্পষ্ট দিবালোকের মত সন্ন্যাসীর সামনে ফুটে ওঠে, জীবনের কর্তব্য...যে মহাকর্তব্যের জন্যে তপস্যা-সঞ্চিত সমস্ত শক্তি গুরু নিঃশেষে করে গিয়েছেন তাঁকে দান।

ধ্যান-অন্তে সন্ন্যাসী ফিরে চান, সম্মুখে প্রসারিত মাতৃভূমির দিকে। চির ঐশ্বর্যময়ী তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ আজ ছিন্নকন্থা ভিখারিণীর মত নিজের দৈন্যের ভারে বিশ্বের অবজ্ঞার অন্তরালে কোন রকমে আত্মগোপন করে আছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, তিনি স্বচক্ষে দেখে এলেন, ভারতের পথে-প্রান্তরে ক্ষুধিত পথ-কুকুরের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষুধিত মানুষের দল। প্রত্যেক মানুষের বুকে মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কাঁদছে মানুষের ভগবান। গলিত শবদেহকে পুষ্প-চন্দনে ঢেকে দেবতার নামে ধর্ম তাকেই করছে উপাসনা। মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে দেবতার নৈবেদ্য সাজিয়ে, দেবতা ও মানুষ দুজনকেই সমান করছে অপমান। সমুদ্র-বেষ্টিত সেই অসীম নীরবতায় সন্ন্যাসীর সামনে ফুটে ওঠে, ক্ষুধিত ভারতবর্ষ, অস্পৃশ্য ভারতবর্ষ...অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে রিক্তসর্বস্ব দরিদ্র ভারতবর্ষ!

ভারতের শেষ-শিলাখণ্ডে দাঁড়িয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বৈরাগী চিত্ত ক্রন্দনে ফেটে পড়ে...বলে, হে আমার দরিদ্র ভারত, তুমিই আমার ইষ্ট দেবী...তোমার সেবাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম...ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তুমিই আমার সব।

উপরে নিঃসীম নীল আকাশ, নিম্নে নীলাম্বুধির তরল অতল বিস্তার...নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে পরিব্রাজক...যেন সমগ্র ভারত-চেতনার ঘনীভূত মূর্তি!

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পায়ে পায়ে এই মহাদেশকে অনুভব করে এসেছেন, তার মাটি, মানুষ, মন...

যেদিন রাত্রিতে সংগোপনে একা বরানগর মঠ পরিত্যাগ করে এই বিশাল দেশের ব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে দিলেন মিশিয়ে, সে রাত্রি থেকে আজ পর্যন্ত, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত তাঁর অন্তরের ভেতর থেকে কী এক নামহীন নিষ্ঠুর অশান্ত বেদনা তাঁকে হিংস্র ক্ষুধিত শার্দুলের মত পথ থেকে পথান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এক মুহূর্তের জন্যে তাঁকে স্থির হতে দেয় নি। সর্বদা সর্বক্ষণ যেন এক অনির্বাণ অগ্নি-জ্বালা পঞ্চতপা ব্রতের যজ্ঞাগ্নি-কুণ্ডের মত অন্তরকে দহন করে চলেছে। কী চায় সে অগ্নি-শিখা? কিসে হবে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি? সমস্ত ভারত-সাগরের জল পারলো না তাকে শীতল করতে। একি অনির্বাণ শিখার আশীর্বাদ দিয়ে গেলে হে গুরু!

সেই জনমানবহীন অনন্তের রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়ে পরিব্রাজক নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে দেখেন, সৃষ্টি-একাকার-করা কি প্রমত্ত ঝড় বয়ে চলেছে সেখানে। সে কি প্রলয়ের পূর্বাভাস? না, নব-সৃজনের অন্ধ-উন্মাদ আবেগ? সে-ঝঞ্ঝায় কি ভেঙে

চূর্ণ হয়ে যাবে অস্তিত্বের সযত্ন-বর্ধিত সব ভার? না, সেই ঘূর্ণায়মান নীহারিকা থেকে নব-জন্মগ্রহণ করছে নতুন কোন বিশ্ব...?

সেই বিপুল অন্ধ আবেগের আলোড়নে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় যেন দেহ। অপটু আধার ভেঙে যেমন ছড়িয়ে পড়ে পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ-শক্তি, তেমনি পরিব্রাজক অনুভব করেন, ক্ষণভঙ্গুর সেই দেহভাণ্ড ভেদ করে যেন মুক্তি অর্জন করতে চায় ভেতরের পুঞ্জীভূত সেই বিদ্যুৎশক্তি। কি তীব্র তার আলোড়ন, কি বিপুল তার ভাব, কি জ্বালাময় তার অন্ধ গতিবেগ। কোথায় রাখবেন তাকে ধরে? কি ভাবেই বা মুক্তি পাবেন তার এই নিত্য প্রভুত্ব থেকে?

একদিকে জেগে ওঠে ভারতের সমস্ত রাজসিক সম্ভাবনার মহাবীর্য...সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করবার মত মহাশক্তি...রাজরাজেশ্বরের অমিত-বীর্য...নতুন করে করতে দিগ্বিজয়...প্রতিষ্ঠা করতে নতুন রাজসূয়...

আর একদিকে জেগে ওঠে ভারতের সমস্ত সাত্ত্বিক চেতনার বিশ্ববিহীন নির্লিপ্ততার আহ্বান...অনাদিকারণ-সমুদ্রে নিশ্চিহ্নভাবে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেবার মহা-তৃষ্ণা...জন্ম-মৃত্যু, গতায়াত, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অনাদি-চক্র ছিন্ন করে অর্জন করা নিজের আত্মিক-মুক্তি...নির্বাণ...

সন্ন্যাসীর অন্তর রঙ্গভূমিতে চলে এই দুই অনাদি শক্তির শক্তি-পরীক্ষা...দগ্ধ হয়ে যায় সন্ন্যাসীর অন্তর। উদ্বেল হয়ে ওঠে সমগ্র অস্তিত্ব চরম জিজ্ঞাসায়। ততঃ কিম্?

রামকৃষ্ণ-সন্তান কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে চেয়ে বলে, হে গুরু দেখা দাও, কথা কও, তুমি বলে দাও কোন্ পথে আমি যাব, কোথায় পথ?

মাতৃ-অদর্শন-কাতর শিশু যেমন সমস্ত কান্নার মধ্যে জননীর আগমন-আশার দিকে চেয়ে থাকে, বিবেকানন্দ তেমনি ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকেন, মৃত্যুর ওপার থেকে গুরুর উত্তরের ইঙ্গিতের আশায়।

তাঁর স্থির বিশ্বাস, সে ইঙ্গিত তিনি নিশ্চয়ই পাবেন।

সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পরিব্রাজক ভারতের সমতলভূমির দিকে চেয়ে দেখেন, যে ভূমি তিনি পায়ে পায়ে গণনা করে চলে এসেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই শেষ রাত্রিতে একজন বাঙালী সেদিন নিদ্রিত ভারতে প্রথম সমগ্রভাবে দেখলেন ভারতবর্ষকে...

ভারতের আধুনিক ইতিহাসে সেইটেই হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা... বিবেকানন্দের ভারত-দর্শন। তিনি দেখলেন ভারতবর্ষকে...তার অতীতকে, তার বর্তমানকে, দেখলেন যে ভারতবর্ষ নেই, দেখলেন যে ভারতবর্ষ অবশিষ্ট পড়ে আছে; দেখলেন যে ভারতবর্ষ অবিনাশী; দেখলেন যে ভারতবর্ষ মুমূর্ষু।

দেখলেন, কল্পনায় নয় পুঁথিতে নয়, দেখলেন প্রত্যক্ষভাবে, তার ধুলো-মাটি-কাদা সমেত, দেখলেন চোখ মন সব ইন্দ্রিয় দিয়ে। দেখলেন শত দুঃখ শত দৈন্য শত হীনতা সত্ত্বেও সে ভারতবর্ষ রাজ-রাজেশ্বরীরূপে তাঁর অন্তর জুড়ে বসে

আছে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ...সবই তুমি, ওগো আমার দেশ, সভ্যতার লীলাভূমি... মানবের মুক্তির স্বপ্ন মরকত ধূলার মত জড়িয়ে আছে তোমার ধূলায় ধূলায়।

ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে, নিদ্রিত ভারতের তামসী অন্ধকারে সন্ন্যাসী বসেন ধ্যানে...তেত্রিশ কোটি দেবতার বদলে ইষ্ট আজ, আরাধ্য আজ, এই মাটি, আর অবিনাশী মুমূর্ষু মহাদেশ!

লুপ্ত হয়ে যাক্ অন্য সব দেব-দেবী, জাগো একেশ্বরী...জননী ভারত!

সন্ন্যাসীর অন্তরে ধ্যানসম্ভবা জাগে অতীত ভারত...তপোবনে ওঠে আবার যজ্ঞাগ্নি ধূম...আবার বেদব্যাস বসেন মানুষের আদিম অভিজ্ঞতাকে শ্রেণীবদ্ধ করতে ...জনকের যজ্ঞ-সভায় অমৃত-বাদিনী নগ্ন-মহিমা নারী গার্গী পুনরায় এসে উত্থাপন করেন, আত্ম-কথার চরম প্রশ্ন...দুর্জ্ঞেয় মনের নিগূঢ় রহস্যকে করায়ত্ত করবার জন্যে আবার অনুশীলনে বসেন পাতঞ্জল ঋষি...বিভিন্ন রসের সমবায়ে বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন পুনরায় প্রস্তুত করতে চলেন অমৃতরসায়ন...আবার সন্দিগ্ধকণ্ঠে সমস্ত আপাত সুখভোগের মধ্যে বিপ্লবের সুর তোলেন ঋষি চার্বাক...আবার নিরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুম-মূলে মানব-কল্যাণের ধ্যানে বসেন রাজার কুমার গৌতম...হিমালয় উল্লঙ্ঘন করে চলে অশীতিপর বৃদ্ধ দীপংকর...দিকে দিকে ওঠে মঠ আর স্তূপের চূড়া... রণ-হুঙ্কারে আবার ডুবে যায় যুগ-যুগান্তরের সাধনা...

...বর্বরতার আক্রমণে নিবে যায় উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-চূড়ার রত্নদীপ...স্তিমিত নিবীর্যতা আর সংগোপন আত্ম-রতির মধ্যে আবার ধ্বনিয়া ওঠে শঙ্করের দিগ্বিজয়ী রথের শব্দ...আর আসে মুঘল...আসে পাঠান...তুর্কী...হাতে নিয়ে রক্ত-ঝরা তরবার ...পুরোনো দেহে আবার আসে নতুন রক্তের জোয়ার...যমুনার তীরে শ্বেতপাথরে লেখা হয় নতুন শকুন্তলা...পাথরের মহাকাব্য...চলে নতুন করে আবার মানব-মনের রসায়ন...নতুন করে আবার চলে মিশ্রণ...মিলন...আত্মীয়তা...আবার দেখতে দেখতে নীরব হয়ে যায় দেওয়ানী খাস...আসে সমুদ্রপার থেকে নতমস্তকে বণিক ভিখারীর দল...রাজকুমারীর রোগ-নিরাময়ের বদলে ভিক্ষা করে নেয় এক টুকরো জমির বখশিশ ...আবার বর্ষ-বিধৌত এক ম্লান অপরাহ্ণে পলাশীর আম্রকুঞ্জ অন্তরালে ডুবে যায় ভারত-সূর্য। ধ্যান-অন্তে চেয়ে দেখেন সন্ন্যাসী সামনে প্রসারিত বর্তমান ভারত-ভূমির দিকে...

কোথায় তপোবন, কোথায় রাজা জনক, কোথায় পাতঞ্জল, কোথায় শঙ্করের দিগ্বিজয়ী রথ? কোথায় সে দেওয়ানী আম আর দেওয়ানী খাস? কোথায় সে পাথরের মহাকাব্য?

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পরিব্রাজক দেখে এলেন, অর্ধ মানুষের দল পথকুক্কুরের সঙ্গে ভাগ করে খাচ্ছে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের অংশ...অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মুমূর্ষু ভারতবর্ষ। দেখে এলেন আচার-কণ্টকিত ধর্মহীন ভারতের ধর্মধ্বজীদের নির্মম আত্মসর্বস্বতা, দেখে এলেন দেবতার নামে পুরোহিতের আধিপত্য, নর-কঙ্কালের শয্যায় শুয়ে ঐশ্বর্যশালীদের স্বপ্ন-বিলাস, দেখে এলেন মনুষ্যত্ব-বোধের চিহ্নহীন মানবের দল মৃতদেহকে পুষ্পে চন্দনে সাজিয়ে করে চলেছে প্রেতপূজা,

মানবতার জন্মভূমিতে দেখে এলেন মানবতার অপমৃত্যুর মহাদুর্দৈব। সন্ন্যাসীর চোখের সামনে প্রেতমূর্তির মত জেগে ওঠে প্রাণহীন, শক্তিহীন, মানবতাবোধহীন মুমূর্ষু ভারতবর্ষ, রিক্ত ভারতবর্ষ, কঙ্কাল ভারতবর্ষ।

ধ্যানের আসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ান...আবার তুলে নেন পরিব্রাজকের দণ্ড...যে পথ দিয়ে এসেছেন আবার চলেন সেই পথের দিকে...

রিক্ত, নিঃস্ব, মুমূর্ষু ভারতবর্ষ তাঁকে আহ্বান করে।

পরিব্রাজকের সঙ্গে না গিয়ে আপাততঃ আমরা একটু ফিরে যাবো।

অনবধানবশতঃ পরিব্রাজকের জীবনের দু-একটি কাহিনী আমরা অনুল্লেখিত ফেলে এসেছি। সে ত্রুটি এখানে সংশোধন করে নিতে চাই।

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। দ্বিপ্রহর। যুক্তপ্রদেশের রুক্ষ মাটি যেন জ্বলন্ত কয়লার মত তাপ বিকীরণ করছে। মাথার ওপর থেকে নিরাকার তরল অগ্নিধারা নামছে।

তারিঘাট স্টেশনে রেলগাড়ি এসে থামতে পরিব্রাজক ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই স্টেশনে নেমে পড়লেন। সঙ্গে নিজের গৈরিক বাস ছাড়া আর কিছুই নেই। কমণ্ডলু পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। থাকবার মধ্যে আছে, একখানি থার্ডক্লাসের টিকেট, একজন যাত্রী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে কিনে দিয়েছিল।

ট্রেন থেকে নেমে সেই অসহ্য রোদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে পরিব্রাজক স্টেশনের প্লাটফর্মের ওপর এক টিনের শেডের তলায় গিয়ে বসলেন। কিন্তু বসতে না বসতেই স্টেশনের একজন কুলী এসে তাঁকে আদেশ করলো, এখানে বসবার হুকুম নেই...বাইরে যাও!

পরিব্রাজক প্রতিবাদ না করে বাইরে এসে মুক্ত আকাশের তলায় রোদেই বসে পড়লেন। তাঁর সামনেই একটু দূরে একটা টিনের শেডের তলায় একটা ছোট্ট খাটিয়ার ওপর বেনিয়া শ্রেণীর এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে তিনি একই কামরাতে এসেছেন।

সারা ট্রেন ভদ্রলোকটি তাঁকে উত্ত্যক্ত এবং উপহাস করে এসেছেন। যখনই গাড়ি কোন স্টেশনে এসে থামতো, পরিব্রাজক তৃষ্ণার্ত হয়ে পানিপাঁড়ের কাছে গিয়ে জল চাইতেন। রেলের নিয়ম অনুযায়ী যাত্রীদের বিনামূল্যে পানীয় জল দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা, কিন্তু প্রথা অনুযায়ী যাত্রীদের পয়সা দিয়ে সেই জল কিনে খেতে হয়। পরিব্রাজকের কাছে একটিও কপর্দক ছিল না। তাই প্রত্যেক স্টেশনেই পানিপাঁড়ের কাছে জল চেয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাতই হতেন। সহযাত্রী এই বেনিয়া ভদ্রলোকটি তাঁকে দেখিয়ে জল পান করতেন আর বিদ্রূপ করে বলতেন, দেখেছ সন্ন্যাসীঠাকুর, পয়সা থাকার কি সুখ! পয়সা ফেলে দিলাম, আর দিব্যি ঠাণ্ডা জল পেট পুরে খেলাম! অমন পালোয়ানের মত চেহারা, পয়সা রোজগার না করে মুফতি লোকের মাথা ভেঙে তোমরা খাবে, তা মাঝে মাঝে একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে বই কি!

পরিব্রাজক নীরবে সহ্য করেন, কোন উত্তরই দেন না।

তাতে ভদ্রলোক আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সন্ন্যাসীকে আঘাত করবার জন্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলতে থাকেন, আরে গতর আছে, খাটবি, খাবি। তা নয়, যত সব বুজরুকি...যত বেটা সন্ন্যাসী আছে তাদের উপবাস করিয়ে রাখা উচিত। তবেই বাছাধনেরা জব্দ হবে।

সন্ন্যাসী কোন কথাই বলেন না।

ভদ্রলোক কিন্তু রেহাই দেন না। অবশেষে সোজা জিজ্ঞাসা করেন, বলি সন্ন্যাসী-ঠাকুর, আমরা সবাই যেমন খেটেখুটে পয়সা রোজগার করি, সে রকম করো না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাভাবে নিজের আর্থিক প্রতিপত্তি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সন্ন্যাসীকে শোনান এবং বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি যে তৃষ্ণায় এবং ক্ষুধায় এইভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, সেটা ভগবানেরই অভিপ্রেত এবং তাঁর পাপের উপযুক্ত শাস্তিই তিনি পাচ্ছেন।

তবুও সন্ন্যাসী কোন প্রতিবাদ করেন না। এই অবস্থায় তিনি তারিঘাট স্টেশনে নেমে পড়েন এবং অচিরকালের মধ্যেই দেখেন, ট্রেনের সেই সহযাত্রী বেনিয়া ভদ্র-লোকটিও সেখানে নেমেছেন এবং ইচ্ছা করেই তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে সামনের ছায়ায় খাটিয়ার ওপর বসে পরমানন্দে পুরি আর লাড্ডু খাচ্ছেন।

সন্ন্যাসীকে সামনে রোদে বসে পুড়তে দেখে পরমোল্লাসে ভদ্রলোকটি খেতে খেতে বলে উঠলেন, কি বাবা সন্ন্যাসীঠাকুর! তুমি রোদ খাচ্ছো আর আমি এই দোখো কেমন পরমানন্দে পুরি আর লাড্ডু খাচ্ছি! পয়সা যখন রোজগার করবে না, তখন খালি পেটে রোদ খেতে হবে বইকি!

ভদ্রলোকটির কথা শেষ হতে না হতে সন্ন্যাসী দেখেন যেন তাঁর দিকে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, তাঁর এক হাতে একটা লোটা, আর এক হাতে কিসের একটা পুঁটলি, বগলে একটা ছোট্ট মাদুর। নবাগত ভদ্রলোকটি একটা পরিষ্কার ঠাণ্ডা জায়গা দেখে, সেখানে মাদুরটা বিছিয়ে দিলেন, মাদুরের সামনে জলের লোটা আর পুঁটলিটা রেখে সন্ন্যাসীর সামনে এসে হাত জোড় করে বললেন, বাবা অনুগ্রহ করে উঠে এসে মাদুরে বসুন! আসেন।

বেনিয়া ভদ্রলোকটি নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। খাওয়া ছেড়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন।

নবাগত ভদ্রলোকটি হাত জোড় করে বলছেন, বাবা, সামান্য কিছু খাবার আর এই ঠাণ্ডা জল এনেছি...গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন!

বেনিয়া ভদ্রলোকটি উঠে দাড়ান...

সন্ন্যাসী নবাগতকে বলেন, আপনি ভুল করছেন...আমি নই...আপনি যাঁকে খুঁজছেন, তিনি হয়ত আমারই মত দেখতে...

তাঁর কথা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই নবাগত কাতরভাবে বলে ওঠেন, না বাবা, না, আমি ভুল করি নি! আমি আপনাকেই দেখেছি।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে বলেন, আমাকে কোথায় আপনি দেখেছেন?

নবাগত বলেন, আমি এই শহরের মিঠাইওয়ালা। খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা একটু

শুয়েছিলাম। এমন সময় স্বপ্নে দেখলাম, আমার গৃহদেবতা শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে দেখিয়ে আমাকে বলছেন, ওরে, শিগগির কিছু পুরি আর মিঠাই নিয়ে স্টেশনে যা... আজ দুদিন হতে চললো ও না খেয়ে আছে...শিগগির যা। তক্ষুনি ঘুম ভেঙে গেল...তাড়াতাড়ি কিছু খাবার আর জল নিয়ে ছুটে এসে দূর থেকে আপনাকে দেখেই চিনেছি...আসুন...অনুগ্রহ করে আমাকে ধন্য করুন!

সন্ন্যাসীর দুচোখ অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে ওঠে।

—তুমি আছ...তুমি আছ...কত ভাবে, কত রকমে আমাকে জানালে তুমি!

সন্ন্যাসী উঠে মাদুরে এসে বসেন। বেনিয়া ভদ্রলোকটি কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি চিনতে পারি নি, আমাকে ক্ষমা করুন!

এমনিধারা আর একবার ট্রেনে চলেছেন। নিঃসম্বল, রিক্ত, মাত্র গেরুয়া বাস সম্বল। এমনিধারা আর একজন দয়াপরবশ হয়ে একখানি রেলে টিকিট কিনে দিয়েছেন।

কামরার মধ্যে দুজন সাহেব ছাড়া আর কোন যাত্রী নেই। তাকে দেখে সাহেব দুটি তাদের ধারণা অনুযায়ী তাঁকে অজ্ঞ মূর্খ একজন সাধারণ সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক বলে ধরে নেয় এবং পরম নিশ্চিন্তভাবে ইংরেজী ভাষায় তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে শুরু করে দেয়। পরিব্রাজক নীরবে তাদের কথা হজম করে চলেন, যেন তাদের কথা তিনি বুঝতেই পারছেন না।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলে আসার পর একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামতে স্টেশন-মাস্টার সেই কামরার কাছে কার্যোপলক্ষে উপস্থিত হন। পরিব্রাজক বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় তাঁর কাছে পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সাহেব দুটি সেই কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, যাঁকে অজ্ঞ মূর্খ বিবেচনা করে তারা কুৎসিতভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে এসেছে, তিনি তাদেরই মত সেই ভাষা জানেন।

নিজেদের সেই অসভ্য আচরণে একান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে তারা পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু কী আশ্চর্য! আপনি আমাদের কথা শুনে বিন্দুমাত্র তো বিচলিত হলেন না?

পরিব্রাজক উত্তর দিলেন, বন্ধু, তোমাদের মত 'ফুল্' জীবনে যদি এই প্রথম দেখতাম, তাহলে হয়ত বিচলিত হতাম!

প্রত্যুত্তর শুনে সাহেব দুটির নীলরক্ত সহসা টগবগ করে ফুটে উঠলো।

উদ্ধত সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দেবার জন্যে হাতের মুঠো তুলতে গিয়ে, হঠাৎ নজরে পড়লো সন্ন্যাসীর নগ্নগাত্র...আর অবিচলিত ভঙ্গী...

এক্ষেত্রে তূষ্ণীভাব ধারণ করাই যুক্তিসংগত বিবেচনায় ইংরেজদ্বয় সে অপমান পকেটস্থ করতে বাধ্য হলো।

যে ধর্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia প্রসূত রোগ বিশেষ বলিয়া জানিও—

দার্শনিক—স্বামী বিবেকানন্দ





কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে—

বীর—স্বামী বিবেকানন্দ

কত না মানুষ, কত না মন! মন থেকে মনে, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরে ওঠে পরিব্রাজকের অন্তর।

ক্ষেত্রীয় রাজার জমিদারির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছেন একবার।

যেখানেই যান, দলে দলে লোক কোথা থেকে এসে তাঁকে ছেঁকে ধরে। অষ্টপ্রহর তাঁকে ঘিরে থাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, মিনতির পর মিনতি। এক মুহূর্ত তাঁকে একলা থাকতে দেয় না, এমন কি দিনের পর দিন অনর্গল তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হয়। তাঁর ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, তা পর্যন্ত তারা ভুলে যায়।

সেবার এইভাবে উপর্যুপরি তিনদিন, তিনরাত কেটে যায় একাসনে। কেউ একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না, তিনি আহার করেছেন কিনা, আহার করবেন কিনা! নিজে আহারের জন্যে আকুতি করাও দিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। সামনে যা আসবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। যদি না আসে, উপবাসী থাকতে হবে। দিনান্তে সঞ্চয় কিছু থাকবে না। প্রতিদিন সূর্যকে অভিনন্দন করতে হবে, সম্পূর্ণ রিক্ত হাতে।

তিনদিন তিনরাত্রির পর ভিড় কমলে একজন নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোক সংকোচে সম্ভ্রমে তাঁর কাছে এসে দূর থেকেই তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালো। সে এই তিনদিন ধরে দেখেছে, সন্ন্যাসীকে নিরম্বু উপবাস দিতে। তাই করুণায় তার অন্তর উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

হাত জোড় করে বলে, প্রভু, আমি দেখছি আজ তিনদিন ধরে আপনি উপবাসী আছেন। এমন কি, এক গেলাস জলও গ্রহণ করেন নি। আহা না জানি, কী কষ্টই না পাচ্ছেন!

পরিব্রাজক যেন এই দরিদ্রের জন্যেই অন্তরে অপেক্ষা করে ছিলেন। যাঁর ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন, সন্ন্যাসীকে দেখতে হবে, তিনি সে নির্ভরতায় সাড়া দেন কি না। পথ থেকে পথান্তরে এই নিত্য-চলার মধ্যে, সকল প্রশ্ন, সকল জিজ্ঞাসা, সকল উত্তরের মধ্যে, সন্ন্যাসী শুধু খুঁজে চলেছেন সেই একটি অলোক-অস্তিত্বের স্পর্শ, শুধু কান পেতে আছেন, তাঁরই বাণী শুনতে, চেয়ে আছেন শুধু তাঁকেই দেখতে ; তাঁর সমস্ত উপবাস, সমস্ত অনশন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য তাঁরই দেওয়া অন্ন গ্রহণ করা, তাঁরই দেওয়া জলে তৃষ্ণা দূর করা। তিনি যা দেবেন না, তা পাওয়ার নয়, তিনি যা দেবেন, তাই একমাত্র প্রাপ্য!

তাই তিনদিন তিনরাত্রি পরে সেই দরিদ্র ব্যক্তির অকস্মাৎ করুণায় সন্ন্যাসীর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠলো। তিনি তাকেই বললেন, আমাকে কিছু খেতে দিতে পার?

অশ্রু-নিরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠলো, স্বামীজী, আপনাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমি তো কোন খাদ্য আপনাকে দিতে পারি না...আমি যে অস্পৃশ্য মুচী! তবে আপনি যদি গ্রহণ করেন, তাহলে আমি চাল-ডাল শাক-সবজি সব এনে দিচ্ছি, আপনি রেঁধে নিন!

কিন্তু পরিব্রাজকের পক্ষে অগ্নিস্পর্শ নিষিদ্ধ। সুতরাং চাল-ডাল নিয়ে তিনি কী করবেন? সে কথা তাকে না জানিয়ে পরিব্রাজক বললেন, মুচী, তা কি হয়েছে? আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে তো কোন জাত-অজাত নেই।

কিন্তু সে ব্যক্তি ভয়ে শিউরে উঠলো। বললো, স্বামীজী, আপনি না হয় সাধু লোক, আমার খাদ্য গ্রহণ করলেন কিন্তু মহারাজা যদি কোনরকমে জানতে পারেন যে আমি আপনাকে খাদ্য দিয়েছি, আমার ছোঁয়া খাদ্য আপনি খেয়েছেন, তাহলে আমার আর রক্ষা থাকবে না। অতি কঠোর শাস্তি আমাকে পেতে হবে!

যে মহাঘাতে সমগ্র দেশের দেহ অবসন্ন হয়ে উঠেছে, সন্ন্যাসী বার বার স্বচক্ষে দেখলেন, সে আঘাতের গভীরতা। এমনিভাবে শৃঙ্খলে তারা বাঁধা যে মুক্তি দিলেও তারা নিতে পারে না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে পরিব্রাজক বলেন, তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মহারাজ জানতে পারলেও তোমাকে কোন শাস্তি দেবেন না।

পরিব্রাজকের সে আশ্বাস সে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারলো না, কিন্তু করুণায় তার মন তখন এমন হয়ে উঠেছিল যে সে শাস্তির সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েও সে সন্ন্যাসীর জন্যে খাদ্য নিয়ে এলো।

পরিব্রাজক বলেন, জানি না, স্বর্গে দেবরাজ অমৃত পান করে এর চেয়ে আনন্দ পান কিনা। এমনি ধারা ভারতের ভাঙা কুঁড়েঘরে, আঁস্তাকুড়ে পড়ে আছে কত না বিরাট মন, বিশাল অন্তঃকরণ, ছোটজাত বলে, অস্পৃশ্য বলে তাদের আমরা রেখেছি সরিয়ে দূরে।

পরে যখন ক্ষেত্রীর মহারাজা তাঁর শিষ্য হন, বিবেকানন্দ ক্ষেত্রীর সেই সামান্য মুচীকে ভোলেননি। মহারাজার লোক দিয়ে তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে এসে দাঁড়ালো, না জানি কী ভয়াবহ শাস্তি না তার ভাগ্যে আছে।

মহারাজা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, তার সারা জীবনের দায়িত্ব দিলেন রাজকোষের ওপর।

সন্ন্যাসী ভাবে, কবে ঘুচে যাবে এই প্রাসাদ আর পর্ণ-কুটীরের ব্যবধান? ভেঙে যাবে এই মানুষ আর মানুষের মাঝে পাঁচিল?

তার এক একখানি ইঁট ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেন পরিব্রাজক।

মাঝে মাঝে জেগে ওঠে ক্রুদ্ধ সর্পের মত নিদারুণ বিক্ষোভ...তীব্র অসন্তোষ... ও পাওয়ার দুর্নিবার জ্বালা...

কতদিন এমনি ঘুরে বেড়াবেন পথ থেকে পথান্তরে? কোথায় এ পথের শেষ? কী আছে সেখানে? কেন এমনি ক্ষুধিত বায়সের মত অন্ন মেগে মেগে ঘুরে বেড়াবেন দ্বার থেকে দ্বারে? দরিদ্র যে, রিক্ত যে, তার অন্ন থেকে এক মুঠি ভিক্ষা করে নিয়ে, কেন তাকে বঞ্চিত করা?

কোথায় সে চির-লুক্কায়িত, যার জন্যে এত অন্বেষণ? যদি তাঁকেই না গেল পাওয়া, তবে কিসের এ দেহ? কেন এ দেহকে বাঁচিয়ে চলবার এত আয়োজন, এত আশঙ্কা?

মাঝে মাঝে জেগে ওঠে সেই পুরাতন পিপাসা...ভগবৎ-বিরহের সর্বগ্রাসী বেদনা। উত্তর ভারতের অরণ্যপথ দিয়ে যেতে যেতে তীব্র বেদনায় বনের মধ্যে মুহ্যমান হয়ে

পড়লেন। স্থির করলেন, এই অরণ্যের মধ্যে নিজেকে নিরংকুশভাবে দেবেন বিলুপ্ত করে। ভগবৎপ্রাপ্তিহীন এই দেহভার যাক অনশনে ক্ষয় হয়ে। কোন চিন্তা আর তিনি করবেন না এই দেহের জন্যে...

এই সংকল্প করে নগরের পথ ছেড়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। যত চলেন, অরণ্য তত গভীর হয়ে আসে।

সারাদিন এইভাবে অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ক্রমশঃ সন্ধ্যা নেমে এলো। চারিদিক থেকে উঠছে বন্য জন্তুদের নিশীথ জাগরণের শব্দ। নিস্পৃহ পরিব্রাজক অবসন্ন ক্লান্ত দেহে এক গাছের তলায় ধ্যানে বসেন। সহসা নিকটে ব্যাঘ্রের বিকট চিৎকার শোনা যায়। সন্ন্যাসী চেয়ে দেখেন, সামনেই অন্ধকারে নীলাভ দুই চোখ জ্বলছে। ব্যাঘ্র সন্ন্যাসীর আরো নিকটে এগিয়ে এলো। সন্ন্যাসী নিশ্চল আসনে বসে। ব্যাঘ্র কী মনে করে সন্ন্যাসীর সামনে দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো। সন্ন্যাসী সেদিকে চেয়ে ভাবেন, আমরা দুজনেই ক্ষুধার্ত...এ দেহ কোন কাজে লাগলো না, অন্ততঃ এই ক্ষুধিত পশুর এক রাত্রির খাদ্য জোগাবে। ব্যাঘ্র শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো...কী মনে করে আবার গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো।

সন্ন্যাসীর অন্তর আলোড়িত করে অকস্মাৎ নেমে এলো শক্তির জোয়ার...সমাধিতে মগ্ন সন্ন্যাসী...

ধ্যান অন্তে এলো আনন্দের জোয়ার...পরিব্রাজক আবার চললেন অরণ্য ছেড়ে নগরের পথে।

কোথা দিয়ে, কোন পথে, কেমন ভাবে আসে সে শক্তি, যে শক্তির স্পর্শে এই মৃত্যু-ভংগুর দেহ পায় অমৃত-স্পর্শ, মানুষ হয়ে ওঠে ঈশ্বরের অংশ। বিদ্যুৎস্পর্শে যেমন বিদ্যুৎময় হয়ে ওঠে জড় পদার্থ, আমরা জানি না, অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আমাদের সাধারণ জ্ঞান কিন্তু বারবার আমরা দেখেছি, এই মানুষের মৃত্যু-পঙ্কিল যাত্রাপথে মানুষ পেয়েছে তার অধিকার। যাঁরা দুর্লভ সাধনায় সেই অমৃতত্বের অধিকার অর্জন করেছেন, তাঁরা বারবার সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে ঘোষণা করে গিয়েছেন মানুষের মনের সেই ঐশীশক্তি লাভের কথা...মৃত্যুর মধ্যে বারবার সত্য হয়ে উঠেছে মানব-মনের সেই অমরত্বের কথা...

তবে ঘোচে না মানুষের সন্দেহ...পায় আর হারায়...সত্য হয়ে থাকে শুধু অন্বেষণ।

পরিব্রাজক চলেছেন, রাজপুতানার দক্ষিণ অঞ্চলের মরুভূমির মধ্য দিয়ে...এ মরুভূমি তাঁকে পার হয়ে যেতে হবে...দূরে, বহুদূরে। পেছনে ফেলে এসেছেন মানুষের সংস্পর্শ, শস্য-শ্যামলা ধরিত্রীর স্নেহরূপ...সামনে ধুধু শুধু মরুবালি...তপ্ত-অগ্নিকণার স্তূপ...মাথার ওপর সূর্য ঢেলে চলেছে তরল অগ্নিধারা। সন্ন্যাসীর কন্ঠ শুকিয়ে আসে। তৃষ্ণায় দেহ যেন বাষ্পায়মান হয়ে যায়। এমন সময় সহসা সামনে দেখেন, গ্রাম...লোকালয়...সন্ন্যাসী দ্রুত এগিয়ে চলেন...সামনে চোখে পড়ে জলপূর্ণ সরোবর...টইটম্বুর জল...তৃষ্ণায় অধীর সন্ন্যাসী জলপানের জন্যে

সরোবরতীরের দিকে এগিয়ে চলেন, সরোবর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে...যত দ্রুত সন্ন্যাসী চলেন, সরোবর যেন তত দ্রুত সরে যায়...অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত মুহ্যমানদেহ সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন, মরীচিকা...তৃষ্ণায় মরুমধ্যে মরীচিকাভ্রান্ত তিনি...

যে মুহূর্তে সেই জ্ঞান এলো, সেই মুহূর্তেই মরীচিকা শূন্যে মিলিয়ে গেল। সন্ন্যাসী সজ্ঞানে দেহমনকে কঠোর করেন, মরুভূমি আর মরীচিকা দিয়ে আমাকে ভ্রান্ত তুমি অন্ততঃ আর করতে পারবে না!...

তিনদিন তিনরাত্রি অবিশ্রাম চলার পর অবসন্ন মূর্ছিত-দেহে সন্ন্যাসী পথের ওপরই পড়ে গেলেন...জ্ঞানহীন। যখন তাঁর জ্ঞান হলো, দেখেন, অবিশ্রান্ত আকাশ থেকে পড়ছে জলধারা, সে জলে দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে...যেন নিদ্রা-অন্তে সন্ন্যাসী উঠে আবার পথ চলতে লাগলেন...

কন্যাকুমারিকার মন্দির পশ্চাতে ফেলে পরিব্রাজক আবার চললেন উত্তরমুখী মাদ্রাজের দিকে...

পেছনে ফিরে দেখি, পরিব্রাজকের সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসযাত্রার মধ্যে এক অপরূপ নতুন ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠছে...বহু বিচিত্র মানুষের পৃথিবীতে গড়ে উঠছে সম্পূর্ণ আলাদা আর এক মানুষ...বিধাতার সম্পূর্ণ আলাদা একটা ছাঁচ...

সুকঠোর সাধনায় আর গুরুর আশীর্বাদে অন্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে বিপুল শক্তি...আনন্দ-রসের মত পরিব্রাজক অনুভব করেন তাঁর অস্তিত্ব নিজের দেহের মধ্যে, সমগ্র চেতনার মধ্যে। জগৎ জানে না তাঁর কোন সংবাদ...জগৎকে জানাবার কোন আগ্রহই নেই ধারকের।

মাঝে মাঝে দুর্বার হয়ে ওঠে সেই শক্তি। সদ্য পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য শার্দুলের মত আস্ফালন করে ওঠে, পিঞ্জর ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে পড়তে। বহু সাধনায় নিজের অন্তরে দিয়েছেন যার জন্ম, পেয়েছেন যে অমিতশক্তি, সে আজ জন্মদাতাকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা করতে চায় নিজের প্রভুত্ব...কী করে রাখবেন তাকে ধরে? বাইরে থেকে আসে শত আহ্বান, শতদিক থেকে শত কর্মের আমন্ত্রণ, আত্মপ্রকাশের দুর্বার লোভ, নিষ্করুণ সন্ন্যাসী নিষ্ঠুর নিপীড়নে নিজেকে রাখেন স্থির, শান্ত, বাইরে আত্ম-প্রসারের সমস্ত প্রলোভনকে নির্মম সংযমে রাখেন সংযত করে। কেন?

বাইরের জগৎ থেকে দূরে বিশ্ববিহীন নির্জনতায় চলেছে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিশ্ব-জননীর বোঝাপড়া।

সেখানে বরানগর মঠ নেই, গুরুভাইরা নেই, ভারতবর্ষ নেই, ভারতবর্ষের বেদনা নেই, জগৎ নেই। সেখানে আছেন সন্ন্যাসী শুধু একা, আর তাঁর মন, আর আছেন সমস্ত বিশ্ব-বিধানের যিনি জননী, জীব-ঈশ্বরী, তাঁর গুরুর আলোক অস্তিত্বের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে। এ দেহ, এ মন, এ চেতনা সমস্তই সমর্পণ করেছি তোমাকে। হে গুরু, মৃত্যুপথে যাতায়াতে এবারের এই ক্ষণ-অস্তিত্ব, এ তোমারি প্রস্থিত-আত্মার মর্ত্য-চিহ্ন মাত্র। এ স্ফুলিঙ্গ তোমারই যজ্ঞাগ্নির কণা। তোমাকে ছাড়া, তোমাতে

ছাড়া নেই এর দ্বিতীয় অস্তিত্ব, নেই এর দ্বিতীয় চেতনা। তাই, তুমি হবে এর নিয়ামক, তুমি যেভাবে বাজাবে, সেইভাবে বাজবে এ তন্ত্রী। তাই আমি চেয়ে আছি, তোমার আদেশের জন্যে, তোমার ইঙ্গিতের জন্যে। আমি জানি, তুমি আছ ; আমি জানি, এ রথ তোমারই সৃজন, তুমি হবে এর চালক। আমি সম্ভব করে তুলবো, আমার জীবনে তোমার আবির্ভাবকে,—সেই আমার সাধনা। স্পষ্ট, প্রত্যক্ষভাবে আমি আকর্ষণ করে আনবো তোমার নির্দেশকে, তোমার বাণীকে...যতক্ষণ তা না সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব আমার দ্বারে করাঘাত করে গেলেও, পাবে না আমার সাড়া।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ যখন নিদিধ্যাসনে বসেছে, বিদ্যুৎ আর অদৃশ্য অণুর অন্তরের রহস্য সন্ধানের জন্যে, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষে চলেছে আর এক মহা-অনুসন্ধান, মানব-জীবনের রসায়নাগারে অভিনব আর এক গবেষণা, বস্তুর অতীত রহস্যলোকের সঙ্গে মানুষের মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ...

ইওরোপে যখন বৈজ্ঞানিক চলেছে ধর্মকে অস্বীকার করে বস্তুর রহস্য ভেদ করতে, ভারতবর্ষে তখন একক চলেছেন সন্ন্যাসী বস্তুকে অতিক্রম করে বস্তুর অতীত-লোকের রহস্য ভেদ করতে...

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একদিকে দাঁড়িয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর বিদ্যুৎ-ভাণ্ড নিয়ে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, আর একদিকে দাঁড়িয়ে এক দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে গৈরিক-বাস এক সন্ন্যাসী...

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যাঁরা ইওরোপ থেকে লিখেছেন, তাঁরা দেখতে পান নি, তার শেষ-রাত্রির অন্ধকারের বুকে ভারতের এই নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের পায়ের দাগ।

ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিবেকানন্দের আবির্ভাব যুগ-নিয়ামক বিশ্ব-ঘটনারূপেই একদিন প্রতিভাত হবে।

ভেতরে গর্জন করছে সপ্ত সমুদ্র...বাইরে বৈরাগীর শান্ত-গৈরিকবাস...পরিব্রাজক হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পণ্ডিচেরীতে পথের ধারে বিশ্রামের জন্যে বসলেন।

সেই অপরূপ মূর্তি তরুণ সন্ন্যাসী জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তু-ভারের বেদনায় ব্যথিত জনতা সন্ন্যাসীর কাছে খোঁজে বস্তুর অতীত মায়া-রসায়ন... একটুখানি স্পর্শ, একটা শেকড়, দুটো আশীর্বচন, ভেলকি, দুরারোগ্য ব্যাধির অনায়াস চিকিৎসা। সন্ন্যাসী সাড়া দেন না। শেকড় বার করে দেবেন, এমন ঝুলিও নেই। বিরক্ত হয়ে ফিরে যায় জনতা। ভণ্ড!

তাদেরই মধ্যে জনকয়েক তরুণ, তারা যেন কিসের আকর্ষণে সন্ন্যাসীর কাছে এগিয়ে আসে। সন্ন্যাসীর কথায়, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। আলাপ শুরু করে। সন্ন্যাসী ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার কথা বলেন না...বলেন ভারতবর্ষের কথা...তার রোগ, শোক, তাপ, দুর্বলতার কথা। বলেন বিশ্বজগতে ভারতবর্ষের স্থানের কথা। যৌবনের নব-জাগরণের কথা। ধর্মধ্বজীদের ধ্বংসের কথা। তাদের ভাল লাগে। নতুন ধরনের সন্ন্যাসী।

তাদের বাড়িতে সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। সন্ন্যাসীর মুখে শোনে, বাঙলার এক নগণ্য গ্রামে এক নতুন মানুষের আবির্ভাবের কথা...তিনি নিজের জীবনে জগতের প্রচলিত সমস্ত ধর্মাচারের অনুষ্ঠান করে প্রমাণিত করে গিয়েছেন যে সব পথই এক চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছিয়েছে ; বিরোধ কোথাও নেই। বিশুদ্ধ কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মকে বরণ করতে হবে। সে ধর্ম মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় আবদ্ধ নয়, সে ধর্ম মানবতার কল্যাণে...সে ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ কোন বিশেষ মতবাদ নয়...সে ধর্ম প্রতিদিনের একান্ত-প্রয়োজনীয় বস্তু...তাকে প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া এবং নেওয়া যায়। সর্ব-মানবের কল্যাণকামী সেই নিরীহ ব্রাহ্মণ...তিনিই তাঁর গুরু।

তিনি জগতে কোন নতুন মন্দির, কোন নতুন ধর্মীয় দল প্রতিষ্ঠা করেন নি, তিনি শুধু তাঁর নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্ব-কল্যাণময়ীকে...সব তর্ক, সব যুক্তি, সব এতি-নেতির ঊর্ধ্বে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন সেই আদ্যাশক্তিকে এবং তাঁর মর্ত্যপ্রবাসের শেষলগ্নে তিনি তাঁর এই মানস-সন্তানকে অসীম করুণায় নব-সন্ন্যাসীর আদর্শে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। এই পরিব্রাজকের সমস্ত জীবনের, সমস্ত চেতনার নিয়ামক তিনি।

বিস্ময়ে তারা শোনে এই নতুন সন্ন্যাসীর কথা...গঙ্গাতীরবাসী বিশ্বজননীর সন্তান তাঁর গুরুর কথা। পুরোহিত-প্রপীড়িত, আচার-কণ্টকিত, ভেদ-বিক্ষুব্ধ, মুমূর্ষু ভারতে, বিস্মিত হয়ে শোনে তারা সন্ন্যাসীর নব-ধর্ম-বিপ্লবের পরিকল্পনার কথা।

তরুণকে আকর্ষণ করেন সন্ন্যাসী।

প্রাচীন রুখে আসে পুঁথি হাতে করে।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের মহলে। অর্বাচীন ইংরেজী শিক্ষিত সন্ন্যাসীর সমাজ-ধ্বংসের আস্ফালন। দক্ষিণদেশের। ছুঁৎ-মার্গী ব্রাহ্মণত্বের দুর্গে সাড়া পড়ে যায়। সে দেশে তখন নীচ জাতি সভয়ে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায়, পাছে তার অশুচি ছায়া ব্রাহ্মণের শুচিতাকে ছায়াস্পর্শে কলুষিত করে দেয়।

প্রতিনিধিস্বরূপ একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত তরুণ সন্ন্যাসীকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহবান করেন। দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে পণ্ডিত বুঝতে পারেন, তরুণ সন্ন্যাসী শুধু ইংরেজীই জানেন না, দেবভাষায়ও তাঁর মত পারদর্শী। সমুদ্রযাত্রার বৈধতা নিয়ে পণ্ডিত তর্ক তোলেন। সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় উক্তি দিয়েই পণ্ডিতকে জখম করেন। বলেন, এ আজ একান্ত নিষ্প্রয়োজন...আজ যে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে হবে, তা আরও বিশাল, আরও গভীর...মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনার মহাসমুদ্র...

পণ্ডিত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন...হুংকার দিয়ে বলেন, কদাপি ন কদাপি ন!

সে হুংকারে ভ্রূক্ষেপ না করে তরুণ সন্ন্যাসী বলেন, শাস্ত্রের নাম নিয়ে যে জাতি-ভেদের প্রশ্রয়ে আজ মানুষকে আমরা মানুষের স্তর থেকে নামিয়ে, নীচ জাতি বলে সমাজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছি, আজ ভারতের উচ্চবর্ণের লোকদেরই এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে তাদের টেনে তুলতে হবে, নিজেদের হাতে ভেঙে ফেলতে হবে এই সব মানুষে-মানুষে তফাত-করা পাঁচিল...পুড়িয়ে ফেলতে

হবে পুষ্পে-মাল্যে-চন্দনে পুজো করে চলেছি যে সব সামাজিক অনাচার আর অতীতের জঞ্জাল...বর্ণজ্ঞানহীন পৈতাধারীদের মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে টেনে ফেলে দিতে হবে সমুদ্রের জলে...

হুংকার দিয়ে ওঠেন পণ্ডিত, কদাপি ন, কদাপি ন...

পরিব্রাজক আবার চলতে আরম্ভ করেন...অন্তরের মধ্যে দুরন্ত কর্ম-স্পৃহার তরঙ্গতট ভেঙে আছড়ে পড়ে...কিন্তু কোন কাজই তিনি করবেন না, যতক্ষণ না তাঁর যিনি নিয়ামক তাঁর কাছ থেকে স্পষ্ট কোন নির্দেশ পান।

তিনি দেখেছেন এই মুমূর্ষু ভারতে আজ কি বৃহৎ কর্ম-উন্মাদনার প্রয়োজন, তিনি উপলব্ধি করেছেন, আজ ভারতের এই ভগ্নচক্র পঙ্গু রথকে চালাতে কি পর্বতপ্রমাণ শক্তির প্রয়োজন...তিনি একা...কতটুকুই বা তাঁর শক্তি? তাঁর এই ছোট প্রদীপের আলোয় এই মহাদেশ জোড়া অন্ধকার কী করে আলোকিত করে তুলবেন? তাই যে আলোর একটি কণামাত্র তিনি বহন করে চলেছেন, সেই আলোর আলোকেই আকর্ষণ করে আনতে হবে আগে, সেই আলোক-নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই দীপ-শিখা এমনি থাকবে অপেক্ষা করে। হে আলোর আলো, দেখা দাও, হে গুরু, বলে দাও তোমার সন্তানকে, কী তার লক্ষ্য, কোথায় তার পথ?

অন্তরে বহন করে গর্জমান সমুদ্র। পরিব্রাজক এগিয়ে চলেন...

হঠাৎ পথে একদিন দেখা হয়ে গেল একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য। ভদ্রলোক বলেন, তাঁর সঙ্গে তিনিও হেঁটে যাবেন। পরিব্রাজক আপত্তি করেন না...

মাদ্রাজে উপস্থিত হতে না হতে একদল তরুণ যুবা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। যেন তাঁরই জন্যেই তারা অপেক্ষা করে ছিল। তারা বলে, আমরা প্রস্তুত...আমরা হব আপনার শিষ্য...মৃত্যুপণ করে পালন করবো আপনার নির্দেশ।

দেখতে দেখতে আরো এসে জোটে তরুণের দল। চোখে মুখে তাদের নতুন আলো।

পরিব্রাজকের মন আনন্দে দুলে ওঠে। একি তোমারই ইঙ্গিত! তোমার আসার পূর্বাভাস!

কয়েক মাস আগে, জুনাগড় কিংবা পোরবন্দরের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় পরিব্রাজক সর্বপ্রথম শুনতে পান, আমেরিকার চিকাগো শহরে জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিরাট এক বিশ্বসভার আয়োজন হচ্ছে। সে সভায় সব ধর্মই আমন্ত্রিত হয়েছে, হয় নি শুধু হিন্দুধর্ম। সেই সংবাদ শোনার পর থেকেই সন্ন্যাসীর মনে তীব্র বাসনা জেগে ওঠে, অনাহূত তিনি যাবেন সেই দেশে, বিশ্ববাসীকে ডেকে শোনাবেন হিন্দুধর্মের কথা, ভারতের কথা, ভারতবাসীর কথা...শতাব্দীর লাঞ্ছনা আর অপপ্রচারের সমাধি থেকে নবজীবন দান করবেন ভারতের মহিমাকে। বিশ্বচিত্তে প্রতিষ্ঠা করবেন বিশ্বের কল্যাণ-মন্ত্র, যা বিধৃত হয়ে আছে একমাত্র ভারত-সাধনায়।

সমস্ত পরিভ্রমণের মধ্যে সন্ন্যাসী ভোলেন নি সে কথা। তাঁর সমস্ত চিন্তার

মধ্যে সেই এক চিন্তা সর্বদাই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া সেই চরম দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি অগ্রসর হবেন না। তাই বাইরে তার কোন আয়োজনের কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি, এমন কি তা নিয়ে বিশেষ কারুর সঙ্গে আলোচনাও করতেন না। চিকাগোর সেই বিশ্বসভায় যোগদান করার ব্যাপারকে তিনি একটা বিশ্ব-বিধান বলেই গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সে অনুমান ভুল হয় নি। শুধু জাহাজে করে ভারতবর্ষ থেকে চিকাগো যাওয়া নয়, এই যাওয়ার পেছনে ছিল একটা দুর্বার দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা, নতুন পৃথিবীতে নতুন করে ভারতবর্ষের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করা। পুরাকালে সেকেন্দার শাহ্ বা সীজার যেমন বেরিয়েছিলেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রীস অথবা রোমের রাজশক্তিকে বিশ্বব্যাপ্ত করবার জন্যে, তেমনিধারা এক বিশ্ব-বিজয়িনী বিরাট বাসনা সন্ন্যাসীর অন্তরে জেগে ওঠে, তবে সেকেন্দার-সীজারের মত তিনি যাবেন না সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে রাজ্যজয় করতে, তিনি যাবেন শাশ্বত ভারতের প্রতিনিধিরূপে একা, সঙ্গে নিয়ে গুরুকৃপালব্ধ ভারতের অদ্বৈত-জ্ঞান, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে আত্ম-জ্ঞানের বিদ্যা জগতের সকল জাতির সকল লোক ভারতবর্ষের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারে। তাই তিনি জানতেন, এই দুঃসাহসিক অভিযানের পেছনে কি মহা দায়িত্ব আছে, কি গুরু কর্তব্যভার তিনি নিজের স্কন্ধে নিতে চলেছেন। সমস্ত বিশ্বধারার মধ্যে তাঁর এ অভিযান আলোড়ন আনবে, যদি তাই অভিপ্রেত হয় বিশ্ব-নিয়ামকের, তবে তিনি কেন চঞ্চল হবেন? সেই বিশ্ব-বিধায়কই তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যাবে সেই বিশ্ব-কেন্দ্রে। তাই তিনি অপেক্ষা করে আছেন, সেই মঙ্গল-হস্তের স্পর্শের জন্যে।

সন্ন্যাসীর অন্তরের সেই বিশ্ব-বিজয়িনী ভাবনার কথা বাইরে তখন কেউ জানতো না। তাই মাদ্রাজের সেই তরুণ ভক্তরা যখন তাঁর মুখে চিকাগোর ধর্মসভার কথা শুনলো, তারা সকলেই একবাক্যে তাঁকে অনুরোধ জানালো, তাঁকে যেতেই হবে, তারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে দেবে।

তাদের সেই উৎসাহ আর আগ্রহের মধ্যে সন্ন্যাসী নির্বাক আনন্দে উপলব্ধি করেন, তাঁর ঈপ্সিত আদেশের আভাস। কিন্তু তা আভাস মাত্র, চাই স্পষ্ট নির্দেশ, প্রত্যক্ষ দর্শন। গণ্ডূষ জলে তৃপ্ত হয় না অগস্ত্য-তৃষা।

তাই তরুণ ভক্তদের যখন চাঁদা সংগ্রহে নিষেধ করলেন তারা বুঝতে পারলো না। কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু জানতেও পারে না তারা। তাদের আগ্রহ কিন্তু প্রতিদিনই বেড়ে চলে। প্রতিদিনই কোথা থেকে দলে দলে লোক আসে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। অবাক্ হয়ে যায় তারা, প্রশ্ন যতই দুরূহ হোক্, সন্ন্যাসী অবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ সেই প্রশ্নের জবাব দেন, যেন পূর্বাহ্ণে সে-সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। দর্শন, শাস্ত্র, ইতিহাস থেকে শুরু করে যার যা কৌতূহল তাই প্রশ্ন করে, অনায়াস উত্তর শুনে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়, এই তরুণ কোথা থেকে এই পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন? উত্তরের মধ্যে কোন জড়তা নেই, কোন দ্বিধা নেই, এড়িয়ে যাবার কোন সূক্ষ্ম চালাকি নেই, স্পষ্ট, বলিষ্ঠ, আত্মোপলব্ধির মুক্তাস্বচ্ছ

সত্যের দীপ্তি...ভাষা নয় যেন বেগবান নদী, কথা নয় যেন প্রাণের বাঙ্ময় প্রকাশ। শাস্ত্র, সূক্ত, সূত্র সন্ন্যাসীর উক্তিতে যেন নির্জীব অক্ষরের সীমা উল্লঙ্ঘন করে প্রাণময় বিদ্যুৎ-শক্তি হয়ে ওঠে। মানুষের কণ্ঠস্বরে, মানবের ভাষায় যে এতখানি শক্তি থাকে, আগে তারা তা জানতো না। মাঝে মাঝে রাত্রি-নির্জনে সন্ন্যাসী আপনার মনে গান গেয়ে ওঠেন। গানের ভাষা বুঝতে না পারলেও, সন্ন্যাসীর অপূর্ব কণ্ঠস্বরে তারা যেন সম্মোহিত হয়ে যায়। শুরু হয় দিগ্বিজয়ের পালা।

সকলের চেয়ে ভক্তদের আকর্ষণ করে সন্ন্যাসীর সুডৌল মন...কোন একটি বিশেষ শ্রেণীতে তাকে নির্দিষ্ট করে রাখা যায় না। যখন যেদিকে খুশি অনায়াসে সন্ন্যাসী তাকে পরিচালনা করছেন। কখনও বজ্রগম্ভীর, কখনও তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ, আবার তার পরমুহূর্তে বন্ধুর হাসির মত মধুর, শিশুর মত কোমল, স্বচ্ছ। হাসিতে, আলাপে, রসিকতায় নিমেষে সন্ন্যাসী নব-পরিচিতকে অন্তরঙ্গ করে নেন। কথায় কথায় রসিকতা গৈরিক-রাঙা গাম্ভীর্যের শিলাগাত্রে যেন সদ্যফোটা রঙিন বনফুল। সকলের মধ্যে, কিন্তু সকল থেকে আলাদা, স্বাভাবিক ভাবেই যেন সকলের ওপরে।

সারাদিন চলে আলাপ, আলোচনা। বেদান্তের ব্যাখ্যা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সন্ন্যাসীর বিরক্তি নেই। একজন জিজ্ঞাসা করে, স্বামীজী, যারা বেদান্তের জন্ম দিল সেই হিন্দু কী করে আবার পৌত্তলিক রয়ে গেল? মূর্তির কথা তারা ভাবতে পারে কী করে?

সন্ন্যাসী উত্তর দেন, অমর উক্তি, Because we have the Himalayas! ভারতের ভূগোলের সঙ্গে তার মানসিক গঠনের ইতিহাসের মর্মকথা পরিব্রাজক পাণিনির সূত্রের মত একটি কথায় ফুটিয়ে তোলেন। প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী আর সুবিশাল গাম্ভীর্যের মধ্যে হিন্দুমন মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত লালিতপালিত হয়েছে। প্রকৃতি তার কাছে জড় পটভূমি নয়, প্রকৃতি তার কাছে জীবন্ত সত্ত্বা, তার মনের জন্মভূমি।

জনতার অবিচ্ছেদ আক্রমণের হাত থেকে আত্মহত্যা করবার জন্যে পরিব্রাজক মাঝে মাঝে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের তীর ধরে হেঁটে বেড়ান। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রতীরবর্তী জেলেদের পল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখেন, সেই রাত্রির অন্ধকারে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় জেলেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একবুক জলে মাছ ধরছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। বস্ত্রহীন নগ্নদেহ কঙ্কালসার শীতার্ত সেইসব শিশুদের দেখে সন্ন্যাসীর অন্তরে দেশজোড়া হাহাকারের ঢেউ উদ্বেল হয়ে ওঠে। নিশিদিন শুধু সেই এক চিন্তা তাঁর দেহ-মনকে বিষকীটের মত দংশন করে চলেছে, এই ভারতজোড়া দুঃখ-দৈন্য কী করে দূর করা যায়, কী করে এই কোটি কোটি মানুষের নিঃশব্দ ক্রমিক অপমৃত্যুকে নিবারণ করা যায়? তার জন্যে নিজের মুক্তির বাসনা পর্যন্ত তিনি গুরুর চরণে বিসর্জন দিয়েছেন। ধর্ম আজ নিরন্ন বস্ত্রহীন দরিদ্র ভারতবাসীর বেশে তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে।

তাঁর সঙ্গে যে দুজন তিনজন শিষ্য এসেছিল, হঠাৎ তারা সেই অন্ধকারে শোনে, রুদ্ধ ক্রন্দনের শব্দ। চেয়ে দেখে, সন্ন্যাসীর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে সন্ন্যাসী চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন, হে ভগবান! আর কত কাল, আর কত কাল এই দৃশ্য নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবো?

সেই প্রস্তর-কঠিন পুরুষসিংহের দুচোখে জল দেখে শিষ্যরা কাতর হয়ে পড়ে। আপনা থেকে তাদেরও চোখে জল দেখা দেয়। ভাবে, কী আছে ওই আগ্নেয়গিরির অন্তরে?

ক্রমশঃ মাদ্রাজের শিক্ষিত মহলে, অভিজাত মহলে সন্ন্যাসীর সংবাদ গিয়ে পৌঁছয়। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান, উপহাস বা প্রশংসা, যাই তাঁরা করুন না কেন, সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে তাঁরা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারেন না। অবশেষে একদিন সমাজের বিশিষ্ট নেতা আর পণ্ডিতেরা দল বেঁধে এসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে বসলেন। প্রত্যক্ষভাবে সন্ন্যাসীকে তাঁরা পরীক্ষা করবেন। আবার সেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সন্ন্যাসী একে একে তৎক্ষণাৎ সব প্রশ্নেরই উত্তর দেন। উত্তরের অভিনবত্বে তাঁরা চমৎকৃত হয়ে যান। সন্ন্যাসীর মুখে তাঁরা নতুন করে শোনেন, ভারতের অদ্বৈতবাদের সার্বজনীনতার কথা। এই ভারতবর্ষই মানব-মনের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যে এমন এক বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার করেছিল, যা অঙ্ক-শাস্ত্রের মত অভ্রান্ত এবং যা জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলে গ্রহণ করতে পারে। এবং এই অদ্বৈতজ্ঞানই হলো হিন্দুধর্মের মূল কথা। আত্মদম্ভে পাশ্চাত্ত্যজগৎ হিন্দুমনের সেই বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তির ধারা বুঝতে না পেরে তাকে পৌত্তলিক নাম দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং ইওরোপের পণ্ডিতদের দেখাদেখি আমরাও ভারতবর্ষে ক্রমশঃ তাদের সেই অপপ্রচারে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের অর্জিত বিদ্যা নিজেরাই ভুলতে বসেছি। সন্ন্যাসী বলেন, ভারত-সভ্যতার এই অপমৃত্যু আজ রোধ করতে হবে।

পণ্ডিতদের মধ্যে সহসা একজন বলে ওঠেন—কিন্তু স্বামীজী, আপনি অদ্বৈত-বাদী...আপনি বলছেন, আপনিই ঈশ্বর। এই বোধ যদি মানুষের হয়, তাহলে পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ তো চলে যাবে...অন্যায়ের পথ থেকে রোধ করবার তখন আর কিছুই থাকবে না।

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেন,—যেদিন সত্যি সত্যি আপনার সে বোধ আসবে যে, সোঽহং...সেদিন আর আপনার অন্যায় করবার কোন প্রেরণাই আসবে না!

শুধু পুঁথি-পাঠের মধ্য দিয়ে নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে অর্জন করতে হবে সেই বোধ এবং আমার গুরু এই অবিশ্বাসী যুগে প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন যে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এক আর একে দুই যেমন সত্য, এ-ও ঠিক তেমনি সত্য। আমি এই আপনাদের সামনে বসে, আমি বলছি, আমি পেয়েছি সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা...আমি দেখেছি, সকল দর্শনের অতীত বলে যাঁকে আপনারা মনে করেন!

সন্ন্যাসীর মুখ যেন দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তরের সমস্ত দিব্য

বিভা যেন জীবন্ত হয়ে বাইরে সমগ্র দেহে মূর্তি ধারণ করে। সন্দেহ নিয়ে যারা এসেছিল, আনন্দ নিয়ে তারা ফিরে যায়।

এগিয়ে চলে দিগ্বিজয়ীর রথ...

কোথা থেকে আসে মধু-সন্ধানী ভ্রমরের মত, তরুণের দল...

সন্ন্যাসী তাদের মুখের দিকে চেয়ে যেন কোন্ আলোক-ইঙ্গিতের আভাস দেখতে পান। যে মহা দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করেছেন, বাইরে এই নবজাগ্রত জনতার উৎসাহের মধ্যে নব-আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ শিষ্যদের আগ্রহে যেন তার সমর্থন দেখতে পান। মাদ্রাজের তরুণের দল, তাদেরই গৌরব তারা সর্বপ্রথম এই বিরাট ব্যক্তিত্বকে অন্তরের নেতা বলে গ্রহণ করেছিল। তারা বুঝতে পারে আগামী যুগের অধিনায়ক এই সন্ন্যাসীর বেশে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তারা প্রতিদিনের অন্তরঙ্গতার সুযোগে সেই অপরূপ সন্ন্যাসীর দেহ ও মনের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। সেই সুগঠিত লৌহদৃঢ় দেহ, প্রত্যেকটি অঙ্গ নিয়মিত ব্যায়ামে পরিপুষ্ট...লোক মুখে মুখে তাঁর নতুন নামকরণ হয়ে যায়—পালোয়ান সন্ন্যাসী। সেই লৌহদেহের অন্তরালে আরও বিস্ময়কর লাগে, তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান-সমৃদ্ধ অন্তর। ঋগ্‌বেদ থেকে রঘুবংশ, পতঞ্জলি থেকে কালিদাস, বেদান্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে ইওরোপের ক্যাণ্ট, হেগেলের প্রতিটি মীমাংসা, জগতের ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায় থেকে বৈজ্ঞানিক ইওরোপের আধুনিক ল্যাবরেটরির শেষ সংবাদ...তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান-দর্পণে যেন বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার ছায়া অনায়াসে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। জ্ঞানের জগতের কোন প্রশ্নই সন্ন্যাসীর কাছে অপরিচিত নয়। বিশ্ব-সভায় এই তো ভারতের যোগ্য প্রতিনিধি!

শিষ্যরা উৎসাহের আধিক্যে নিজেরাই চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করে দেয়। বিশ্বের রাজদরবারে ভারতবর্ষ আজ অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনার অপঘাতে অন্ধকারে বিলীন হতে চলেছে, আজ সেখানে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভারতবর্ষের মহিমাকে। এবং তার উপযুক্ত ব্যক্তি এই সন্ন্যাসী। এই দুঃসাহসিক অভিযানে যে অর্থের প্রয়োজন, তা তারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তুলবে। প্রথম দফায় তারা এইভাবে পাঁচশো টাকা তুলে একদিন সন্ন্যাসী গুরুর হাতে দিল।

তাদের এই আগ্রহে তরুণ গুরু আনন্দিতই হন কিন্তু সে অর্থ তিনি এখনও গ্রহণ করবেন না। শিষ্যেরা ক্ষুব্ধ হয়, বুঝতে পারে না। তাঁর মুখ থেকেই তো তারা শুনেছে, আমেরিকার বিশ্ব-সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার আকাঙ্ক্ষার কথা।

ক্ষুব্ধ শিষ্যদের বুঝিয়ে সন্ন্যাসী বলেন,—বন্ধু, আমাকে বুঝতে দাও, এ শুধু আমার নিজের আগ্রহ, নিজের উৎসাহ নয়! এ যদি বিশ্বজননীর বিধান না হয়, এর পেছনে যদি ব্যক্তিগত বাসনা ছাড়া আর কোন গভীরতর বৃহত্তর সার্থকতা না থাকে, তাহলে এ যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগত বাসনার বাইরে সেই বিশ্ব-বিধানকে আমি উপলব্ধি করতে চাই...আমি স্পষ্ট অনুভব করতে চাই, এই যন্ত্রের ওপর এসে

পড়েছে সেই বিশ্ব-মায়ের লীলাঙ্গুরির স্পর্শ...যদি তাঁর প্রয়োজন হয়, তিনিই তার আয়োজন করে দেবেন! তাঁকে নিতে হবে!

আনন্দে গর্বে শিষ্যেরা সেই অপরূপ অভিব্যক্তির দিকে চেয়ে থাকে। এভাবে ঘটনাকে দেখা, এভাবে ঘটনার ধারাকে উপলব্ধি করা, তাদের বুঝিয়ে বলেন, তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন, এই একটি ঘটনার পেছনে রয়েছে এক সুবৃহৎ বিশ্ব-সম্ভাবনা। শুধু নিজের ব্যক্তিগত বাসনার ক্ষুদ্র পরিধি দিয়ে একে সীমাবদ্ধ করে দেখতে তিনি চান না। তাই সেই বিরাট সম্ভাবনার সার্থকতার আশায় তিনি অপেক্ষা করে আছেন, বিশ্ব-জননীর প্রত্যক্ষ অনুমোদনের জন্যে!

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি চলে যায় দূরে—বহু দূরে। ধ্যানের দিব্যবিভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর মুখ। স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলেন,—আমি ধ্যানে আকর্ষণ করে নিয়ে আসবো তাঁর সেই অনুমোদনকে। যদি বিশ্ব-জননীর ইচ্ছা হয় যে আমি যাব সেই সুদূর অপরিচিত জগতে, তবে তাঁকেই প্রমাণ করতে হবে আমার কাছে তাঁর সেই বাসনার কথা। আমাকে যদি তাঁর প্রয়োজন, তাঁকে বলতে হবে সে কথা আমাকে। তখন টাকাকড়ি, আয়োজন-ব্যবস্থা, আমি জানি আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

এই দুরন্ত প্রেম, যে প্রেম বলতে পারে,—আমি যে তোমাকে চাই শুধু সেইটেই সব নয়, তুমিও যে আমাকে চাও, সে-কথা বলতে হবে তোমাকে...তোমার মিলনের জন্যে আমি বসে আছি যেমন, আমার মিলনের জন্যেও তেমনি আসছো তুমি...এই দুরন্ত দুঃসাহসী প্রেম, যা ঋষিরা, যা ভারতের মহাকবিরা ছন্দে, সুরে, গাথায় গেয়ে গিয়েছেন, সেদিন আবার আমরা দেখলাম একটি মানুষের জীবনে, জীবনের মহাকাব্য-রূপে। ইতিহাসের রাজনীতির বাইরে আমরা বারে বারে দেখেছি জীবনের এই মধুর কাব্য-রূপে...এই মর্ত্য পৃথিবীতে জীবন্ত স্বর্গখণ্ড। আয়ত্ত বিজ্ঞানের বাইরে রয়েছে যে জীবন-রহস্য-সিন্ধু, তারই ক্বচিৎ চকিত প্রয়াস।

তাই সন্ন্যাসী সেই সংগৃহীত টাকা, শিষ্যদের বলেন, দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। বিনা বাক্যব্যয়ে শিষ্যরা গুরুর ইচ্ছানুযায়ী সেই টাকা দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। সন্ন্যাসীর মন থেকে যেন একটা ভার নেমে যায়। বিস্মিত শিষ্যরা অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে, জীবনধারণ করার সেই অভিনব শিল্পের দিকে। জীবনধারণ করা যে সুমহান্ একটা শিল্প, ভারতবর্ষ বহুদিন আগে তা প্রমাণ করেছিল। সন্ন্যাসীর জীবনে আমরা দেখি, সেই জীবন-শিল্পেরই অভিনব প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনের গায়ে কোথা থেকে এসে পড়ে চিরদিনের এক রহস্যময় আলো।

জ্ঞান-জীবী বৈদান্তিক অন্তরের দিক থেকে আবার ফিরে যায় সেই দক্ষিণেশ্বরে আদ্যশক্তির মন্দির-প্রাঙ্গণে...জ্ঞানহীন শিশুর মত আকুল আবেগে শুধু খোঁজে কখন আসবেন জননী, কানে এসে লাগবে তাঁর পায়ের শব্দ। এই সময় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা বলেন, অধিকাংশ সময়ই তিনি গভীর ধ্যানে কাটাতেন। ধ্যানের আসনে দিনরাত্রি কোথা থেকে অতিবাহিত হয়ে যেতো। বাইরে শিষ্যদের সঙ্গে,

সর্বদা যেন কী এক আচ্ছন্নভাবে থাকতেন। সন্ন্যাসী তখন আর এক জগতের অধিবাসী। মাতৃ-আগমন-প্রতীক্ষা-কাতর শিশু!

কিছুদিন পরে হঠাৎ এই সময় হায়দ্রাবাদ থেকে একদল লোক কাতর হয়ে তাঁর কাছে আবেদন জানালো, হায়দ্রাবাদে তাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তাঁকে আসতে হবে। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। কোন্ দিক থেকে যে কখন আসে চরম আহ্বান!

নিজাম বাহাদুরের এঞ্জিনীয়ার তখন একজন বাঙালী—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। পরম আগ্রহে তিনি সন্ন্যাসীকে তাঁর বাড়িতেই আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। স্টেশনে নামতেই সন্ন্যাসী অবাক হয়ে দেখেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বিপুল জনতা সমবেত হয়েছে এবং সে জনতার মধ্যে নিজাম রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন, হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই। রাজা, মহারাজা, নবাব, নবাবজাদা থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের বড় বড় শেঠেরা সকলেই এসেছেন...ফুলে আর মালায় সন্ন্যাসীর দেহ ঢাকা পড়ে যায়। হায়দ্রাবাদে এর পূর্বে এমনভাবে আর কাউকে অভ্যর্থনা জানান হয় নি।

পরের দিন সেকেন্দ্রাবাদের একশোজন বিশিষ্ট নাগরিক, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এক একটি উপঢৌকন নিয়ে সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে এলেন এবং তাঁদের সকলের অনুরোধ, মেহবুব কলেজ-প্রাঙ্গণে তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে। সন্ন্যাসী সম্মত হলেন। সন্ধ্যা-বেলায় নিজাম বাহাদুরের শ্যালক, হায়দ্রাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবাব বাহাদুর স্যার খুরশিদ জাহ্ আমির-ই-কবীর, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে সবিনয়ে সন্ন্যাসীকে তাঁর প্রাসাদে পদার্পণ করবার আমন্ত্রণ জানালেন। গৃহস্বামীর কাছ থেকে সন্ন্যাসী নবাব বাহাদুরের পাণ্ডিত্য এবং অন্তরের উদারতার কথা শুনেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে নবাব বাহাদুর নিষ্ঠাবান হিন্দুর মত হিন্দুর প্রত্যেক তীর্থস্থান পরিদর্শন করেছেন।

পরম সমাদরে নবাব বাহাদুর সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করলেন এবং বেদান্ত সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলোচনা হলো। বেদান্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি নবাব বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে জানালেন যে, হিন্দুর সমস্ত ধর্মানুশীলনের সারকথা হলো এই বেদান্ত ধর্ম। অন্য যে সব ধর্ম জগতে প্রচলিত আছে, প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন মানুষের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত...খ্রীষ্টান ধর্ম যীশুর সঙ্গে, বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধদেবের সঙ্গে, ইসলাম ধর্ম হজরত মহম্মদের সঙ্গে কিন্তু বেদান্ত ধর্মের সঙ্গে কোন ব্যক্তিবিশেষের কোন যোগ নেই। বিশ্ব-মানবের প্রয়োজনে এই ধর্মের অভিব্যক্তি হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে ভগবৎ-অস্তিত্ব আছে, মানুষের মধ্যে যে ঐশীশক্তি আছে, সেই শক্তিকে আয়ত্ত করাই হলো, বেদান্তের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তার কাছে কোন মন্দির নেই, কোন মসজিদ নেই, দেবদেবীর অধিনায়কত্ব নেই, শুধু মানুষ আর তার মন।

যে অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মন এই পরমা ঐশীশক্তি অর্জন করতে পারে, তার নামই যোগ-সাধনা এবং এই যোগ-সাধনাই হলো বেদান্ত ধর্মের ভিত্তি। এবং

অঙ্কশাস্ত্র যেমন বৈজ্ঞানিক, তেমনি বৈজ্ঞানিক পন্থার ওপর যোগ-সাধনার প্রত্যেক স্তর নির্ভর করে আছে। যে কোন ধর্মের, যে কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের লোক এই ধর্ম অনুশীলন করতে পারে। কারণ, তার মধ্যে কোন তুচ্ছ আচারগত বা মতগত ভেদের প্রাচীর নেই। মানবের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এই মর্ত্যদেহে অমৃতত্ব অর্জন করা, বহু অনুশীলনের পর, বহু পরীক্ষার পর, সাধনার পর, হিন্দু ঋষিরা এই সার্বজনীন কল্যাণধর্ম আবিষ্কার করেছেন। তাই প্রচলিত কোন ধর্ম-মতের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই, কারণ তাঁর গুরু তাঁর নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বিভিন্ন ধর্মমত অনুযায়ী সাধনা করে এই মহাসত্য উপলব্ধি করেছেন যে, প্রত্যেক পথই এক লক্ষ্যে গিয়ে পেঁছয়, বিরোধ কোথাও নেই। এই মহাসত্য জগতে প্রচার করবার দায়িত্ব তিনি তাঁর ওপর দিয়ে গিয়েছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি আমেরিকার বিশ্বসভাতে যেতে চান।

সন্ন্যাসীর কথায় নবাব বাহাদুর বিমুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করলেন,—স্বামীজী, আপনার এই অভিযানে যৎকিঞ্চিৎ আমি দিতে চাই...গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন! এই বলে নবাব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ এক হাজার টাকার একটা তোড়া তাঁকে উপহার দেবার জন্যে নিয়ে এলেন।

কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন, সন্ন্যাসী সে টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন,—প্রয়োজন যখন হবে, নিশ্চয়ই তখন আপনাকে জানাবো।

নবাব বাহাদুর সে প্রত্যাখ্যানের অর্থ বুঝতে পারেন না। সন্ন্যাসী সে প্রত্যাখ্যানের আড়ালে অবশ্যই গ্রহণ করলেন কিছু টাকার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান তাঁর কাছে যে জিনিস। বিশ্ব-জননীর নির্দেশ। ধীরে ধীরে একটির পর একটি ঘটনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে বিশ্ব-জননীর অনুমোদন। চারদিকের অযাচিত উৎসাহে আর অনুকূল্যে সন্ন্যাসীর অন্তরে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে বিধি-নির্দেশ।

তার পরের দিন। হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী স্যার আশমান্ জাহ্, পেশকার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, সঙ্গে নিজাম-দরবারের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নায়কেরা সন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ করে অকুণ্ঠভাবে তাঁদের সাহায্যদানের বাসনা জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণে মেহবুব কলেজে স্বামীজী তাঁর নির্দিষ্ট বক্তৃতা প্রদান করলেন—'পাশ্চাত্ত্য জগতে আমার অভিযান'—তাঁর বিশ্ব-পরিভ্রমণ বাসনার প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা। সভার শেষে বেগমবাজারের বিখ্যাত ধন-কুবেররা শেঠ মতিলালের অধিনায়কত্বে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্ন্যাসী তাঁদের কাছ থেকেও কোন অর্থ নিলেন না কিন্তু তাঁদের অঙ্গীকারে পরম আনন্দিত হলেন। যার প্রয়োজন, আয়োজন সে-ই কি এনে দিচ্ছে না? পরের দিন পুণা শহর থেকে এলো এক জরুরী টেলিগ্রাম। সেখানকার প্রধান নাগরিকেরা সকলে স্বাক্ষর দিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি উত্তরে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, যদিও সেই মুহূর্তে তাঁদের আমন্ত্রণে সেখানে যাওয়া তাঁর সম্ভব হলো না।

হায়দ্রাবাদ থেকে আবার মাদ্রাজ স্টেশনে যখন নামলেন, দেখেন জনসমুদ্র...কর্ণ বধির করে ওঠে জয়োল্লাস। পুষ্প-মাল্য-চন্দন হাতে বিজয়লক্ষ্মী যেন তাঁর আগে

আগে চলে। দলে দলে তরুণেরা রাত্রিদিন তাঁকে ঘিরে তোলে কল-গুঞ্জন...সে উৎসাহে, সে আগ্রহে যেন ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে দেখা দেয় সন্ন্যাসীর যাত্রা-পথ। তবু উদ্বেল হয়ে থাকে সন্ন্যাসীর অন্তর। তরুণ শিষ্যদের অগ্রনায়করূপে আলাসিংগ পেরুমল দ্বারে দ্বারে বেরোয়, চাঁদা সংগ্রহের জন্যে। পেয়েছে তারা অনুমোদন গুরুর কাছ থেকে। সন্ন্যাসী তাদের ডেকে বলেন,—যদি বিশ্ব-জননীর নির্দেশ পাই, তাহলে আমি যাদের প্রতিনিধি হয়ে যাবো আমেরিকায়, আমি তাদের কাছ থেকেই ভিক্ষা নিতে চাই...ধনীদের কাছ থেকে নয়। জাতির যারা সাধারণ, যারা মধ্যবিত্ত, আমি চাই তাদেরই আশীর্বাদ। আমি যাবো ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে, আমি আজ তাই চাই তাদেরই অনুমোদন।

শিষ্যদের নিত্য অনুরোধ আর ক্রমবর্ধমান উৎসাহের উত্তাপের মধ্যে সন্ন্যাসী ভগবৎ-নির্দেশের ইঙ্গিত পেলেও, অন্তরের অন্তরতম স্থলে তখনও পর্যন্ত তিনি যাত্রা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারেন নি। বাইরের সকল আলোড়নের মধ্যে সন্ন্যাসী এই সময় ধ্যানের স্বতন্ত্র জগতে অষ্টপ্রহর বাস করতেন। গভীর ধ্যানের মধ্যে তিনি এই বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানের শক্তি সন্ধানে ছিলেন। যতই সভার দিন এগিয়ে আসতে লাগলো, সন্ন্যাসীর অন্তর ততই উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগলো। সহসা একদিন সন্ন্যাসী জাগরণ আর তন্দ্রার অর্ধ-অচেতন জগতে অন্তরের ঈপ্সিত ইঙ্গিতের পূর্ণ দর্শন পেলেন। তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সমুদ্রতীর থেকে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে, তাঁকে অনুসরণ করবার জন্যে ইঙ্গিতে আহ্বান করলেন। সন্ন্যাসী দেখেন গুরুর দৃষ্টি সমুদ্রের ওপারে নিবদ্ধ...তাঁকে অনুসরণ করতে বলে ঠাকুর ধীরে সমুদ্র-জলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই অর্ধ-অচেতন অবস্থা থেকে সন্ন্যাসী মহানন্দে জেগে উঠলেন। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেন, এতদিন ধরে অন্তরে চলেছিল যে তুমুল দ্বন্দ্ব, সহসা যেন তা শান্ত হয়ে গিয়েছে, অন্তর আপ্লুত করে উঠছে আনন্দময় এক দিব্য-শক্তির তরঙ্গ, সমস্ত চেতনা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠে নির্দেশ করছে,—যাত্রা কর, যাত্রা কর হে পথিক!

রোমাঞ্চিত দেহে নিত্য-লোকবাসী গুরুকে প্রণাম করে সন্ন্যাসী তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেন। আর কোন দ্বিধা নেই, কোন সন্দেহ নেই, তিনি যাবেন পশ্চিম-জগতে, মহাকালের নির্দেশ পালন করতে, নতুন করে জগতে ঘোষণা করতে, ভারতবর্ষ মরে নি, চির-অবিনশ্বর ভারতবর্ষ!

যেদিন বরানগরের মঠ ত্যাগ করে পরিব্রাজকের ব্রত গ্রহণ করেন, সেদিন স্বামীজী আগে জননী সারদা দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। আজ পশ্চিম-যাত্রার জন্যে যখন তিনি বদ্ধসংকল্প হলেন, তখন মনে পড়লো সেই জননীর কথাই। তাই মাতৃ-আশীর্বাদের জন্যে তিনি সারদা দেবীকে পত্র লিখে তাঁর অন্তরের কথা জানালেন। এবং তাঁর সংকল্পের কথা জানান। যতক্ষণ না সেই আকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ এলো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আয়োজনপর্ব স্থগিত রাখেন। মাতৃ-আশীর্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাত্রার জন্যে একেবারে পা বাড়ালেন।

বরানগর মঠ, গুরুভাইরা...কাউকেই কিছু জানালেন না। তিনি যে কোথায় তখন, অধিকাংশ গুরুভাইরা তা জানতেনও না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁরাও প্রত্যেকে তখন নিজের নিজের সাধনায় ভারতবর্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন। হিমালয়ে, বিন্ধ্যারণ্যে, দুর্গম দূর-নির্জনতায়।

এমন সময় হঠাৎ ক্ষেত্রীর মহারাজার দূতরূপে মুনশী জগমোহনলাল এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজার কাতর মিনতি, তাঁকে একবার দর্শন দিতেই হবে। স্বামীজী বলেন, জগমোহন, আমি যে যাত্রার জন্যে পা বাড়িয়েছি, ৩১শে মে, দিন পর্যন্ত স্থির করে ফেলেছি!

জগমোহন বলেন, অন্ততঃ এক দিনের জন্যেও আপনাকে যেতে হবে!

দু-বৎসর আগে যখন তিনি প্রথম ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে পরিচিত হন, সেই সময় অপুত্রক মহারাজা কাতরভাবে তাঁর কাছে পুত্র-কামনা নিবেদন করেন। স্বামীজী সাধারণতঃ কোন লৌকিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যোগশক্তি বা যোগফল প্রয়োগ করতেন না...তার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোকের কাছ থেকে তিনি লুকিয়ে চলতেন। কিন্তু ক্ষেত্রীর মহারাজার ভক্তি এবং কাতরতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুত্রবান্ হবার আশীর্বাদ করেন। স্বামীজীর সেই আশীর্বাদের ফলস্বরূপ মহারাজা পুত্রবান্ হয়েছেন এবং বিরাট ঘটা করে তিনি এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। স্বামীজীর উপস্থিতি না হলে, সে উৎসব মহারাজার কাছে ম্লান হয়ে যাবে।

জগমোহন বলেন,—মহারাজা আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার যাত্রার আয়োজনের জন্যে আপনাকে কোন চিন্তাই করতে হবে না, যা কিছু করবার সমস্তই তিনি করবেন!

অগত্যা স্বামীজী রাজী হন।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্ষেত্রীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সমগ্র শহর উৎসবে মত্ত। আলোকে, উৎসবে, নৃত্যে, গানে পথঘাট মুখরিত। রাজপুতানার বহু রাজ্যপতি মহারাজার অতিথিস্বরূপ এসেছেন এবং অতিথিদের নিয়ে মহারাজা তখন তাঁর বজরায় সন্ধ্যা-বিহার করছিলেন। মুনশী জগমোহন স্বামীজীকে নিয়ে সোজা বজরায় মহারাজার নিকট উপস্থিত হলেন। স্বামীজীকে দেখে মহারাজা সেই রাজন্যবর্গের সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন এবং পদতলে বসে রইলেন। স্বামীজী হাত ধরে তাঁকে সস্নেহে তুললেন। সেখানে কয়েকদিন বাস করবার পর, মহারাজা স্বয়ং স্বামীজীর সঙ্গে বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে জয়পুরের মহারাজার অনুরোধে তিনি একদিনের জন্যে বিলম্ব করলেন। স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে জয়পুরের মহারাজা তাঁর খাস দরবারে এক বিরাট জলসার আয়োজন করলেন। স্বামীজীকে নিয়ে সেই জলসায় যখন উপস্থিত হবেন, হলের দরজার সামনেই সহসা স্বামীজী থেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, ঘরের ভেতর এক সুবেশী নর্তকী নাচছে আর গান গাইছে। তিনি কুণ্ঠিতভাবে মহারাজাকে জানালেন, তিনি সন্ন্যাসী তিনি ওঘরে যেতে চান না। নামহীনা সেই নর্তকী যখন শুনলো যে, সন্ন্যাসী তারই জন্যে সে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন না, এক বিষম বেদনায় তার অন্তর



ভারত সমগ্র জগৎকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে—

দ্রষ্টা—স্বামী বিবেকানন্দ



কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না। ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা—

বক্তা—স্বামী বিবেকানন্দ

আলোড়িত হয়ে উঠলো। সন্ন্যাসীর প্রত্যুত্তরেই যেন নর্তকী, যে গান গাইছিল, তার পরিবর্তে অন্ধ সুরদাসের এক ভজন গেয়ে উঠলো।

হে প্রভু, শুনেছি, তোমার নাম সমদর্শী, তোমার কাছে নেই সাধারণ জগতের ভাল-মন্দের বিচার!

একটুকরো লোহা, মন্দিরে তাই দিয়ে তোমার মূর্তি গড়ে লোকে পূজা করে, সেই লোহার টুকরোই আবার কসাই-এর হাতে শাণিত ছুরিকারূপে দেখা দেয়।

কিন্তু পরশপাথরের সংস্পর্শে এলে, দুটোই হয়ে যায় সোনা, হে প্রভু, তুমি যে সেই পরশ-পাথর!

একি আমি ভুল জেনেছি? একথা তবে কি মিথ্যা!

সন্ন্যাসীর কানে সংগীতের সেই ভাষা এসে পেঁছতেই সন্ন্যাসী যেন ভেতর থেকে চমকে ওঠেন। একি! তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী! এখনও তাঁর মনের কোণে সূক্ষ্ম আকারে রয়েছে ভেদাভেদ জ্ঞান!

আজ নামহীনা এই নর্তকী গহন-গভীরে লুক্কায়িত তাঁর সেই ভ্রান্তিকে দিল ঘুচিয়ে। সেই মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি সানন্দে জলসাঘরে প্রবেশ করলেন। সেই নামহীনা নর্তকীর দান তিনি জীবনে ভোলেন নি।

পথে পথে রয়েছে অগণন গুরু...বাঙলার বাউল সাধকেরা যাঁদের বলেছেন, পথিক গুরু।

এই জয়পুরের রাজ-দরবারেই স্বামীজী মহারাজার অনুরোধে স্থায়িভাবে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় আত্মগুপ্তির জন্যে বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই মহারাজা অনুরোধ করলেন, স্বামীজী কোন্ নামে আপনাকে জগৎ জানবে, আমরাই বা কোন্ নামে আপনার পরিচয় পাবো, এই বিভিন্ন নামের মধ্যে একটাকে আপনি নিজেই স্থির করে দিন। সেদিন সেই জয়পুরের রাজদরবারে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দরূপে নিজেই স্থায়িভাবে নিজের নামকরণ করলেন।

বোম্বে যাবার পথে পড়লো আবু রোড স্টেশন। পরিব্রাজক অবস্থায় আবু পাহাড়ের নির্জন গুহায় তাঁর অনেক দিন, অনেক রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় রেলের একজন সামান্য কর্মচারী কয়েকদিন পরম আদরে তাঁকে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। সে কথা স্বামীজী ভোলেন নি। তাই আবু রোড স্টেশনে তিনি নেমে পড়লেন। অনুসন্ধান করে সেই কর্মচারীটির গৃহে অযাচিতভাবে এক রাত্রি যাপন করলেন।

পরের দিন কর্মচারীটি সাশ্রুনেত্রে তাঁকে ট্রেনের কামরায় তুলে দিতে এলো। গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গ ত্যাগ করতে তার যেন মর্ম ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এমন সময় রেলের এক সাহেব কর্মচারী টিকেট চেক করতে এসে তাকে কামরা থেকে নেমে যেতে আদেশ করলো। এই ব্যাপার নিয়ে কর্মচারীটির সঙ্গে সাহেবের তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। তখন বাধ্য হয়েই স্বামীজী কর্মচারীটির হয়ে সাহেবকে

অনুরোধ জানালেন। সামান্য সন্ন্যাসীর অনুরোধে ভ্রূক্ষেপ না করে লাল-চামড়া রুক্ষ মেজাজে গর্জে উঠলো, তুম্ কাহে বাত্ করতে হো?

সন্ন্যাসী রুদ্রমূর্তিতে সাহেবের মাতৃভাষাতেই ভর্ৎসনা করে উঠলেন,—তুম্ কাকে বলছো? কী করে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়, শেখ নি? বল "আপ"!

হঠাৎ গেরুয়ার ভেতর থেকে সেই কণ্ঠস্বর শুনে আর সেই ভঙ্গী দেখে সাহেববাচ্চা থতমত খেয়ে নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যে বলে উঠলো,—ক্ষমা করবেন...আমি হিন্দীভাষা ভাল জানি না...I only wanted this man...

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন,—তুমি তোমার নিজের মাতৃভাষাও জান না...this man নয়, বল this gentleman...

সাহেব বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি কামরা থেকে পালিয়ে বাঁচলো।

সন্ন্যাসী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন,—আমরা আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেছি বলে তারা যখন তখন আমাদের এইভাবে তাচ্ছিল্য করতে পারে। এই আত্মসম্মান-বোধ আজ আমাদের ফিরিয়ে আনতেই হবে...যে নিজেকে সম্মান দিতে ভুলে গিয়েছে, জগতে কেউ তাকে সম্মান দেবে না!

বোম্বেতে এসে দেখেন, ক্ষেত্রীর মহারাজার নির্দেশমত মুনশী জগমোহনলাল তাঁর জাহাজের সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। একটা টাকার তোড়া, জাহাজের প্রথম শ্রেণীর একখানি টিকিট স্বামীজীর হাতে দিয়ে তিনি প্রণাম করলেন।

পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্ট কোম্পানীর স্টীমার "পেনিনসুলার"...৩১শে মে, ১৮৯৩...

সমবেত শিষ্যদের অশ্রুজলের মধ্যে সন্ন্যাসী জাহাজে গিয়ে উঠলেন...

জাহাজ ছেড়ে দিল। স্বামীজী ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মাণ তীর-ভূমির দিকে চেয়ে আছেন...

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

ভারতের তটভূমি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসে...যতক্ষণ আলো থাকে তরুণ সন্ন্যাসী একদৃষ্টিতে সেই অপসৃয়মাণ তটরেখার দিকে চেয়ে থাকেন...

তারপর সমুদ্রের নীল জলে ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার...সন্ন্যাসী বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিজের অন্তরের দিকে নিবদ্ধ করেন...

আর এক মহাসিন্ধু, সেখানে তরঙ্গ-বাহু মেঘলোকের দিকে উত্তোলন করে গর্জন করে চলেছে...অশান্ত, উদ্বেল, অনিশ্চিত। অনুভব করেন, সেই আকাশ-অঙ্গনচুম্বী তরঙ্গের আক্ষেপের মধ্যে তাঁর সত্তা স্রোতবিতাড়িত ফুলের মত ভেসে চলেছে...

...শান্ত হও, হে চির-অশান্ত...গুরুর অলোক-অস্তিত্ব তোমাকে রয়েছে ঘিরে... তোমার সামনে দীপ-হাতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছেন বরাভয়া তোমার জননী... তোমার জাগ্রত চৈতন্যকে ঘিরে রয়েছে ভারতের যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত তপস্যার অমিত বীর্য...তুমিই ভারতবর্ষ। তার অতীত, তার বর্তমান...বন্ধুহীন এই বিপুল

বিশ্বে তোমার এই দুঃসাহসিক অভিযানের পদক্ষেপে পদক্ষেপে রচিত হোক তার ভবিষ্যৎ...

যাত্রা কর, যাত্রা কর হে সন্ন্যাসী...

জাহাজ এগিয়ে চলে অনিশ্চিত মহা-রহস্যের দিকে...অজানা মহাদেশের অভিমুখে...

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-রাত্রির অন্ধকারে কে উঠলো জেগে...কে চলেছে ঊষার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে নিয়ে আসতে আলোর আশীর্বাদ তাদের জন্যে?

বাঙালীর মনে বিবেকানন্দ তখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। এই দুঃসাহসিক অভিযানের কোন কথাই তখন জানতো না বাঙালী। এমন কি তাঁর গুরুভাইরাও নয়।

একটি জাগ্রত মানুষের সম্পূর্ণ একক অভিযান।

পরিব্রাজকের ভারহীন মুক্তজীবনের অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্য থেকে জাহাজের বদ্ধ-জীবনের উপকরণের ভারে পীড়িত হয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর মন।

দণ্ড, কমণ্ডলু, আর একখানি গৈরিকবাস...অতিরিক্ত সম্পত্তিরূপে একখানি ছোট গীতা...পায়ের তলায় মুক্তপথ, বাধাহীন অনন্ত।

আর এখানে...বাক্স, প্যাঁটরা, জামা, আলখাল্লা...নির্দিষ্ট ছোট গণ্ডিতে শোয়া, বসা...ঘড়ির কাঁটার সংগে খাওয়া-দাওয়া...শত অপরিচিতের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলা...সন্ন্যাসী বিব্রত হয়ে পড়েন। ইওরোপীয় রীতি-নীতি, এটিকেট্, জাহাজের বদ্ধ জীবনে যা বেশী করে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, ইওরোপীয় পান-বিলাস, নৃত্য, পরিবেশ...সন্ন্যাসীর কাছে সম্পূর্ণ অভিনব আর বিচিত্র লাগে!

অপরিচয়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সন্ন্যাসীর শিক্ষিত মন তাকে স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করে। শিশুর মত আনন্দিত বিস্ময়ে সন্ন্যাসী সব কিছু লক্ষ্য করে দেখেন, সামান্যতম জিনিসও সন্ন্যাসীর আগ্রহকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সহযাত্রীদের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কখন বা সমুদ্রের দিকে নিবদ্ধ করেন, চির-চঞ্চল সেই নীলাম্বুধির বুকে আলোছায়ার সহস্র বিচিত্র লীলা সন্ন্যাসীর অন্তরে মহাকাব্যের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। প্রাণের বৈচিত্র্য, সুন্দরের লীলা, সন্ন্যাসী আনন্দে উপভোগ করেন।

জাহাজের ডেকে সকলের দৃষ্টি সেই বিচিত্রবেশী সন্ন্যাসীর ওপর এসে পড়ে। সহস্রের মধ্যে স্বতন্ত্র সে বলিষ্ঠ দেহের বিচিত্র ভঙ্গিমা।

জাহাজের ইংরেজ ক্যাপটেন যেচে আলাপ করেন। আলাপে মুগ্ধ হয়ে যান। নিজে সংগে নিয়ে সমস্ত জাহাজটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

শিশুর কৌতূহলে সন্ন্যাসী ঘুরে ঘুরে সব দেখেন, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, বিচিত্র বিপুল সব আয়োজন। দেখে আনন্দ হয়। কিন্তু সেই সংগে বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই শক্তির নব-সম্ভার, শত আয়োজন, কর্মের বিচিত্র প্রকাশ, এর মধ্যে ভারতবর্ষ কোথায়?

সন্ন্যাসী নিজের চোখে দেখেন কিন্তু অনুভব করেন ভারতের ম্লান মূঢ় মূক কোটি কোটি প্রাণীর মন নিয়ে। ভারতবর্ষের তীর তিনি ছেড়ে চলেছেন বটে কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে তিনি নিয়ে চলেছেন ভারতবর্ষকে। হৃৎপিণ্ডের একদিকে অতীত ভারত, আর একদিকে বর্তমান ভারত, তার ক্ষুধা, তার হাহাকার, তার দৈন্য, তার শতছিন্ন রিক্ততা। অতি কঠোর স্বামীর মত সন্ন্যাসীর মনকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে থাকে সে ভারতবর্ষ, তার জীর্ণদেহ আর শীর্ণপ্রাণ নিয়ে। নিদ্রায়, জাগরণে, চোখের পলকের স্পন্দনে, আলাপে, আবেশে, সব সময় সন্ন্যাসীর মনের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সেই কঙ্কালমূর্তি, পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যে তাকে অনুসরণ করে এসেছে। আজ সমুদ্রপথে অজানা মহাদেশের উদ্দেশে সে-ও চলেছে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে...

সন্ন্যাসীর বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের স্পন্দন মিশে গিয়েছে, সন্ন্যাসীর দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিশে গিয়েছে। তাই সন্ন্যাসী যা কিছু দেখেন, যা কিছু উপভোগ করেন, যা কিছু স্পর্শ করেন, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই কঙ্কাল ভারতের আর্তি,—আমি আছি, আমি আছি, পূর্ণ কর আমার শূন্যতা, দূর কর আমার এই দীন রিক্ততা।

দুই-একজন ভক্ত-শিষ্যকে পত্র লিখে পথের সংবাদ জানান। এইসব পত্রের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর অন্তরবাসী সেই রিক্ত ভারতেরই হাহাকার... এই পত্রমালার কালি আজ শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু তার মধ্যে কান পেতে আজও শোনা যায় সেদিনকার সন্ন্যাসীর বুকের স্পন্দন, অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে আজও সজীব হয়ে আছে সন্ন্যাসীর সেদিনকার জ্বলন্ত প্রাণের জ্বালা...অগ্নি-উত্তাপ ; অক্ষর নয়, প্রাণের স্ফুলিঙ্গ...

জাহাজ প্রথম কলোম্বোতে এসে থামে।

সন্ন্যাসী জাহাজ থেকে নেমে শহর দেখতে বেরুলেন। জাহাজের লোক-লশকররাও শহর দেখতে বেরোয়। তারা নেমে ছোটে হোটেলের দিকে, যেখানে পাওয়া যায় সুরা আর সুন্দরী। সন্ন্যাসী ছুটলেন মন্দিরের সন্ধানে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে। অপরিচিত জাতির অন্তরের সন্ধানে।

এক মন্দিরে এসে দেখলেন, ভাস্কর্যের অপূর্ব নমুনা, পরিনির্বাণমূর্তি ভগবান বুদ্ধ শয়ান অবস্থায়। মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁরা সিংহলী ছাড়া আর কোন ভাষাই জানেন না। সুতরাং আলাপ আর সম্ভব হয় না। ফিরে আসেন জাহাজে।

পেনাং...তারপর সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরে দেখলেন, জাহাজের অধিকাংশ ইওরোপীয় আবার ছুটলো সেই সুরা আর বন্দরবাসিনীদের সন্ধানে। সন্ধানে জানলেন, সিঙ্গাপুরে এসে যে সব ইওরোপীয় বসবাস স্থাপন করছে, তারা বন্দরটিকে তাদের চরিত্র দিয়ে এমনি কদর্য করে তুলেছে। সে সংবাদ জাহাজের নাবিকেরা ভাল করেই জানে।

সেখান থেকে হংকং।

সন্ন্যাসীর নজরে পড়ে নৌকার ওপর চীনা পরিবারের ভিড়...অসংখ্য নৌকা... এক একটা নৌকায় এক একটি পরিবার...ভাসমান দারিদ্র্যের জীবন্ত মূর্তি।

মনে জাগে, ভারতবর্ষের কথা। প্রাচীন জগতের দুই মহা সমৃদ্ধিশালী প্রতিবেশী, বন্ধু...একই অভাবের তাড়নায় আজও তারা একই দুঃখের পথের সহযাত্রী। কবে যে কোন্ সুদূর অতীতে জগতের প্রাণের সমারোহে থেমে গিয়েছে তাদের দুজনার হৃদস্পন্দন। মমীর মত শুধু বেঁচে আছে তাদের দুজনেরই সুপ্রাচীন দেহ...

সন্ন্যাসীর অন্তর আলোড়িত করে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। হায় ভারতবর্ষ! হায় তেত্রিশ কোটি জীবন্ত কঙ্কালের জন্মভূমি!

হংকং-এ তিনদিন জাহাজ থেমে রইলো। সেই অবকাশে সন্ন্যাসী ছুটলেন, চীনের অন্তরঙ্গ অন্তরকে দেখবার জন্যে...সেখান থেকে আশি মাইল দূরে সিকিয়াং নদীর ধারে ক্যান্টন শহরে।

কাঁটার মত পায়ে পায়ে ফোটে অভাবের দৃশ্য...দারিদ্র্যের কুৎসিত ক্ষতে ক্ষতবিক্ষত বর্তমান চীনের অঙ্গ...

বর্তমান থেকে সন্ন্যাসী প্রবেশ করেন অতীত চীনে...চীনের প্রাচীন বুদ্ধ-মন্দিরে, মঠে...সে কোন্ সুদূর অতীতে প্রথম চীনসম্রাট্ যিনি হিমালয়ের ওপার থেকে মহাজ্ঞানের আলোক-মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তিনি যে বুদ্ধ-মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী নতমস্তকে তার ভেতরে প্রবেশ করেন...প্রবেশ করেন চীনের সেই আলোক-উজ্জ্বল অতীত ইতিহাসে। সেদিন সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে পাঁচশত চীনা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, সে যুগের দুঃসাহসিক শিল্পী পাষাণগাত্রে তাঁদের মূর্তি খোদিত করে রেখে গিয়েছেন। সন্ন্যাসী বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই অতীত-স্মৃতি পাঁচশত বুদ্ধ ভক্তদের মুখের চেহারার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা লক্ষ্য করেন, তাদের মুখের চেহারার মধ্যে বাঙালীর মুখের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য। আর এক মঠের মধ্যে সন্ন্যাসী পরম বিস্ময়ে দেখেন কীটজীর্ণ প্রাচীন পুঁথির পান্ডুলিপি...সংস্কৃত গ্রন্থ কিন্তু প্রাচীন বাঙলার বর্ণমালায় লেখা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-পাদে দাঁড়িয়ে সেই চীনা বৌদ্ধমঠের শান্ত আলোকে সন্ন্যাসী মানসচক্ষে দেখেন, হিমালয়ের তুষার বাধা অতিক্রম করে দলে দলে বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু আসছে মহাচীনে অমিতাভের আলোকবার্তা সঙ্গে নিয়ে।

কে খুঁজে বার করবে আবার হিমালয়ের তুঙ্গ-গিরিবর্তে হারিয়ে-যাওয়া সেই পথের নিশানা? চলন্ত পায়ের জীবন্ত আঘাতে আবার কবে জেগে উঠবে সারা পথ?

সন্ন্যাসীর অন্তরে নড়ে ওঠে জীবন্ত কঙ্কাল।

জাহাজে ফিরে যাবার আগে সন্ন্যাসীর তীব্র বাসনা জাগে, চীনাদের প্রচলিত ধর্মের মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে দেখতে। কিন্তু কোন বিদেশী নাকি সে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না...নিষিদ্ধ...একান্তভাবে নিষিদ্ধ।

কিন্তু ভারতবর্ষ কি অন্তরধর্মে চীনের স্বদেশবাসী নয়? সঙ্গে যে দোভাষী ছিল, সন্ন্যাসী তাঁর অন্তরের বাসনার কথা তাকে জানান।

দোভাষী বলে, তা অসম্ভব!

তাতে সন্ন্যাসীর আগ্রহ আরো বেড়েই ওঠে। জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা ধরুন, যদি কোন বিদেশী জোর করে প্রবেশ করে, কী হবে?

দোভাষী স্পষ্ট জবাব দেয়,—মেরে তাড়িয়ে দেবে! তাতে কোন সন্দেহই নেই।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে জাহাজের সহযাত্রী কয়েকজন জার্মান ছিলেন। তাঁদের ডেকে সন্ন্যাসী বললেন,—আসুন, পরীক্ষা করে দেখাই যাক, মেরে ফেলে কি না!

দোভাষীর সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে সন্ন্যাসী তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে এক মঠে প্রবেশ করলেন। কয়েক পা যেতে না যেতেই দোভাষী চিৎকার করে উঠলো,—পালান! পালান! ওই তারা আসছে!

সন্ন্যাসীর দল চেয়ে দেখেন, সামনে রীতিমত মুগুর ঘোরাতে ঘোরাতে তিন-চারজন চীনা তাঁদের দিকে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে!

সন্ন্যাসীর সহযাত্রীদের সাহসে আর কুলোল না। কোন কথা না বলে তাঁরা পেছন ফিরে বিজ্ঞজনের কর্তব্য পালন করলেন।

দোভাষী দেখে, সন্ন্যাসী কিন্তু তেমনি অটল দাঁড়িয়ে আছেন। ওধারে গদাধারীরা প্রায় কাছে এগিয়ে এসেছে। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে থাকা তার পক্ষেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বিবেচনা করে, সন্ন্যাসীকে ফেলে রেখেই দোভাষী পেছন ফিরলো।

কিন্তু সন্ন্যাসী তার হাত চেপে ধরলেন, বললেন,—একান্ত যদি পালাবেই, তবে তার আগে আমাকে বলে যাও, চীনা ভাষায় ভারতীয় যোগীকে কি বলে?

কোনরকমে সেই কথাটি উচ্চারণ করে দোভাষী ছুটতে আরম্ভ করে দিল! সেই একটি কথাকে সম্বল করে সন্ন্যাসী নিজেই এগিয়ে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সেই সদ্যশেখা কথাটি উচ্চারণ করে ইঙ্গিতে জানালেন যে তিনি একজন ভারতীয় যোগী।

সঙ্গে সঙ্গে জাদুমন্ত্রে যেন দৃশ্য বদলে গেল। গদাধারীদের মুখের ক্রুদ্ধ ভঙ্গীর বদলে ফুটে উঠলো শ্রদ্ধার সুগভীর স্নিগ্ধতা। যে হাতে ছিল গদা, সে হাতে ফুটে উঠলো নমস্কার। সন্ন্যাসীর সামনে তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়াল এবং তাদের ভাষায় সন্ন্যাসীকে কী সব বলতে লাগলো। সন্ন্যাসী তার একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। তাদের সমস্ত কথার মধ্যে শুধু একটি শব্দ তিনি শুনলেন, তারা বারে বারে বলছে, অনেকটা শুনতে কবচের মত। হঠাৎ তাঁর মনে হলো ভারতীয় যোগী শুনে তারা হয়ত তাঁর কাছে মন্ত্রপূত কবচ চাইছে।

দোভাষী কিন্তু মঠ ছেড়ে একেবারে পালিয়ে যায় নি। কিছু দূরে গিয়ে, কী হয় দেখবার জন্যে পেছন ফিরে চাইতে, লোকটি বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ যে এমন নাটকীয় দৃশ্যান্তর ঘটতে পারে, তা তার কল্পনারও বাইরে ছিল। বিস্ময়ে তার চলৎ-শক্তি যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সন্ন্যাসী পেছন ফিরে অদূরে তাকে স্থাণু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—এরা কী বলছে বুঝিয়ে দাও।

তখন সাহস করে দোভাষী এগিয়ে এসে জানালো,—যোগী মহারাজ, আপনার কাছে ওরা বিপদ-তারণের জন্য কবচ চাইছে।

সন্ন্যাসী হঠাৎ বুঝতে পারেন না, তাঁর কী করা কর্তব্য। তিনি নিজে জানেন, এসব কবচের ব্যাপার কতখানি ভ্রান্ত। তবু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে তিনি তার ওপর অনেকগুলি 'ওম্' লিখলেন...এক একটি 'ওম্' ছিঁড়ে এক একজনকে দিলেন। ভক্তিভরে সেই কাগজের টুকরো প্রথমে মাথায় ঠেকিয়ে তারা মুঠোর মধ্যে রেখে দিল।

তারপর তারা পরম সমাদরে সন্ন্যাসীকে নিয়ে তাদের মঠের অভ্যন্তর সমস্ত দেখালো! এই মঠেরই প্রাচীন সঞ্চয়ের মধ্যে সন্ন্যাসী পুরোনো বাঙলা হরফে লেখা প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির পাণ্ডুলিপি দেখতে পান। আলোক-উজ্জ্বল বিস্মৃত-অতীতের একটা জীবন্ত টুকরো।

সেখান থেকে সন্ন্যাসী আবার ফিরে আসেন জাহাজে। চীনের তটরেখা ছেড়ে জাহাজ এসে থামে জাপানের তীরে নাগাসাকিতে।

এশিয়ার মধ্যে তখন জাপান জেগে উঠেছে...চারিদিকে শৃংখলা, কর্মব্যস্ততা, সুরুচিসম্মত স্নিগ্ধ শুভ্রতা।

বাইরে থেকে সন্ন্যাসীকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা। সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে সুন্দর করে গড়ে রেখেছে। ছোট ছোট বাড়ি...তার সঙ্গে কেয়ারি করা ছোট ছোট বাগান...মাঝে মাঝে ঘাসে-ছাওয়া ছোট ছোট পুকুর...ছোট ছোট পাথরের সাঁকো...পটে আঁকা ছবি।

নাগাসাকি থেকে কোবি।

কোবিতে জাহাজ থেকে নেমে সন্ন্যাসী স্থলপথে ইয়োকোহামা যাত্রা করেন। ইয়োকোহামা থেকে জাহাজ ধরবেন। মাঝখানে এই দেশটার ভেতরটা দেখে যাবেন।

দেখলেন, ওসাকা, কিয়েটো, টোকিও...নবীন জাপান, যেখানে দানবের কর্মোদ্যম ছুটে চলেছে, ইওরোপকে ধরবার জন্যে। কাজ...কাজ...কাজ। অবিরাম চলেছে যন্ত্র...পড়ছে মানুষের মাথার ঘাম। যুগান্তরের আলস্যকে তারা পণ করেছে কর্মের উদ্যমে ভেঙে গুঁড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে। তার যা কিছু প্রয়োজন, সে নিজে তৈরি করে নেবে। জড়তার তমসা থেকে জেগে উঠেছে জাপান বিপুল কর্মের আলোক-শিখায়...

জেগে ওঠে সন্ন্যাসীর অন্তরবাসী কঙ্কাল মূর্তি...ভারতবর্ষ...

আর্তনাদ করে ওঠে, সে আর্তনাদ ফুটে ওঠে শিষ্যের কাছে লেখা পত্রে—

...আর তোমরা, কী করছো তোমরা? সারা জীবন ধরে শুধু বয়ে চলেছ, ব্যর্থ কথার বোঝা। শুধু কথা আর কথা...এস, দেখে যাও এদের...তারপর ফিরে গিয়ে লজ্জায় অন্ধকারে মুখ ঢেকে বসে থাকো! খাঁচার মধ্যে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে বসে আছ, দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়! হাজার বছরের এই কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে বসে শুধু তর্ক করছো, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নিয়ে! আর আহাম্মক পুরোহিতের অজ্ঞতার ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাচ্ছো! বড় জোর

ইওরোপের চিন্তার খানিকটা বদহজম নিয়ে ত্রিশ টাকার কেরানীগিরির জন্যে জীবনপাত করছো! না হয়, তার চেয়েও বেশী, বদমায়েশ উকিল হবার জন্যে মতলব ভাঁজছো! ভারতের যুবকের এই হলো সবচেয়ে বড় আদর্শ, সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা! বলি সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে এই সব বই, গাউন, ডিপ্লোমার জঞ্জাল ডুবিয়ে ফেলে দিতে পার না?...

জড়ত্বের তমসার গাঢ় অন্ধকারে ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর জ্যোতির্বাণী—

...নিজের হাতের তৈরী সংকীর্ণ গর্ত থেকে এস বেরিয়ে এস...বেরিয়ে এস কর্মের বিপুল জগতে! মানুষকে কি ভালবাসো? দেশকে কি সত্যি ভালবাসো? তবে শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার আর অত্যাচারের জঞ্জাল নির্মূল করে পুড়িয়ে ফেলে দাও! আর বারে বারে পেছনে ফিরে চেয়ো না...অতি-প্রিয়জন যদি কাঁদে, কাঁদুক... পেছনে নয়, সামনে এগিয়ে যাও...মানুষের জগতে এস, মানুষ হও!...

নিশীথের নিদ্রার নিথর হিমসমুদ্রে জ্বলে ওঠে বাড়বাগ্নির জ্বালা।

বেজে ওঠে সন্ন্যাসীর রুদ্র বীণা...বলি চাই...পূর্ণ বলি...ভারত-জননী আজ চায় অন্ততঃ একটি হাজার তরুণ তাজা প্রাণের বলি...পশু নয়, মানুষ চাই!...

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে ঝড়ো হাওয়া বহন করে নিয়ে যায় সন্ন্যাসীর রুদ্র আহ্বান—ঘুম-ভাঙানিয়া মন্ত্র।

ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাংকুভার...পৃথিবীর অপরার্ধলোক...উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের হিমবেষ্টনী...

সহসা বাতাস বদলে যায়। তীব্র হিমেল হাওয়া। সন্ন্যাসী নিজের অঙ্গাবরণের দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন, তাঁর যাত্রার আয়োজন যারা করে দিয়েছে, তারা ভারতের গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে থেকে অনুমান করতে পারে নি যে, এই গ্রীষ্মকালীন যাত্রার মধ্যে পৃথিবীর অপরার্ধে তাঁকে নিদারুণ শীতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। যাত্রার উৎসাহের মধ্যে অনভিজ্ঞ শিষ্যদের মনে সে সব চিন্তাই জাগে নি। সন্ন্যাসীরও মনে সে সব ভাবনা একবারও দেখা দেয় নি। যেতে হবে, এইটেই একমাত্র কথা...

এই যাওয়ার মধ্যে যে বিরাট বাস্তব দায়িত্ব আর সমস্যা থাকতে পারে, সে কথা তখন আদৌ মনে হয় নি। এক বস্ত্রে খালি পায়ে তিনি ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন, তিনি পরিব্রাজক...সেই পরিব্রাজকের মন নিয়েই তিনি একরকম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই বিরাট অজানা বিশ্বের পথে বেরিয়ে পড়েছেন। এত অল্প আয়োজনে এরকম বিরাট অভিযানে, এমনি সহায়-সম্বলহীন হয়ে আর কেউ কখনও বেরিয়েছিল কিনা জানি না! আমেরিকার দিকে সন্ন্যাসী যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন, ততই বুঝতে পারলেন, কী দুর্জয় মূঢ় দুঃসাহসিকতার মধ্যে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের সেই তুষার-হিম আবহাওয়ায় শীতবস্ত্রে সুশোভিত যাত্রীদের মধ্যে পাতলা সিল্কের আলখাল্লা-পরা সেই সন্ন্যাসীর সকরুণ মূর্তি জাহাজের সহযাত্রীদের হাস্য উদ্রেক করে। এ কী উন্মাদ! আত্ম-নির্যাতনের এ কী দুর্জয় উৎসাহ!

জাহাজের ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করে জানলেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক টুকরোও শীতবস্ত্র নেই! অথচ সন্ন্যাসী চলেছেন যুক্তরাষ্ট্রে...যেখানে এখুনি হয়তো শুরু হয়ে যাবে তুষারপাত!

ক্যাপটেন অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন...এ ধরনের মানুষ তিনি আর আগে দেখেন নি।

ভ্যাংকুভারে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কানাডার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে...

বিচিত্র দেশ...বিচিত্র পরিবেশ...সন্ন্যাসী ট্রেনের ভেতর থেকে বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন, একটার পর একটা শহর পেরিয়ে চলেছে।

জীবনে কোনদিন টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় নি...এখন পদে পদে তার প্রয়োজন। তার ওপর, সন্ন্যাসী অবাক্ হয়ে দেখেন, যতই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন, ততই যেন টাকা-পয়সার অঙ্কের অনুপাত বদলে যাচ্ছে। সামান্য কুলি যে টাকা চায়, সে টাকায় ভারতবর্ষের একটা বড় সংসারের এক দিনের খরচ চলে যায়। সন্ন্যাসীর বিচিত্র পোশাক দেখে কুলীরা যার-যা খুশী আদায় করবার চেষ্টা করে। সন্ন্যাসীকে দিতে হয়। সামান্য জলযোগ করতে গিয়ে সন্ন্যাসী দেখেন থলির অনেকখানি ভার যেন কমে গেল। হঠাৎ কর্পূরের মত সন্ন্যাসীর সামান্য পুঁজি যেন উবে যাবার মত হলো।

শীতার্ত দেহে বিভ্রান্ত মনে সন্ন্যাসী শিকাগো শহরে এসে নামলেন। রাস্তায় বেরিয়ে সন্ন্যাসী দিশেহারা হয়ে যান! এই কি শহর? এ যে অট্টালিকার মহারণ্য! অগণিত জনস্রোতের মহাসমুদ্র! তরঙ্গের পর তরঙ্গ...অবিরাম, দ্রুত ধেয়ে চলেছে। সেই বিপুল জনতার অরণ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়।

কেউ কারুর দিকে ফিরে চায় না, কেউ কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না...সম্পর্ক-বিহীন এ কী মানুষের মহাকল্লোল! তার ওপর, তখন শহরে বসেছে জগৎ-খ্যাত আন্তর্জাতিক মেলা। জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে নানাজাতের বিচিত্র সব লোক এসে, সেই জন-সমুদ্রকে আরো উত্তাল, আরো তরঙ্গসংকুল করে তুলেছে! চারদিকে পড়ে গিয়েছে টাকা রোজগারের মরসুম। কুলী থেকে আরম্ভ করে হোটেলওয়ালা পর্যন্ত সবাই ব্যস্ত ধনী বিদেশীদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে রীতিমতভাবে দোহন করতে!

এ সমুদ্রে সন্ন্যাসী ভাবেন, তিনি কোথায় গিয়ে উঠবেন? কুলীদের দয়ার ওপর পথ থেকে পথে ঘুরে বেড়ান। সেই অবকাশে কুলীরা নানাভাবে দোহন করতে শুরু করে দেয়। হোটেলে স্থানাভাব। তাছাড়া, হোটেলে থাকবার খরচের কথা শুনে সন্ন্যাসী সাহস করে এগোতেও পারেন না।

পথে দুষ্ট ছেলের দল সেই গৈরিক-রাঙা বিচিত্রবেশী মূর্তিকে দেখে হাততালি দিতে থাকে। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ে রসিকতা করে, কেউ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন মেলার কোন বিচিত্র জীব ছাড়া পেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরিশ্রান্ত, বিভ্রান্ত হয়ে অবশেষে সন্ন্যাসী এক হোটেলে স্থান পেলেন। হোটেলে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে, সন্ন্যাসী নির্জনে নিজেকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেন। এ কোথায় তিনি এলেন? এ জনারণ্যে কোথায় পথ? এ সমুদ্রের কোথায় তীর?

...জাগো সন্ন্যাসী? জাগাও তোমার ধ্যানসম্ভবা শক্তিকে! এই অরণ্যেই তোমাকে তৈরি করতে হবে পথ...এই সমুদ্রেই তোমাকে দিতে হবে পাড়ি...তত্ত্বমসির বাণীর বাহক তুমি...শাশ্বত ভারতের প্রতিনিধি, অনাহূত তুমি এসেছ বিশ্বের যজ্ঞশালায়... হে মহা দুঃসাহসিক, যজ্ঞাধিপের আসন অধিকার করে ফিরতে হবে তোমায় দিগ্বিজয়ীর বেশে তোমার জাতির ইতিহাসে...ভারত-সাগরের তীরে তীরে তোমার বিজয়-শংখ-রোলে জেগে উঠবে বিংশ-শতাব্দীতে ভারতের শাশ্বতী ঊষা!

পরের দিনে সন্ন্যাসী আন্তর্জাতিক বিশ্বমেলা দেখতে বেরুলেন। সেই বিরাট মেলার প্রত্যেকটি অঙ্গ শিশুর মত কৌতূহলে ঘুরে ঘুরে দেখেন। বিশ্বের বিপুল কর্মপ্রেরণার শতসহস্র বিচিত্র প্রকাশ এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। মানুষের কর্ম আর সৃজনীশক্তির সেই সুবিপুল সমারোহ দেখে সন্ন্যাসী বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে যান আর সেই সঙ্গে সুতীব্র বেদনায় মনে পড়ে তাঁর নিজের দেশের রিক্ততা, আলস্য আর জড়তা। ঐশ্বর্যের সেই রাজসমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর মনে পড়ে ভারতের হৃত-সর্বস্ব দীন-দুঃখী নিপীড়িতদের কথা, ভারতের প্রতিদিবসের অতি সাধারণ মানুষের কথা। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভাবনা ছাড়িয়ে, অহরহ সন্ন্যাসীর মনে জাগে শুধু ওই এক কথা, এক চিন্তা, এক ভাবনা, ভারতের দীন দরিদ্র আর্ত সর্ববঞ্চিতদের কথা। বিশ্বের এই বিপুল রাজসমারোহ তারা কি চির-ভিক্ষুকের মত দূরে দাঁড়িয়ে শুধু কাঙাল নয়নের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে? কে ঘোচাবে এই দুঃখের ভার? সর্ববঞ্চিতের বুকে কে আবার জাগিয়ে তুলবে মহাপ্রাপ্তির আনন্দ?

সারাদিন মেলায় ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যার পর হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে এসে লিখতে বসেন...লেখেন তরুণ মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিংগা পেরুমলকে... আলাসিংগার মধ্য দিয়ে তরুণ ভারতকে। তরুণ ভারতের জন্মদাতা দূর প্রবাস থেকে রচনা করেন তরুণ ভারতের জন্মপত্রিকা...নব-ভারতের উদ্বোধনী মন্ত্র...

"...হে আমার তরুণ বন্ধু, এই দূর প্রবাসে, যদি অনাহারে, বা শীতে মরে যাই, কোন দুঃখ নেই...তোমাদের ওপর দিয়ে গেলাম শতাব্দীর অত্যাচারে জর্জরিত ভারতের এই কোটি কোটি নিঃস্ব, অজ্ঞ, নিপীড়িত মানুষের সেবার ভার...আমার অন্তরের এই আকূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই অনির্বাণ স্পৃহা, উত্তরাধিকার স্বরূপ দিয়ে গেলাম তোমাদের!

...যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীন গো-পালকদের বন্ধু বলে বুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে চণ্ডাল বলেই বাহুর বন্ধনে বেঁধেছিলেন, বুদ্ধরূপে যিনি ধনী রাজপুরুষদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সামান্যা ঘৃণ্যা বারবনিতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন, যাও, তাঁর কাছে

গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে শপথ গ্রহণ কর, হে প্রভু, আমি নিয়ে এসেছি সহবলি... আমার নিজের জীবন...যাদের জন্যে যুগে যুগে প্রভু তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, সেই উৎপীড়িত, পতিত, দীনদুঃখী সর্ববঞ্চিতদের জন্যে আমার এ জীবন বলিপ্রদত্ত হলো। ভারতের তেত্রিশ কোটি লাঞ্ছিত রিক্ত মানুষের উদ্ধারের জন্যে আমার এ জীবন বলি-প্রদত্ত হলো...জানি, এ একদিনের কাজ নয়, কাঁটায় ভরা ভয়ংকর এ পথ...ভারত-জোড়া এ দুঃখ জানি একদিনে দূর হবে না।...শত শত লোক এই ব্রত পালনে প্রাণ বিসর্জন দেবে, আবার তাদের জায়গায় শত শত লোক আসবে। আমি এখানে অকৃতকার্য হয়ে মরে যেতে পারি কিন্তু এ আমার স্থির বিশ্বাস, আমি চলে গেলে, আমার এ ভার আর একজন এসে নেবে। একদিন সিদ্ধিলাভ হবেই হবে...জয় পার্থসারথির জয়!

...যারা ধনী, যারা ঐশ্বর্যের সাতমহলা বাড়িতে বসে আছে...গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ, তাদের গ্রাহ্য করি নি...বিশ্বাস করি না...বিশ্বাস করি না হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার লোকদের...বিশ্বাস করি না নির্বীর্য সংবাদপত্রওয়ালাদের...তাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নেই...মৃতকল্প...

...হে তরুণ ভারত, নাই থাক তোমার পদমর্যাদা, হও তুমি দরিদ্র, রিক্ত, নিঃস্ব... যদি থাকে অন্তরে তোমার এই বিশ্বাস...তোমাকেই আমার একমাত্র বিশ্বাস।...কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই...কৌশলে কোন কিছুই হয় না...

অগ্নিজ্বালাময় সহানুভূতি...অগ্নিজ্বালাময় বিশ্বাস...তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত!

...জয় প্রভু, তোমারই হোক্ জয়...

তুমিই আমার নেতা!

কে পড়ে গেল পেছনে? ফিরে চেয়ে দেখবার কোন দরকার নেই।

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল...সামনে...

একজন পড়ে যাবে...আর একজন তার জায়গায় এসে দাঁড়াবে।

হবে, হবে জয়!...

সেই বিপুল জনারণ্যের মধ্য থেকে সন্ন্যাসী পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন। সহায়-সম্বল পরিচয়হীন, একটু একটু করে যেচে সেখানকার লোকদের জানতে চিনতে চেষ্টা করেন। সেই বিচিত্র নতুন দেশকে বুঝতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তার বিশালতা, তার বিচিত্রতা, তার নিত্যচলমান ব্যস্ততার মধ্যে সন্ন্যাসী খুঁজে পান না তার প্রাণকেন্দ্র।

প্রথম পরিচয়ে আসে রূঢ় অভিজ্ঞতা, এক বিচিত্র বৈজ্ঞানিক ব্যবসা-সর্বস্ব জীবনের অভিনব বিচিত্র প্রকাশ। সেই ঐশ্বর্যের রাজসমারোহের ভেতর, বাইরের সেই মহাপ্রাচুর্যের মধ্যে সংগোপনে কোথায় লুকিয়ে আছে একটা কুৎসিত অস্বাভাবিকতা, সন্ন্যাসী প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় যেন তা অনুভব করেন।

প্রতিদিন বিশ্বমেলায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি, কখন

তাঁর সেই বিচিত্র চেহারা আর পোশাক দেখে, একদল লোক তাঁর পিছু নিয়েছে, আমেরিকার সংবাদপত্র-জগতের রিপোর্টারের দল—আমেরিকার বিচিত্র-জীবনের একটা প্রধান অংগ। অচিরকালের মধ্যেই এক বিচিত্র ঘটনা সংযোগে সন্ন্যাসী তাদের অস্তিত্বের পরিচয় পেলেন। সেই বিশ্বমেলায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি সহসা ভারতবর্ষের এক সামন্ত রাজার দর্শন পেলেন। দেখলেন, শিকাগো শহরের হোমড়া-চোমড়া লোকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি মেলার দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁকে দোহন করবার জন্যে লোকগুলো তাঁকে মাথায় নিয়ে নাচছে। রাজাবাহাদুর তাতে মহাতৃপ্ত হয়ে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করছেন। সন্ন্যাসীর সামনাসামনি এসে পড়ায়, তিনি অবজ্ঞাভরে সন্ন্যাসীকে এড়িয়ে চলে গেলেন।

বিদেশে বিদেশীদের স্তাবকতার মধ্যে একজন ম্লানবেশ ভারতীয় ফকিরকে নিজের দেশের লোক বলে স্বীকার করতে তাঁর মর্যাদায় বাধলো।

সন্ন্যাসী মনে মনে হাসলেন।

সেই মেলাতে একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ এক দোকান খুলে বসেছিল, নখের তৈরী বিচিত্র সব ছবি বিক্রি করছিল। যে কোন কারণে হোক, এই মারাঠী ব্রাহ্মণটি রাজাবাহাদুরের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। রিপোর্টাররা রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে সেই মারাঠীর শরণাপন্ন হলো। রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে মারাঠী ব্রাহ্মণটি রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে সত্য আর মিথ্যায় জড়িয়ে অকথ্য সব কথা প্রকাশ করলো, তাদের নিজেদের দেশে রাজাবাহাদুরকে কেউ গ্রাহ্য করে না, অতি হীন জাতের লোক, একশো গণ্ডা করে স্ত্রীলোক পোষে আর তাদের নিয়ে একান্ত দুর্নীতির মধ্যে জীবনযাপন করে...ইত্যাদি। মারাঠী ব্রাহ্মণের মুখ থেকে এই সব খাঁটি সত্য সংবাদ সংগ্রহ করে তারা পরের দিনের খবরের কাগজে বড় বড় করে ভারতীয় রাজার প্রকৃত জীবন-কাহিনী প্রকাশ করলো এবং পাঠকের কাছে এই সত্য বিবরণের মর্যাদা বাড়াবার জন্যে সত্যবাদী রিপোর্টাররা রাজার সম্পর্কে সমস্ত কাহিনী সন্ন্যাসীকর্তৃক বিবৃত হয়েছে বলে জোর গলায় প্রকাশ করলো এবং সেই সংগে এই বিচিত্র সন্ন্যাসীরও বর্ণনা দিয়ে দিল, ভারতের এক মহাজ্ঞানী সাধু, নানা রকম অলৌকিক শক্তির অধিকারী, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজাবাহাদুরকে নামাবার জন্যে সন্ন্যাসীকে একেবারে প্রশংসার সপ্তস্বর্গে তুলে ধরলো। বহু সাধ্যসাধনার পর এই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মুখ থেকে এই সত্য বিবরণী তারা সংগ্রহ করে এনেছে।

এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ফলে তার পরের দিন রাজাবাহাদুরের শিকাগোর রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব হয়ে উঠলো। এবং দলে দলে লোক হোটেলে সেই বিচিত্র সন্ন্যাসীর সংগে আলাপ করবার জন্যে ছুটে এলো।

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমেরিকান সত্যবাদিতার সেই পরিচয় পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। লোকে তাঁর সংগে পরিচয় করতে এসে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে, সেই সব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের কী বিচিত্র কুৎসিত ধারণা, কী বিমূঢ় অজ্ঞতা! এমন একটি মানুষের দেখা পান না, যার সংগে বন্ধুতা সম্ভব হতে পারে। সন্ন্যাসীর অন্তর দুর্ভাবনায় ভারী হয়ে ওঠে।

দুর্ভাবনা তীব্রতর হয়ে ওঠে, যখন এইসব লোকদের কাছে তিনি পার্লামেণ্ট অব্ রিলিজিয়নের আসল সংবাদ পেলেন। প্রথমতঃ, ভুল সংবাদ পেয়ে তিনি বহু আগেই চলে এসেছেন। ধর্মসভার অধিবেশন বসবে সেপ্টেম্বর মাসে। তখনো দুমাস বাকী। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে ভাবে এসেছেন, সে ভাবে ধর্মসভায় কোন প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হয় না। ধর্মসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে হলে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম-কানুন আছে, সেইসব নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে না এলে কেউই ধর্মসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না, অর্থাৎ যে ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে আসতে হবে, সেই ধর্মের স্বীকৃত কোন বড় প্রতিষ্ঠানের মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্যরূপে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচয়-পত্র আগে পাঠাতে হবে, তারপর ধর্মসভার নির্বাচনী কমিটি অনুমোদন করে পাঠালে, সেই প্রতিনিধি ধর্মসভার অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে। তৃতীয়তঃ, এই প্রতিনিধি-নির্বাচনের শেষ তারিখও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখন আর কাউকেই নির্বাচিত করা হবে না।

সন্ন্যাসীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। কোথায় সুদূর মাদ্রাজ...কোথায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী শিষ্যদের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা! এই অসম্ভব পথের কষ্ট, এতদিনের এত কল্পনা, আশা-ভরসা সবই বৃথা...সবই ব্যর্থ! আদর্শের উৎসাহের প্রেরণায় এইসব বাস্তব সমস্যার কথা কেউই একবারও ভাবে নি।

সেই বন্ধুহীন দূর বিদেশে বিপুল জনারণ্যের মধ্যে সন্ন্যাসীর মনে হয়, তিনি যেন সম্পূর্ণ একা...পারাপারহীন মরুভূমির মধ্যে ভগ্নজানু বাহকহীন একা যাত্রী!

সারাজীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখে এসেছেন আজ এই দূর বিদেশে তা কি এমনিভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবে? যে সংগোপন বিপুল বাসনা নিয়ে তিনি বিশ্বের পথে যাত্রী হয়েছেন, তার ব্যর্থতার কঙ্কাল নিয়েই কি তাঁকে ফিরে যেতে হবে? হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে নব-ভারতের জাগরণের যে মহাদর্শকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এতদিন ধরে নিশীথের অনিদ্রা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, আজ কি তা এমনিভাবে মরীচিকায় রূপান্তরিত হবে? ধ্যানে, জাগরণে, নিদ্রায় গুরুর যে আশীর্বাণীকে অনুসরণ করে এসেছেন, সে কি আজ শূন্য মরুভূমিতে অসহায় করে তাঁকে ফেলে রেখে দেবে? এরি জন্যে কি নিজের মুক্তিবাসনা পর্যন্ত গুরুর নির্দেশে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন? ভারতের এই মুমূর্ষু মূর্তি, এই কি তবে চিরসত্য হয়ে থাকবে? জাগবে না ভারতের শাশ্বতী ঊষা?

সেই পথরোধকারী পুঞ্জীভূত নিরাশার তমসার মধ্যে সন্ন্যাসী গভীরতম ধ্যানে নিজের মধ্য থেকে আবার জাগিয়ে তোলেন পরমাশক্তিকে...দুঃসহ দুঃখের মধ্যেই দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষার শিখা জ্বালিয়ে তোলেন অন্তরে...আসুক অন্ধকার গভীরতম হয়ে, যাত্রা কর, যাত্রা কর হে ঊষা-যাত্রী অনাদি-ঊষার সন্তান তুমি...তোমার মধ্য থেকেই আবার জন্ম নেবে নব ঊষা!

বিপুল সংগ্রামের সম্ভাবনায় জেগে ওঠেন সন্ন্যাসী। বুঝতে পারেন, যে দুর্লভ জয়ের জন্যে গুরুশক্তি তাঁকে পাঠিয়েছে এই বন্ধুহীন দূরদেশে, দুর্জয় দুঃখের মধ্য দিয়েই তাঁকে অর্জন করতে হবে। তার জন্যে বীর সন্ন্যাসী নিজের অন্তরকে প্রস্তুত

করেন। ফিরবেন না তিনি...যে লক্ষ্যের জন্যে যাত্রা করেছেন, সে লক্ষ্যে তাঁকে পৌঁছতেই হবে। অসম্ভব...অসম্ভবকে যদি সম্ভবই না করতে পারেন, তবে কিসের সাধনা?

অন্তরের দুর্জয় বিশ্বাসে সন্ন্যাসী সেই অটল অন্ধকারে এগিয়ে চলেন।

মাদ্রাজে ভক্ত-শিষ্যরা সন্ন্যাসীর সঙ্গে নোটে একশো সত্তর পাউণ্ড আর নগদে নয় পাউণ্ড মাত্র দিয়েছিল। শিকাগোর হোটেলে যখন তিনি গিয়ে ওঠেন, তখন সেই পুঁজি থেকে তাঁর অবশিষ্ট ছিল মাত্র একশো ত্রিশ পাউণ্ড।

তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন, যতই কম খরচ করবার চেষ্টা তিনি করুন না কেন, রোজ অন্ততঃ এক পাউণ্ড করে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

তারপর সন্ন্যাসীর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে চারদিক থেকে লোকে তাঁকে ঠকাতে শুরু করে। তাঁর ছোট্ট-থলির গায়ে চারদিকে ছোট ছোট গর্ত ফুটে ওঠে, সেই গর্তের ভেতর দিয়ে যে মাত্রায় টাকা পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন, বিশ্ব-সভার অধিবেশনের আগেই এই ডলারের দেশে তিনি কপর্দকশূন্য ভিখারী হয়ে যাবেন! অতদিনও অপেক্ষা করে থাকতে হবে না, সামনেই শীত আসছে! তিনি এক দরজীর সঙ্গে পরামর্শ করে জানলেন, মোটামুটি একটা গরমের পোশাক তৈরি করতে তাঁর প্রায় তিনশো টাকা লাগবে। তখন আর কি অবশিষ্ট থাকবে!

শীতের জন্যে বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন আর এক কারণে তাঁর পোশাকের পরিবর্তন করা। তাঁর সেই আলখাল্লার পোশাকে রাস্তায় বেরুলেই রাস্তার লোকে আর দুষ্ট ছেলেতে মিলে তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তোলে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সন্ন্যাসী অন্তরের পরম বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন। যে শক্তি তাঁকে নিয়ে এসেছে এই দূর দেশে, সেই শক্তিই এই অন্ধকারে দেখাবে পথ। তিনি তো তাঁর সমস্ত সত্তা সমর্পণ করেছেন তাঁকে।

এমন সময় মাদ্রাজ থেকে এক শিষ্য এক চিঠিতে শিকাগোর এক সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ব্যবস্থা করে দিলো। সন্ন্যাসী হোটেল থেকে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা সন্ন্যাসীকে বিশেষ আদর করেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন, তাঁকে এই আদর করার পেছনে আছে, অন্তরের সহৃদয়তা ততখানি নয়, যতখানি একটা নতুন বিচিত্র জিনিস পাঁচ জনকে দেখানোর শৌখিনতা। আমেরিকার ধনী লোকেরা "কিউরিও" সংগ্রহ করতে ভালবাসে। সন্ন্যাসীকে তারা জীবন্ত কিউরিও হিসাবেই গ্রহণ করলো। সন্ন্যাসী তাতে ক্ষুব্ধ হলেন না। হোটেলে জনতার কুৎসিত আক্রমণ থেকে এবং ততোধিক আশঙ্কার কারণ, ফুটো থলির বিপদ থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পেলেন।

কিন্তু কত দিনই বা এইভাবে জীবন্ত কিউরিও সেজে লোকের আতিথ্য উপভোগ করা যায়? তা ছাড়া সে বছর নাকি শিকাগো শহরের খুব দুর্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, টাকা-পয়সা সম্বন্ধে সবাই অতিরিক্ত সচেতন! সন্ন্যাসীর

আশ্রয়দাতা উপদেশচ্ছলে জানালেন, বোস্টন শহর নাকি থাকার দিক থেকে শিকাগোর চেয়ে ঢের বেশী সুবিধাজনক, সেখানে জিনিস-পত্রের দাম নাকি এত চড়া নয়।

সেই হিতোপদেশের অর্থ গ্রহণ করে সন্ন্যাসী তল্পিতল্পা নিয়ে শিকাগো ছেড়ে বোস্টন শহরের দিকে রওনা হলেন।

ট্রেনে যেতে যেতে সন্ন্যাসী ভাবেন, কত দূরে সেই বিশ্বসভা? সেখানে কি সত্যই পেঁছতে পারবেন না? কী করেই বা পেঁছবেন? সামনে কোন আশার আলোই তো চোখে পড়ছে না!

কিন্তু সেই মুহূর্তেই, তিনি না দেখতে পেলেও, সেই আলোর শিখা তাঁর সংগে সংগে চলেছে! অদৃশ্যলোক থেকে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে গুরুর আশীর্বাণী।

ট্রেনের সেই কামরার ভেতর এক প্রৌঢ়া আমেরিকান রমণী একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে ছিল। সন্ন্যাসীর সেই ধীর-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তির দিকে চেয়ে রমণীর তীব্র কৌতূহল জেগে ওঠে। নিজে উপযাচিকা হয়ে রমণী সন্ন্যাসীকে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ভারতীয় সন্ন্যাসী...এসেছেন ভারতের মর্মবাণী প্রচার করতে...নিঃস্ব... নিঃসম্বল...একাকী...

নিমেষের পরিচয়...অন্তরংগ হয়ে ওঠে।

সন্ন্যাসী এতদিন যা দেখতে পান নি, সহসা সেদিন সেই প্রৌঢ়া রমণীর মধ্যে দেখতে পেলেন...সদাব্যস্ত ব্যবসায়ী-আমেরিকার আর একদিক...স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠিতা করুণাময়ী আমেরিকার নারী...

রমণী সানন্দে সন্ন্যাসীকে বোস্টনে তাঁর নিজের বাড়িতে আমন্ত্রিত করে নিয়ে এলেন।

সন্ন্যাসীর অন্তরে জ্বলে ওঠে আশার আলো। জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন নড়ে ওঠে।

নতুন আশ্রয়...'ব্রিজি মেডোস্' বাড়ির নাম—নামের মধ্যে যেন আশ্বাসের আভাস ফুটে ওঠে। আশ্রয়দায়িকা তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীদের আমন্ত্রণ করে সন্ন্যাসীর সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। একটু একটু করে বাইরের সেই অনিশ্চিত সদা-পরিবর্তনশীলতার মধ্যে সন্ন্যাসী আমেরিকার অন্তরের অপরিবর্তনীয়ের সাক্ষাৎ পান।

বোস্টনের কারাগারের নারী-পরিচালিকার সংগে আলাপ হয়। তিনি সানন্দে সন্ন্যাসীকে কারাগারের ভেতর নিয়ে কারাবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখান। সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে দেখেন, সেখানে কারাগারকে কারাগার বলে না, কারাগারের নাম হলো সংশোধনাগার এবং ভেতরের জীবনযাত্রা দেখে সেই নামের সার্থকতাও উপলব্ধি করলেন। মানুষ একবার অপরাধ করলে চিরকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়ে যায় না। দীর্ঘশ্বাসের সংগে সন্ন্যাসীর মনে পড়ে, ভারতজোড়া কারাগারে বন্দী অভিশপ্ত দরিদ্র ভারতবাসীদের কথা। জীবনে যে পড়ে গেল, সে পড়েই রইলো ; তার উত্থানের আর কোনই পথ নেই...কোন অবলম্বনই নেই। মানুষের অধিকার থেকে তারা যেন চিরবঞ্চিত।

বোস্টনের নগর-উপান্তের সেই বাড়িতে ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বোস্টনের সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের আলাপ হতে থাকে। সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে যিনি আসেন, তিনিই সন্ন্যাসীর চরিত্র এবং পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে যান।

সন্ন্যাসীর খ্যাতি একটু একটু করে বিস্তার লাভ করতে থাকে। সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক সুপণ্ডিত জে, এইচ, রাইট তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। চার ঘণ্টা ধরে জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়। সেই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও বিদ্যার পরিধি দেখে অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে যান।

কথাপ্রসঙ্গে, সন্ন্যাসী বিশ্বসভার কথা উত্থাপন করেন। কী বিরাট আশা নিয়ে এসেছিলেন আর কী বিরাট ব্যর্থতা তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে! বিশ্বসভায় প্রবেশ করবার মত পরিচয়-পত্রও তাঁর নেই।

রাইট বিস্মিত হয়ে বলেন, স্বামীজী, আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্য কী অধিকারে আলো দিচ্ছে, তা জিজ্ঞাসা করা একই ব্যাপার!

সন্ন্যাসীর সমস্যার কথা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে বলেন, আমার শক্তিতে যদি সম্ভব হয়, আমি দেখবো যাতে আপনি পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

আনন্দে দুলে ওঠে সন্ন্যাসীর অন্তর। অসম্ভব বলে যা ছিল যুক্তির বাইরে, সহসা কে যেন তাকে ঠেলে নিয়ে এলো চেতনার সীমার মধ্যে।

পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটির সভাপতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি এক পরিচয়-পত্র লিখে সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন। পরিচয়-পত্রে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে লিখলেন, "এই যে ব্যক্তিটিকে পাঠাচ্ছি, আমেরিকার যত অধ্যাপক আছে, তাদের সকলের পাণ্ডিত্য এক করলে তাঁর পাণ্ডিত্যের সমান হবে না।" এই সঙ্গে কমিটির সভাপতির নাম-ঠিকানা লিখে দিলেন।

—এই চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন।

সন্ন্যাসী মহা-আনন্দে সেই পরিচয়-পত্র আর ঠিকানা নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হন।

রাইট বুঝতে পারেন, সন্ন্যাসী মুখ ফুটে না বললেও, সন্ন্যাসীর কাছে উপযুক্ত পাথেয় বোধহয় নেই। তাই তিনি শিকাগোর একখানি টিকিট কিনে সন্ন্যাসীর হাতে গুঁজে দিলেন। কৃতজ্ঞ অন্তরে সন্ন্যাসী তা গ্রহণ করে আবার শিকাগো-যাত্রী ট্রেনে উঠলেন।

ট্রেনে উঠে সন্ন্যাসী আনন্দিত অন্তরে ভাবেন, এই দুদিন আগে যে অন্ধকার ছিল নিশ্ছিদ্র স্থির জমাট, কোথা থেকে কে তার ভেতরে জ্বালিয়ে তুললো আলোর শিখা? পরম বিশ্বাসের নিবিড় আনন্দে ভরে ওঠে সন্ন্যাসীর মন।

—নমো, নমো, হে মহা-অদৃশ্য, হে মহা-ধ্রুব, পরম-নির্ভর,

নমো, নমো, হে মহাশক্তি...গুরু, বন্ধু, অন্তরের অন্তর, চির-সঙ্গী, সাথী...

আলোক-অস্তিত্বের জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে যায় সন্ন্যাসীর অন্তরলোক...চক্ষুর

—যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন, সবই ক্ষণিক, এমন কি জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনা মাত্র,—এই হেতুই আমাদের ধর্ম সত্য—

ব্রহ্মবিজ্ঞানী—স্বামী বিবেকানন্দ





যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে—

দূরদর্শী—স্বামী বিবেকানন্দ

জীবনের আড়ালে সত্য হয়ে ওঠে আর এক জীবন। অঙ্গ-সহচর আর এক অস্তিত্ব। বাইরের কর্ম-জীবনের সহযাত্রী আর এক অন্তর্গূঢ় জীবন...পাশাপাশি চলেছে দুই ধারা...দুই-ই চরম সত্য...একান্ত বাস্তব...

ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। ব্যবসায়ী...

সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে ভদ্রলোক প্রীত হলেন, বুঝলেন, সন্ন্যাসী আমেরিকা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ...নতুন লোকের পক্ষে শিকাগোর মত বিরাট শহরে কারুর ঠিকানা খুঁজে বার করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন, ট্রেন থেকে নেমে তিনি তাঁকে পথ দেখিয়ে দেবেন। ।

কিন্তু ট্রেন যখন শিকাগো স্টেশনে থামলো, অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে সন্ন্যাসী কখন যে ভদ্রলোকের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন জানতেই পারলেন না। সে ভিড়ের মধ্যে সন্ন্যাসী আর খুঁজে পেলেন না ভদ্রলোকটিকে।

স্টেশনের বাইরে এসে সন্ন্যাসী নিজের পকেটে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন, ঠিকানা লেখা কাগজটা তিনি অন্যমনস্কতাবশতঃ হারিয়ে ফেলেছেন। পকেটে কোথাও আর পেলেন না। এই বিচিত্র বিমূঢ়তায় সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত বড় ভুল তিনি কি করে করলেন? অনিবার্যতার মত সেই দুর্ঘটনা তাঁর চিত্তকে আবার উদ্বেল করে তুললো।

তাঁর অন্তরকে নিয়ে একি আলো-ছায়ার খেলা?

পথে বেরিয়ে যাকেই জিজ্ঞাসা করেন, কেউ-ই যেন তাঁর কথা বুঝতে পারে না। তারাও যে ভাষায় কথা বলে সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন না। শহরের যে অঞ্চেল জার্মানরা বাস করে, সন্ন্যাসী পথ ভুলে সেই অঞ্চলে এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সন্ন্যাসী ভীত-নেত্রে দেখেন, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে এসেছে। অন্ধকারে হিমেল হাওয়া দ্রুত ঝড়ের আকার ধারণ করেছে! কোথায় যাবেন, কী করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারেন না। ক্রমশঃ পথ জনবিরল হয়ে আসে। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করে জানবেন, সে অঞ্চলে কোন হোটেল আছে কিনা, তারও কোন সুযোগ মিললো না। জার্মানরা তাঁর কথা বুঝতেই পারে না। অন্ধকারে ক্রমশঃ পথ হারিয়ে সন্ন্যাসী একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ক্ষুধায়, শ্রান্তিতে, ক্লান্তিতে অঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। সে অবস্থায় কোথায় অনির্দিষ্ট ঘুরে বেড়াবেন। অবশেষে এক জনবিরল পথের ধারে দেখলেন একটা মস্ত বড় কাঠের বাক্স খালি পড়ে রয়েছে, বোধ হয় রেলের মালগুদামের কোন পরিত্যক্ত প্যাকিং বাক্স হবে।

যে শক্তি আজ তাঁকে সেইখানে নিয়ে এসেছে, তারই ওপর নির্ভর করে রাত্রির মত সেই কাঠের বাক্সকেই তাঁর রাত্রিবাসের ঘর করে নিয়ে, অনাহারেই শুয়ে পড়লেন। ক্লান্তিতে অচিরকালের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুদিন পরেই যাঁর নাম সারা বিশ্বের সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানের গৌরব লাভ

করবে, আজ রাত্রির অন্ধকারে তিনি পথভিক্ষুকের মত অনাহারে নগর-উপান্তের পথের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছেন।

জয় অজানার জয়!

শিশির-সিক্ত শীতার্ত দেহে প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে, দিনের আলোকে চারদিক ভাল করে দেখে নিলেন। ক্ষুধায় তখন সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। যেখানে শুয়ে ছিলেন, সে অঞ্চলে দেখলেন লোকজনের বাড়ি বিশেষ কিছুই নেই। তাই আন্দাজে তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন। অদূরে সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি চোখে পড়লো, সেই দিকে অগ্রসর হয়ে বুঝলেন, তিনি শহরের সব চেয়ে বিলাসী পল্লীর মধ্যে বোধ হয় এসে পড়েছেন। লেক শোর ড্রাইভ,—শিকাগো শহরের সম্ভ্রান্ত ধনীবিলাসীরা সেই অঞ্চলে হ্রদের ধারে বিলাস-কুঞ্জ তৈরি করে বাস করেন।

ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় একান্ত পীড়িত হয়ে, সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের অভ্যাস মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগলেন...কিছু খাদ্য...আর অনুগ্রহ করে যদি বলে দেন বিশ্ব-সভার কমিটির অফিস কোন্ দিকে।

সেই পথের ধূলায় ধূসর জীর্ণ পোশাকের দিকে চেয়ে গৃহস্থরা ঘৃণ্য ভিক্ষুক বলে সন্ন্যাসীকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। কেউ বা বলে চোর, তিরস্কার করে। কোথাও বা বাড়ির চাকরেরা অপমান করে মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দেয়। সামনে সুসজ্জিত বারান্দায় ধনীরা প্রাতরাশ গ্রহণ করছে...দ্বারপ্রান্তে ম্লানমূর্তি সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ায়...বিরক্ত হয়ে তারা চাকরকে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়...

সন্ন্যাসী আবার ক্ষুধার তাড়নায় দ্বার থেকে দ্বারে লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়... বেলা বেড়ে যায়...সুবর্ণ-মণ্ডিত মৃত অন্তরে জাগে না এতটুকু করুণার সাড়া...

সন্ন্যাসী মহা-উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কী করবেন, কোথায় যাবেন, কেউ তাঁর কথা পর্যন্ত শুনতে চায় না...বিশ্বাস করা তো দূরে থাক! এই বিচিত্র ইষ্টকপুঞ্জের মধ্যে মানুষ কোথায়? একটা মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন...এতই দুঃসাধ্য ব্যাপার?

সন্ন্যাসীর অন্তর নিদারুণ অভিমানে আলোড়িত হয়ে ওঠে। পরিব্রাজক অবস্থায় এমনি বহুবার অভিমানে তাঁর অন্তর উদ্বেল হয়েছে। আজ আবার বন্ধুহীন দূর বিদেশে সেই নিদারুণ অভিমান সন্ন্যাসীর অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যদি আহার না জোটে, যদি পথের সন্ধান কেউ নাই বলে দেয়, সে চেষ্টা তিনি আর করবেন না। এই সংকল্প করে পথের ধারে রাস্তার ওপরই বসে পড়লেন...যদি তোমার প্রয়োজন হয়, তুমি নিয়ে আসবে আহার, যদি তোমার প্রয়োজন থাকে আমাকে, আমার হাত ধরে এখান থেকে নিয়ে যাবে তুমি...

রাস্তার ওপারে এক বৃহৎ অট্টালিকা। সেই অট্টালিকা থেকে মনোরম সোপান থাকের পর থাক নেমে এসেছে বাড়ির বাহির প্রাঙ্গণে।

সেই সোপান বেয়ে রাজরানীসদৃশা এক নারী নেমে আসেন...বাড়ির দরজা পেরিয়ে তিনি সোজা রাস্তার অপর পারে সন্ন্যাসীর সামনে এসে দাঁড়ান। শান্ত

স্নিগ্ধ সুমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, সন্ন্যাসী, আপনি কি বিশ্বধর্মসভার কোন প্রতিনিধি?

অপার বিস্ময়ে সন্ন্যাসী সেই মহিমময়ী নারীমূর্তির দিকে চেয়ে দেখেন।

পথভ্রান্ত সন্ন্যাসী স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই নারীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। এ কী অপরূপ আবির্ভাব!

তাঁর অন্তরের অন্তরতম স্থলে আনন্দের এক মহাতরঙ্গ জেগে ওঠে! আর তো কোন সন্দেহ নেই! হে বিশ্বজননী, এই তো পথপ্রান্তে প্রত্যক্ষ দর্শন পেলাম তোমার আদেশের। প্রণাম হে চৈতন্যরূপী গুরু, এই তো চেতনায় জাগ্রত দেখছি তোমার কল্যাণ অস্তিত্ব।

এক মহা-আশ্বাস মেঘ-বাষ্পের মত ছেয়ে ফেলে সন্ন্যাসীর সমস্ত অন্তরাকাশ। নিমেষে বিদূরিত হয়ে যায় রাত্রির দুঃস্বপ্নের ঘোর।

নারীর প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী তাঁর পরিচয় দিয়ে ধর্মসভার কথা উত্থাপন করেন। কমিটির সন্ধানে বেরিয়ে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে তিনি কী ভাবে পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, নারীকে জানান।

সন্ন্যাসীর উত্তর শুনে সেই মহিলা একান্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করেন,—তাহলে অনুগ্রহ করে যদি আমার গৃহে আসেন, আমি আপনার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবো।

সন্ন্যাসী পথ থেকে উঠে নারীকে অনুসরণ করে চলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়, ভবিতব্যতা আজ এই নারীর রূপে তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছে তাঁর লক্ষ্যের দিকে। ব্যর্থ হবে না গুরুর প্রত্যাদেশ!

বাড়ির মধ্যে সুসজ্জিত একটা স্বতন্ত্র ঘর মহিলাটি সন্ন্যাসীর জন্যে ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়ির চাকরবাকরদের ডেকে আদেশ দিলেন, সন্ন্যাসীর সেবায় যেন এতটুকু ত্রুটি না হয়।

ভাগ্যরূপিণী সেই নারীর নাম মিসেস জর্জ. ডব্লু. হেল। সেই দিনের পরিচয়ের ফলে তিনি বিবেকানন্দের সারা জীবনের বান্ধবীরূপে পরিণত হলেন। তিনি নিজে সঙ্গে করে বিবেকানন্দকে ধর্মসভার নির্বাচনী কমিটিতে নিয়ে গেলেন এবং এই অপরূপ সন্ন্যাসীর পরিচয় তাঁরা যেভাবে পেলেন, তাতে তাঁকে নির্বাচিত সভ্য করে নিতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। মিসেস হেলের কাছ থেকে সন্ন্যাসীর সেবার দায়িত্ব তাঁরাই গ্রহণ করলেন।

এতদিন পরে সন্ন্যাসী তাঁর লক্ষ্যের দ্বারে এসে পেঁাছলেন। বিশ্ব-ধর্মসভায় জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে মাননীয় যে সব অতিথি এসেছিলেন, তাঁদের বসবাসের জন্যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ন্যাসী তাঁদেরই একজন হয়ে অভ্যাগত ভবনে এসে উঠলেন! সমগ্র সুসভ্য জগতের প্রতিনিধি সেই ভবনে একত্র হয়েছেন, বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ...তাঁদের মধ্যে দেখা গেল গৈরিকবাস ভারতের তরুণ

সন্ন্যাসী সকলের চেয়ে কনিষ্ঠ...তখন তিনি উনত্রিশ বছর পেরিয়ে সবে ত্রিশে পড়েছেন।

আগামী ঐতিহাসিক অধিবেশনের জন্যে যেন সকলেই প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রত্যেকের বক্তব্য বিষয় প্রত্যেকে ভাল করে লিখে নিয়ে আবার পরিমার্জিত করছেন; তাকে সুন্দরতর করবার জন্যে, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবার জন্যে নিশিদিন ব্যস্ত রয়েছেন। সন্ন্যাসী কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন আয়োজনই করেন না। জীবনে কোনদিন তিনি কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেন নি, আজ এই বিরাট বিশ্বসভায় তিনি কি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারবেন? কী তিনি বলবেন? সমস্ত চেতনা আবেগে কাঁপতে থাকে। সন্ন্যাসী লেখনী তুলে রেখে দেন। নিশিদিন শুধু ধ্যানে কেটে যায়। অন্তরের মধ্যে আহবান করে আনেন বিদেহী আশীর্বাদকে। সেই মাত্র সম্বল। আমি শুধু নীরব তন্ত্রী, তোমার বাণীর আধার, এ বীণাযন্ত্রে তুমি নিজে যা বাজাবে, তাই হবে আমার বাণী...তাই আছি শুধু অপেক্ষা করে...হে গুরু, আমাকে কর তোমার বীণা...

শিকাগোর 'হল্ অব্ কলম্বিয়া'...

যে দুঃসাহসিক নাবিক সমুদ্র-তরঙ্গের অজানা পথের ভেতর থেকে একদিন নতুন করে খুঁজে বার করেছিলেন এই মহাদেশের তট, তাঁরই নামে নির্মিত হয়েছে এই বিরাট-ভবন...সেই ভবনেই আজ সমবেত হয়েছে, জগতের বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন ধর্মের আর সভ্যতার প্রতিনিধি...

১৮৯৩ সাল...সেপ্টেম্বর মাসের ১১ই তারিখ...সোমবার ঘড়িতে বাজছে দশটা...

বিরাট হলে তিলার্ধ স্থান নেই। সমগ্র আমেরিকা থেকে সমবেত হয়েছে প্রায় দশ হাজার শ্রোতা। শ্রোতাদের সামনে সুউচ্চ বক্তৃতা মঞ্চে গোলাকারে বসেছেন জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা, প্রায় এক সহস্র বিভিন্ন প্রবন্ধ পঠিত হবে এখানে।

মধ্যস্থলে রাজকীয় আসনে সমাসীন রোমান ক্যাথলিক জগতের প্রধানতম ধর্মনায়ক কার্ডিন্যাল গিবনস্...তাঁর দুই পাশে জগতের সকল ধর্মের প্রতিনিধি-প্রধানেরা যে যাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন...কোন ধর্মই বাদ পড়ে নি...খ্রীষ্টান ধর্মমণ্ডলীর বাইরে জগতের আর আটটি প্রধান ধর্মই সেখানে সমবেত হয়েছেন...

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিন্যাল গিবনস্ শান্তকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন...

ধর্মসভার পক্ষ থেকে ডাক্তার ব্যারোজ সভার উদ্বোধন করলেন, বিশ্বের প্রতিনিধিদের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে স্বাগত জানালেন...

বিরাট জনতা স্থির, প্রস্তরনীরব...

সভাপতি একে একে প্রতিনিধিদের প্রাথমিক বক্তৃতার জন্যে আহবান করলেন...

সন্ন্যাসী স্থির বসে আছেন...তাঁর কানে যেন কোন কথাই পেঁছচ্ছে না...তাঁর চোখের সামনে সেই বিরাট জনতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে...তিনি বসে আছেন, বহু দূরে, গঙ্গার ধারে, পঞ্চবটীর মূলে, তাঁর গুরুর পদতলে...

একজনের পর একজন বক্তৃতা দিতে ওঠেন, বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে সভাপতি ঘণ্টা বাজিয়ে আর একজনকে আহ্বান করেন...

এই ভাবে সন্ন্যাসীর পালা আসে...

সভাপতি মৃদুকণ্ঠে আহ্বান করেন...

সন্ন্যাসী বলেন, না, এখন নয়...

আবার আসে অন্য লোক, চলে বক্তৃতা।

সভাপতি আবার সন্ন্যাসীকে আহ্বান করেন।

সচকিত হয়ে সন্ন্যাসী আবার বলেন, না, এখন নয়...

সভাপতি বিস্মিত হয়ে যান...ক্রমশঃ বিরক্তও হন...

সভাপতি এবার বিশেষভাবে অনুযোগ করলেন...আর বিলম্ব করা চলতে পারে না...

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন, ধ্যান থেকে...

সমস্ত মুখ গোধূলির আকাশের মত রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে।

একবার দু-চোখের দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত সভাকে যেন পরিক্রমণ করে আসেন...

তারপর অতি মৃদুকণ্ঠে দেবী সরস্বতীকে আহ্বান করেন...

সহসা সন্ন্যাসীর চেতনা বাঙ্‌মুখর হয়ে ওঠে...

সমবেত জনতাকে আহ্বান করে সিংহনাদ করে উঠলেন...

Sisters and Brothers of America.

সহসা সেই নিষ্প্রাণ জনতার মধ্যে কে যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চার করে দিলো...এতক্ষণ যে জনতা অর্ধ-চেতন অবস্থায় উদাসীন বসে ছিল, কে যেন তাদের সেই দশ সহস্র দেহকে নিমেষে এক মহা-প্রাণস্পর্শে সচকিত করে তুললো, এক সঙ্গে তারা মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো...

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত বিমূঢ়...কথা বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু বলতে পারেন না...সেই দশ সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে, মুহুর্মুহু করতালিতে তাঁর সব চেষ্টা ডুবে যায়...

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন...

উন্মাদ জনতা অবিরাম জয়ধ্বনিতে তাঁকে আপ্লুত করে ফেলে...

এইভাবে দু-মিনিট চলে যায়...দু-মিনিট ধরে একটা উন্মাদ জয়তরঙ্গ তাঁকে ঘিরে নাচতে থাকে...

দুটি সামান্য শব্দ...একটা সমগ্র মহাদেশের চিত্ত নিমেষে জয় করে নিলো...

এমন বিস্ময়কর বিজয়বার্তা মানুষের ইতিহাসে আর কখনো লিপিবদ্ধ হয় নি...

সেই দুটি শব্দ যেন মন্ত্রপূত বাণীর মত এক নিমেষে ভারতের আত্মার ঐশ্বর্যকে সেই নবীন জাতির সামনে উদঘাটিত করে তুলে ধরলো...

বাতায়নের একটুখানি ফাঁক, তার মধ্য দিয়ে সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো দিগন্ত-বিস্তারী প্রান্তর...

প্রাণের স্পর্শের জন্যে, তার নিজের অজ্ঞাতে অপেক্ষা করে ছিল সেই নবীন কর্মোন্মাদ জাতি, সন্ন্যাসীর সেই বাণীর আকস্মিকতার মধ্যে আমেরিকা সন্ধান পেলো সেই প্রাণ-স্পর্শের। আমেরিকার চিত্ত তখন সবে নব-যৌবনে জেগে উঠেছে। কোন অতীতের ঐতিহ্য থেকে সে তার প্রাণ-মন্ত্র আহরণ করতে পারে নি, তার নিজের সুবিপুল কর্মচেষ্টায় সে শুধু তার চারদিকে গড়ে তুলেছিল বিপুল বস্তুর সম্ভার...

সেই সুবিপুল বস্তুপুঞ্জের মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব ছিল। সন্ন্যাসীর সেই প্রাণের আহ্বানে আমেরিকা সেই প্রথম সন্ধান পেলো তার অন্তরের সেই অভাবের। তাই অকস্মাৎ-পাওয়ার আনন্দে সে শিশুর মত আত্মহারা হয়ে উঠলো।

জয়োল্লাসে শ্রান্ত হয়ে সেই বিপুল জনতা যখন থামলো, সন্ন্যাসী তখন আবার বলতে আরম্ভ করলেন। বলবার তখন আর বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সন্ন্যাসী এসেছিলেন, সেই উদ্বোধনী সম্বোধনের পরমাত্মীয় দুটি কথায় তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার চিত্তে তিনি প্রবেশ করেছেন, আমেরিকার চিত্ত তিনি জয় করেছেন।

তাই সেদিন অতি সংক্ষেপে, অতি অল্প কথায় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ করেন। কিন্তু সেই স্বল্প কথার প্রত্যেকটি অক্ষর ছিল মন্ত্রপূত। তার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের অন্তরকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন আমেরিকার অন্তরে। আমেরিকা আর ভারতবর্ষের মিলনের ইতিহাসে তাই অক্ষয় অমর হয়ে আছে সন্ন্যাসীর সেই মন্ত্রপূত স্বল্প কথা...

জগতের সেই নবীনতম জাতিকে তিনি আহ্বান করলেন, জগতের প্রাচীনতম জাতির বৈদিক সন্ন্যাসীদের নামে। নির্ভীক কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, হিন্দুর আত্মিক ধর্মকে, বিশ্বের চিন্তার আদি-জননী-রূপে।

চিরাচরিত পুঁথিগত ভাষায় ধর্মালোচনার প্রাণহীন তার্কিকতার ঊর্ধ্বে, আমেরিকা সেই প্রথম শুনলো, ভারতের আত্মিক অনুভূতির নির্ভীক আত্ম-প্রতিষ্ঠার অগ্নি-বাণী...ভাষা নয়, মন্ত্র ; তর্ক নয়, অনুভূতি দিব্য দীপ্তি।

সেই স্বল্প ভাষণের পরিশেষে তিনি শাস্ত্র থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে, হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীনতার কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"কত না নদ, কত না নদী, কত না বিভিন্ন উৎস থেকে তারা উৎসারিত হয়ে চলেছে। কেউ চলেছে তীরের মত সোজা, কেউ চলেছে এঁকেবেঁকে উপল আহত হয়ে, কিন্তু হে আমার প্রভু, আমি জানি, তারা সবাই এসে পরিশেষে এক হয়ে মিশেছে তোমার উদার বিশাল সাগরে..."

মন্দির নয়, শাস্ত্র নয়, জাতিভেদের কথা নয়, পুরোহিততন্ত্রের কথা নয়, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কথা নয়, প্রতিমাপূজা নয়, এতি-নেতির দ্বন্দ্ব নয়।...

জাতি-দেশ ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতার ধর্ম...আমেরিকা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই তরুণ সন্ন্যাসীর তনু-বাক প্রাণ-বাণীর মধ্যে দেখতে পেলো এক নতুন প্রাণধর্মের প্রকাশ...

সেটা হিন্দু ধর্ম, না অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম, তার প্রশ্ন তারা উত্থাপন করলো

না...এক সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতির বিদ্যুৎ-স্পর্শ তাদের মনে এসে আঘাত করেছে... সে বিদ্যুৎ-আঘাতে তারা আপনা থেকে সাড়া দিয়ে উঠলো।

সন্ন্যাসীর বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে সেই বিরাট জনতা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করে উঠলো...

করতালিতে সেই বিশাল হর্ম্য যেন ফেটে পড়তে লাগলো...

সন্ন্যাসী বার বার উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাস-উন্মাদ জনতার অভিবাদন স্বীকার করেন ...সেই কয়েক মিনিটের মধ্যে কী যে হয়ে গেল, সন্ন্যাসী নিজে তা অনুধাবন করতে পারেন না...

শুধু অনুভব করেন, সেই মহামুহূর্তে মানব-ইতিহাসের এক দিব্য প্রকাশ সংঘটিত হয়ে গেল। বক্তৃতার এক লহমার আগেও তিনি জানতেন না, কী বক্তৃতা তিনি দেবেন। কী হবে তার ফলাফল। চরম নির্ভরতায় তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তরবাসী বিদেহী গুরুর আশীর্বাদের কাছে। তাই একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করলেন, সেই রহস্যের সার্থকতা। সেই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মধ্যস্থতায় আত্মপ্রকাশ করে উঠলো ভারতচৈতন্য। ভারতের সুদীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত তপস্যার ফল তাঁকে বাহন করে সৃজন করলো সেই পাঁচ মিনিটের মন্ত্রমায়া।

সমস্ত আমেরিকা তরুণ সন্ন্যাসীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো...

সহযাত্রী বিভিন্ন প্রতিনিধিরা যেন আবিষ্ট হয়ে সন্ন্যাসীকে অভিনন্দন জানালো। তাদের অভিবাদনের মধ্যে সমস্ত জগতের অভিনন্দন পরিস্ফুট হয়ে উঠলো...সেই অগ্নিবর্ণ সন্ন্যাসীর মুখের জ্যোতির দিকে চেয়ে তাঁরা যেন এক মহাজ্যোতির স্পর্শ পেলেন...

এমন অপূর্ব, এমন অনায়াস দিগ্বিজয় আর কেউ কখনো দেখে নি...

বিপুল জনতা জয়ধ্বনিতে পথ মুখরিত করে সন্ন্যাসীকে তাঁর গৃহে পেঁছে দিল। বিজয়ী বিমুগ্ধ সন্ন্যাসী নিজের ঘরে প্রবেশ করে শোনেন, বাইরে তখনও উন্মাদ জনতা জয়ধ্বনি করছে...তাঁর দর্শনের জন্যে লোকে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে...

সন্ন্যাসী ঘরের অর্গল বন্ধ করে দেন। বাইরে ঘন হয়ে নেমে আসে রাত্রি। নির্বাক সন্ন্যাসীর দুই চোখ অশ্রুজলে ভরে আসে...শিশুর মত কেঁদে ওঠেন।

রাত্রিতে তখন আমেরিকার বিভিন্ন প্রেসে রচিত হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রশংসার স্তব-গাঁথা। সন্ন্যাসী তখন রুদ্ধগৃহে বিশ্ব-বিজয়ের তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে অসীম বেদনায় ওঠেন কেঁদে। চোখের জলে ভিজে যায় নৈশউপাধান। বিজয়ের আনন্দ-অশ্রু নয়, কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদের উদ্‌গত আনন্দ-বারি নয়, জগতের এক বিচিত্র মনের অতীব বিচিত্র এক মধুর প্রকাশ। সমস্ত জগৎ যখন সন্ন্যাসীর বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে, সন্ন্যাসী তখন নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে হাহাকার করে ওঠেন। তাঁর অন্তরে, হায়, অতি নির্মম বেদনায় বিশ্ববিহীন একাকীত্বে সে বহন করে চলেছে তার নিজেরই শবদেহ। জগতের এই জয়ধ্বনিতে মরে গেলো সেই পথভোলা পরিব্রাজক, মরে গেলো সেই গহন গুহাচারী আত্মবিলাসী সন্ন্যাসী। তাই লবণাক্ত অশ্রুজলে কেঁদে

ওঠেন সন্ন্যাসী, হায় গুরু! একি মহাদণ্ড দিলে আজ তুমি! এক নিমেষে কেড়ে নিলে আমার নির্জনতা, কেড়ে নিলে আমার গহন তপস্যার সুখ, পরিবর্তে একি মহাকর্মের কোলাহল তুলে দিলে আমার মনে!

সেদিন রাত্রি-নির্জনতায় বিজয়ী সন্ন্যাসী স্পষ্ট দেখতে পান, সামনে সংগ্রামসংকুল বিপুল কর্মের কণ্টকময় পথ...ধ্যানের নিভৃত লোক হতে আজ থেকে তিনি হলেন নির্বাসিত...

তাই কেঁদে বলেন সন্ন্যাসী, হে গুরু, মাথা পেতে নিলাম তোমার এই নির্বাসন-দণ্ড! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

পরদিন প্রভাতে জগতে আবির্ভূত হবে আর এক বিবেকানন্দ, ভারতের এক নতুন সন্ন্যাসী...যাকে প্রবর্তন করতে হবে এক নতুন সন্ন্যাসের আদর্শ। কান্নায় আর কাদায় মেশা জগতের মাঝখানে বসে যাকে উদযাপন করতে হবে অভিনব কর্মব্রত...

দীর্ঘ সতেরো দিন ধরে ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন চলল...

ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রোতারা অপেক্ষা করে থাকতেন, কখন সেই চারুদর্শন আত্মসমাহিত হিন্দু-সন্ন্যাসী তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াবেন, মানবদুর্লভ কণ্ঠে অজানা জগতের সন্ধান এনে দেবেন...তাঁদের অন্তরভূমিকে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়ে অনাস্বাদিত অপূর্ব অনাবিল আনন্দরসে সিক্ত করে তুলবেন...

ধর্ম-মহাসভার উদ্যোক্তারা প্রথমদিনেই অনুভব করতে পেরেছিলেন, ধর্মসভায় আমন্ত্রিত সমস্ত জাতির প্রতিনিধির মধ্যে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই সেই মহা ঐশী শক্তি আছে, যার আকর্ষণে শ্রোতারা তাঁর কথা শোনার জন্যে শেষ অবধি অপেক্ষা করে থাকতে প্রস্তুত...

ধর্মসভা সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে শেষ অবধি দর্শকদের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য...

তাই প্রতিদিনই স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট হত সকলের শেষে...

প্রত্যেক বক্তার ভাষণের জন্যে মাত্র আধঘণ্টাটাক সীমাবদ্ধ ছিল...কিন্তু এই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রোতাদের অভূতপূর্ব আকর্ষণ দেখে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে বক্তৃতার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়...

শ্রোতাদের আগ্রহ ও আবেদন যে এই ব্যতিক্রমের কারণ তা বলাই বাহুল্য...

এই অধিবেশন উদ্‌যাপনের পর দেখা গেল, যে হিন্দুধর্ম একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া সারা পৃথিবীতে অবহেলিত অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল...যে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত তথ্য উপলব্ধি না করে, এমন কি হিন্দুরাই নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ক্ষয়িষ্ণু রোগীর মত দিনে দিনে ক্ষীণপ্রায় হয়ে আসছিল, সেই হিন্দুধর্ম সর্বজাতির সমক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে সবলে বিস্ময়ান্বিত করে তুলে জগতের বিভিন্ন ধর্ম মতবাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করলে...

সারা পৃথিবী স্বামীজীর পূতকণ্ঠে শুনতে পেলে, মানুষই দেবতা, মানুষই

অমৃতের সন্তান...মানুষকে পাপী বলা ঘোরতর অন্যায়...নিদারুণ ক্ষমাহীন অপরাধ ...যা কিছু দোষণীয় কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তা সবই মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞতার ফল...

এত বড় আশার বাণী এর আগে শ্রোতাদের কেউ শোনায় নি...

বাইবেলের পাতায় লেখা যীশুর বাণী যেন মূর্ত হয়ে ওঠে স্বামীজীর কণ্ঠে...

নব প্রেরণায় প্রাণসঞ্চার করে শ্রোতাদের হৃদয়ে...সারা জগতের মানববৃন্দ হল মানুষের বড় আপনার জন, সহোদরপ্রতিম ভাই বোন, কেউ পর নয়, কেউ শত্রু নয়...

ধর্মসভার অধিবেশনের পর বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা একে একে যে যার দেশে ফিরে গেলেন...

গেলেন না শুধু ওই হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। সারা আমেরিকায় আজ তিনি কেবল সুপরিচিত নন...সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁকে জেনেছেন, তাঁর কথা শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন...

ইংল্যান্ড থেকে নিমন্ত্রণ আসছে...

এত অভ্যর্থনা এত সম্মান এত নিমন্ত্রণের পসরা বিবেকানন্দ ছাড়া অন্য কারো করতলে উপঢৌকন দিলে, কীর্তির পিচ্ছিল পথে অবলুপ্ত হতে তার এক মুহূর্ত বিলম্ব হত না...

কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিহীন সন্ন্যাসীর কথাই আলাদা...মানুষের মধ্যে তিনি ব্যতিক্রম...

কীর্তির শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে অর্গলবদ্ধ ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ভাগ্য-দেবতার চরণে মাথা ঠুকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছেন, হায়, কেন এ পার্থক্য? প্রচুর অপচয় করার মত প্রাচুর্যের মধ্যে এদেশের লোকেরা কত বিলাসে দিন কাটাচ্ছে আর সমুদ্রের ওপারে আমার স্বদেশের দরিদ্র নারায়ণেরা সারাদিনে দুবেলা পেটভরে মুখে তোলার মত পরিমিত অন্নও সংগ্রহ করতে পারে না...

কিন্তু এত বিলাসের মধ্যে বাস করেও এদের শান্তি কোথায়...বাহ্যিক সুখভ্রম উত্তেজনার অন্তরালে ওই তো দেখা যাচ্ছে চাপা কান্না! পাছে আনন্দের-ভানকরা-আবরণ ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ে এদের স্বরূপ...তাই কাজের পর কাজের পাহাড় তুলে নিজেদের ভুলিয়ে রাখে এরা...মুহূর্তের অবসর নেই...অবসর যেন মূর্তিমান বিভীষিকা—বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পেতে ছুটে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে...

এদের দিতে হবে অন্তরের শান্তি...

জানাতে হবে আত্মার স্বরূপ...

অভ্যাস করাতে হবে বেদান্তের ক্রিয়া-কলাপ...

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে আমন্ত্রণ এলো এক লেকচার ব্যুরোর সমিতি থেকে...

—আপনি শুধু প্রচার করে যাবেন...টাকা পয়সা যা কিছু প্রয়োজন আমরা ব্যবস্থা করব। শুধু তাই নয়, শ্রোতাদের কাছ থেকে দর্শনী বাবদ যা পাওয়া যাবে তার একটা মোটা লভ্যাংশও আপনি পাবেন...

প্রস্তাব করেছিল স্বামীজীর কাছে লেকচার ব্যুরোর কর্তৃপক্ষের একজন...

বড় মাহেন্দ্রক্ষণে এই প্রস্তাব এসেছে...

ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই, আমেরিকায় দিন গুজরানের অর্থ-চিন্তা তো দূর হল, এমন কি উদ্বৃত্ত উপার্জন দেশে নিয়ে গিয়ে গরিবদের সেবায় ব্যয় করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল...

শর্তের কথাগুলি অভিজ্ঞ আইনবিদের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে না নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীজী বেদান্ত প্রচারে...উল্কার মত ছুটে বেড়াতে লাগলেন উত্তর থেকে দক্ষিণে, শহর থেকে শহরান্তরে...

পাহাড় প্রমাণ বাধা এসে দাঁড়াতে লাগল তাঁর চলার পথে...

হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়েরা বিশেষ করে খ্রীষ্টান মিশনারির দল দেশে বিদেশে স্বামীজীর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা প্রচার করতে শুরু করে...

এমন কি সুন্দরী তরুণী প্রেরণ করে স্বামীজীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা থেকেও নিবৃত্ত হয় নি...

কিন্তু কোন প্রকার কুৎসা বা প্রলোভন স্বামীজীর প্রবল গতিবেগ রোধ করতে পারে নি...স্বামীজীর সাইক্লোনিক ব্যক্তিত্বের সামনে শুকনো পাতার মত সরে গেছে...

ধীরে ধীরে আমেরিকাবাসী শিক্ষিত স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে বেদান্ত তার শিকড় গাড়তে শুরু করল...

ঠিক এমনি সময়ে দেখা গেল লেকচার ব্যুরো স্বামীজীর বক্তৃতায় শ্রোতাদের কাছ থেকে দর্শনী বাবদ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে নামমাত্র অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে স্বামীজীকে দিচ্ছেন...

তখন নিরুপায় হয়ে স্বামীজীকে লেকচার ব্যুরোর সংগে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হল...শুধু তাই নয় বক্তৃতা দিয়ে টাকা নেওয়ার সংকল্পও মন থেকে মুছে ফেললেন, স্বাধীনভাবে কোনরকম দর্শনী না নিয়েই বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ধর্মের মূল তত্ত্ব বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয় মর্ম দিয়ে অনুভব করার জন্যে ক্লাস খুলে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন...একে একে আমেরিকানরা তাঁর শিষ্য হতে লাগল...

এইভাবে আমেরিকায় বেদান্ত শিক্ষার প্রথম ভিত্তিকা স্থাপিত হল...

আমেরিকা থেকে বিলাতে...

আমেরিকায় স্বামীজীর কীর্তি সাগর পার হয়ে ইংলণ্ডেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ড থেকে ঘন ঘন নিমন্ত্রণ যাচ্ছিল স্বামীজীর কাছে...

আমেরিকায় কাজ খানিকটা এগিয়েছে দেখে আর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর উপযুক্ত শিষ্যরা ঠিকমত ক্লাস চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বুঝতে পেরে স্বামীজী ইংলণ্ডে এলেন বেদান্ত প্রচারে...ইংলণ্ডে আসার আগে স্বামীজী নিজেই বুঝতে পারেন নি যে সে দেশের লোকেরা আমেরিকানদের মত সহজে নতুন ভাবধারা গ্রহণ করবে... ইংরেজদের চরিত্র ইংরেজী ভাষায় বলা হয় conservative...কোন কিছুই তারা সহজে গ্রহণ করে না...নিজেদের ঐতিহ্য আচার ব্যবহার অতি সযত্নে রক্ষা করে চলে...

তাই বেদান্তের ভাবধারা কতদূর তাদের মনে দাগ কাটবে তা পরীক্ষা করাও ছিল স্বামীজীর আর এক উদ্দেশ্য...

কিন্তু এদেশের ভূমিতে পা দিয়ে স্বামীজীর সব ধারণা পালটে গেল...

তিনি বুঝতে পারলেন, সংরক্ষণশীল হলেও যদি ইংরেজরা কিছু গ্রহণ করে তাহলে তারা, যাকে বলে বুলডগ্ টেনাসিটি, সেইরকম একাগ্রতা দিয়ে আমরণ ধরে রাখার চেষ্টা করে...

বেদান্ত ইংরেজ কৃষ্টিকুলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করল...

তার ফলে দেখতে পাই গোল্ডউইনের মত বিশ্বাসী অনুচর স্বামীজীর সংগী হয়ে ভারতে এলেন, সেবিয়ার দম্পতি স্বামীজীর সংগে ভারতে এসে মায়াবতী আশ্রম করে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নিলেন, আর...

ভারতের সৌভাগ্য বিদুষী মার্গারেট নোবল জাতীয় ঐতিহ্য ত্যাগ করে স্বামীজীর ইচ্ছা পূরণ করতে ভারত-কল্যাণে ভারত-রমণী হয়ে সূচিত হলেন, ভগিনী নিবেদিতা...

এর পরের কাহিনী...

যে জিনিসের সূত্রপাত স্বামীজী করে গিয়েছিলেন...সেই হিন্দুধর্মের দিন দিন প্রসার হতে লাগল...

স্বামীজী যখন দেখলেন তাঁর কাজ ফুরিয়েছে...কর্মের দায়িত্ব সংগী গুরুভাইদের হাতে ন্যস্ত করে অবসর নিলেন...

১৯০২ সাল।

মহাসমাধিতে স্বামীজী সেই মহাশক্তির সংগে বিলীন হয়ে গেলেন।

ওঁ

দেব সাহিত্য কুটীর